যৌনতা, পরিবার, রাষ্ট্র ঃ বঙ্কিম-উপন্যাসের নির্মিতি

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি. (কলা)
উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ
২০১৬

গবেষক
নির্মাল্য কুমার ঘোষ

তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক ড. গোপা দত্ত

বাংলা বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা ৭০০ ০৩২

Certified that the Thesis entitled

_____

_____

Submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of _____

_____

_____

And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/elsewhere.

Countersigned by the
Supervisor :
Dated :

Candidate :
Dated :

উপক্রমণিকা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে ২০১১ সালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নতুন নিয়ম (UGC, Regulation of 2009) অনুসারে 'যৌনতা, পরিবার, রাষ্ট্র : বঙ্কিম-উপন্যাসের নির্মিতি'—এই শিরোনামে বর্তমান গবেষণা নথিভুক্ত হয়। গবেষণা-সঞ্চালক ছিলেন অধ্যাপক ড. দীপান্বিতা ঘোষ। ২০১৪ সালে অধ্যাপক ঘোষের অকালপ্রয়াণে আকস্মিকভাবে স্তব্ধ হয়ে যায় গবেষণার কাজ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ এবং গবেষণা-পরিষদের উদ্যোগে দ্রুত কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয় নিয়ম-সংক্রান্ত জটিলতা। ২০১৫ সালে অধ্যাপক ড. গোপা দত্তের তত্ত্বাবধানে এই গবেষণা পুনর্জীবন লাভ করে। গবেষণার প্রথম পর্যায়ে ড. ঘোষের সুচিন্তিত পরামর্শ আর দ্বিতীয় পর্যায়ে ড. দত্তের যুক্তিসঙ্গত তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ, বর্তমান গবেষণার অন্তিম রূপ নির্মাণে ক্রিয়াশীল থেকেছে। শ্রীঘোষ এবং শ্রীদত্ত, আমার এই দুই মনস্বিনী 'গুরু'কেই সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

প্রণাম জানাই শ্রীতপোব্রত ঘোষকে। বঙ্কিম-সাহিত্য বিচারে 'ধর্মতত্ত্ব'-এর গুরুত্বের কথা তিনিই আমাকে স্মরণ করিয়ে দেন। প্রণাম জানাই আমার অগ্রজতুল্য চার অধ্যাপককে। শ্রীবরেন্দু মণ্ডল, শ্রীআবদুল কাফি, শ্রীরাজ্যেশ্বর সিন্‌হা এবং শ্রীজয়দীপ ঘোষ। চারজনের নিরন্তর তাড়না, বর্তমান গবেষণার শরীরে দ্রুত রক্তসঞ্চালনে সাহায্য করেছে।

এবার ঋণস্বীকারের পালা। সংস্কৃত সাহিত্য সংক্রান্ত কিছু 'অনুপপত্তি'র অনায়াস সমাধান পেয়েছি মেদিনীপুরের 'সুকুমার সেনগুপ্ত মহাবিদ্যালয়'-এর অধ্যাপক শ্রীপ্রতিম ভট্টাচার্যের থেকে। বেণীমাধব রায়চৌধুরী সম্পাদিত 'কালিদাস-রচনাসমগ্র' আর সারদাপ্রসাদ বিদ্যাভূষণ সংকলিত 'স্তোত্র-রত্নমালা' ব্যবহার করতে পেরেছি, কামাখ্যাগুড়ির 'শহীদ ক্ষুদিরাম কলেজ'-এর অধ্যাপক শ্রীপ্রসেনজিৎ বসুর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীমান বিশ্বজিৎ ঘোষাল, শ্রীমান ফিরোজ খান এবং শ্রীমান শৌভিক মুখোপাধ্যায়ের সহৃদয় সহযোগিতায় হাতের নাগালে এসে গিয়েছে দুর্লভ সব বই-পত্রিকা। প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীমান বিবস্বান দত্তের আনুকূল্যে ব্যবহার করতে পেরেছি সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বই 'স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙ্গালী।' এদের সকলকে জানাই মৈত্রী-স্নেহ।

সবশেষে প্রতিষ্ঠানের কথা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগার এবং রামমোহন লাইব্রেরি—এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের থেকে যে আন্তরিক সহযোগিতা লাভ করেছি, তার ঋণ অপরিশোধ্য। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় গ্রন্থাগারিক শ্রীআইভি আদকের সস্নেহ সহায়তার কথা।

নির্মাল্য কুমার ঘোষ
গবেষক
বাংলা বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সূচিপত্র

প্রাক্‌কথন ঃ ১-৫

প্রথম অধ্যায় ঃ ৬-২৫
যৌনতা, পরিবার এবং রাষ্ট্র ঃ উপনিবেশের আগে-পরে

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ
রাষ্ট্র-পরিবার-যৌনতা ঃ বঙ্কিমী একস্বর ২৬-৪৫

তৃতীয় অধ্যায় ঃ
ত্রিধাবিন্যস্ত কাঠামো ও বঙ্কিম-উপন্যাসের নির্মাণ ৪৬-৯৭

চতুর্থ অধ্যায় ঃ
বঙ্কিমী বহুস্বর ৯৮-১৪৪

পঞ্চম অধ্যায় ঃ
মুখচ্ছদ পুরাণ ১৪৫-১৮৩

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ
ভাষাশরীর ও প্রতীক-ব্যবহার ১৮৪-২০৩

উপসংহার ঃ ২০৪-২০৮
গ্রন্থপঞ্জি ২০৯-২১৬
পরিশিষ্ট : এক ২১৭
পরিশিষ্ট : দুই ২১৮

প্রাক্‌কথন

'উনিশ শতক' নিয়ে গবেষণার অন্ত নেই! আর তার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস? সাবেকি ধরনের আশ্চর্য সব গবেষণা ও সমালোচনা আমাদেরকে ঋদ্ধ করেছে। প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্তের 'উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিম'[১] অথবা সুধাকর চট্টোপাধ্যায়ের 'কথাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র'[২]-এর মতো বই তো কালজয়ী। তবু 'ক্লাসিক' হয়ে-যাওয়া অথবা হতে-চলা সেই সব বই ঘাঁটলে টের পাওয়া যায় কিছু কিছু ফাঁক-ফোকর!

উনিশ শতকের ভিক্টোরিয় শুচিতাবোধের দেখ-রেখেই বেড়ে উঠেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। বেড়ে উঠেছেন তাঁর সিংহভাগ সমালোচকও! ফলে, বঙ্কিম সম্পর্কে তাঁদের সমালোচনাতেও স্পষ্ট সেই শুচিবায়ুগ্রস্ততার ছাপ। ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'-তে মোহিতলাল মজুমদার লেখেন, ঘোর 'কল্লোল' যুগে 'আমরা এখন সর্ববন্ধনমুক্ত হইয়া, সাহিত্যের কামলোকে বিচরণ করিতেছি'; আর তারই প্রেক্ষিতে তাঁর বঙ্কিম-বিচার ঃ

> 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের প্রধান ভাবগ্রন্থি—স্ত্রী-পুরুষের যৌন-সম্বন্ধ বা দাম্পত্যপ্রেম।'[৩]

'যৌন-সম্বন্ধ' আর 'দাম্পত্যপ্রেম' যে পরস্পরের বিকল্প নয়, তা যেমন মোহিতলালের নজর এড়িয়ে গেছে, তেমনি 'শনিবারের চিঠি'-র আরেক সদস্য প্রমথনাথ বিশী-র বঙ্কিম-পাঠকেও প্রশ্নাতীতভাবে মেনে নেওয়া সম্ভবপর নয় ঃ

> 'নরনারীর আদিম আকর্ষণ বঙ্কিম-উপন্যাসের মূল প্রেরণা। ... কামের রূপান্তর প্রেম, প্রেমের রূপান্তর ভক্তি, প্রেম ও ভক্তিতে মনুষ্যত্বের পরাকাষ্ঠা। এই রূপান্তর সাধনার বিষয়। ... বঙ্কিমচন্দ্রের মতে সাধনার পথ দুটি। সাধারণের জন্য দাম্পত্যজীবন, অসামান্য দু-দশজনের জন্য সন্ন্যাস।'[৪]

বঙ্কিমচন্দ্রের হিসাব মতো 'সাধনার পথ' যে 'দুটি' নয়; একজনের জন্যও 'সন্ন্যাস' মার্গ নির্দেশ করেননি বঙ্কিম, তা 'গীতা'-র বঙ্কিম-ভাষ্যের সাক্ষ্যেই প্রমাণ করা যায়।

ভিক্টোরিয় শুচিতাবোধের কথা আগেই বলেছি। জগদীশ ভট্টাচার্য সেই 'ক্লাসিক' ঘরানার অধ্যাপক। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর 'মিথ' হতে-চলা সুন্দর ভাষ্যটি মনে পড়ছে ঃ

> 'বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনামূলে ছিল জীবনের শিবচেতনা। এই শিববোধের ভিত্তিতে ন্যায়-অন্যায়, নীতি-দুর্নীতির মাপকাঠিতে গড়ে উঠেছে তাঁর জীবনমূল্য। তাই তাঁর কল্পনায় প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে 'নৈতিক মানুষ' বা ethical man।'[৫]

'নৈতিক মানুষ' ধরা পড়েছে 'প্রধান' হয়ে; তার মানে অ-প্রধান বা গৌণ কোন এক অ-নৈতিকতার ধারণাও বঙ্কিম-সাহিত্যে ছিল। সেই ধারণার খুব কাছাকাছি পৌঁছেও তাকে ছুঁতে অস্বস্তি বোধ করেছেন সমালোচকেরা! 'জয়দেবের আদিরসের ভাণ্ডার' থেকেই কীভাবে 'আনন্দমঠ' উপন্যাস রচনার মাল মশলা আহৃত হয়েছে, তা লক্ষ করে ভবতোষ দত্ত তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র ও সংস্কৃত সাহিত্য' প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ

> 'আনন্দমঠ রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র যেভাবে জয়দেবকে ব্যবহার করেছেন, আর কোনো উপন্যাসে বঙ্কিম ঠিক সেই পরিমাণে অন্য কোনো সংস্কৃত কবিকে কাজে লাগান নি। যে-জয়দেব সম্বন্ধে তিনি একদা প্রতিকূল মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন, সেই জয়দেবই বঙ্কিমকে এমনি করেই অধিকার করিলেন।'[৬]

মুখ্যত যৌনতার প্রশ্নেই একদা যে জয়দেবের প্রতি 'প্রতিকূল মনোভাব' পোষণ করতেন বঙ্কিমচন্দ্র, কী করেই বা সে হঠাৎ বঙ্কিমকে 'অধিকার' করে বসে, সে বিষয়ে কিন্তু কোনো ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেননি ভবতোষবাবু।

অবশ্য এর মধ্যেই কোথাও কোথাও জাগছিল ভিন্ন সুর! রবীন্দ্র পুরস্কার পাওয়া ইংরেজি বঙ্কিম জীবনীতে যেমন শিশিরকুমার দাশ লক্ষ করলেন বঙ্কিমের 'মনন' ও 'মানসে'র টানাপোড়েন ঃ

> 'Bankim tried hard to control his inner turbulence by a strong intellectual temper.....'[৭]

আর এর ঠিক দশ বছর বাদে, সাহিত্য অকাদেমি প্রকাশিত এযাবৎকালের বৃহত্তম বঙ্কিম-বিষয়ক সঙ্কলন গ্রন্থে উজ্জ্বলকুমার মজুমদারের লেখা 'THE ARTIST AND THE MORALIST' নামের প্রবন্ধে আমরা পেলাম, আরেকটু এগিয়ে যাওয়ার সূত্র ঃ

> 'The moralist can hardly pit himself against the artist. Only for the first and last time Rajsingha serves as the moralists model by virtue of his righteousness. But even here the heart wins : Zeb-Unnisa's piteous cry at the death of Mobarak and Aurangzeb's sad importunity defy the resistance put up by the preacher and break out of his controlling design.'[৮]

তথাকথিত 'নৈতিক মানুষ' গড়বার একখানা 'Controlling design' যে বঙ্কিমের ছিল, এবং সব সময় যে সেই কাঠামো কার্যকরী হতে পারেনি তা সঠিকভাবে লক্ষ করেছেন উজ্জ্বলকুমার মজুমদার।

আসলে বিশ শতকের শেষ দশকেই বদলে যাচ্ছিল দুনিয়ার হাল-হকিকত্! সেই সঙ্গে

সাহিত্য-সমালোচনারও বটে! ইতিহাস-সমাজবিদ্যা-মনস্তত্ত্বের নিত্য-নতুন ব্যাখ্যা খোল-নলচে সমেত পাল্টে ফেলল সমালোচনার জগৎ। ইতিহাসের এবং রাষ্ট্রনীতির আলোচনায় ধরা পড়ল উনিশ শতকের জাতি-রাষ্ট্রের স্বরূপ, তার 'একক' রূপে 'পরিবার'-এর গুরুত্ব, সেই পরিবারে নারী-পুরুষের, বিশেষত নারীর অবস্থান। তাদের মধ্যে দু'চারটির কথা না-বললেই নয়! পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ 'The Nation and Its women'[৯] এবং দীপেশ চক্রবর্তীর প্রবন্ধ 'The Difference Deferral of a Colonial Modernity : Public Debates on Domesticity in British Bengal.'[১০]—দু'টি সর্বাগ্রে স্মরণীয়। উনিশ শতকের যৌন-জীবন এবং তার প্রেক্ষিতে 'বিশুদ্ধ নীতিবাদ' এবং নব্য-দাম্পত্যের উত্থান প্রসঙ্গে তথ্যপূর্ণ আলোচনা করেছিলেন সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী, তাঁর 'অন্দরে অন্তরে উনিশ শতকে বাঙালি ভদ্রমহিলা'[১১] নামের বইতে। এই প্রসঙ্গে তনিকা সরকারের প্রবন্ধ 'Domesticity and Nationalism in Nineteenth-Century Bengal'[১২]-ও অবশ্য উল্লেখ্য। উনিশ শতকের বাঙালির রাষ্ট্রচিন্তা বিষয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের দু'টি বই—'প্রজা ও তন্ত্র'[১৩] এবং 'ইতিহাসের উত্তরাধিকার'[১৪] নিঃসন্দেহে বাংলাভাষায় আধুনিক সমালোচনার আস্বাদ এনে দিয়েছে।

আধুনিক এই রাষ্ট্রচিন্তার সঙ্গে যৌনতার ইতিহাসকে জড়িয়ে নিয়ে পড়তে আমাদের শেখালেন ফরাসি তাত্ত্বিক মিশেল ফুকো। তাঁর 'The History of Sexuality'-র তিনটি খণ্ড—'The will to knowledge'[১৫], 'The use of pleasure'[১৬] এবং 'The Care of the Self'[১৭] আমাদের চিন্তাজগতে রীতিমতো আলোড়ন তুলল। এরই প্রণোদনায় সর্বভারতীয় প্রেক্ষিতে ঔপনিবেশিক আমলের যৌনতার চর্চা নিয়ে চারু গুপ্তার চমৎকার বই—'Sexuality, obscenity, Community'[১৮] যেমন রচিত হল, তেমনি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হল 'ধ্রুবপদ' পত্রিকার ৫ম বার্ষিক সংকলন 'যৌনতা ও সংস্কৃতি'[১৯] বা 'অনুষ্টুপ' পত্রিকার ২০০৬ সালের শারদীয় সংখ্যার ক্রোড়পত্র—'মধ্যবিত্ত বাঙালির যৌনতা'।[২০]

'একজটা দেবী'র অভিশাপকে অগ্রাহ্য করে বাংলা সমালোচনার জগতে যখন উত্তরদিকের জানালা খুলেই গেল, তখন সঙ্গতভাবেই আমাদের মত 'বামন'দেরও চন্দ্র-স্পর্শাভিলাষ জাগল। নতুন এই জাতি-রাষ্ট্র, পরিবার, দাম্পত্য, যৌনতার প্রেক্ষিতে রেখে বঙ্কিমচন্দ্রকে বিচার করবার জন্যই আমাদের এই গবেষণা নিবন্ধ। এই বিষয়ে একটি দিকনির্দেশী আলোচনার কথা অবশ্য উল্লেখ্য। হালফিলের তাত্ত্বিকতার নিরিখে বঙ্কিমকে কীভাবে পড়া সম্ভব, তার কিছুটা আভাস দিয়েছেন শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাংলা উপন্যাসে 'ওরা'' বইতে ঃ

> ‘বঙ্কিমের চোখে, হিন্দুর পরিবার সাধারণ ঘর গেরস্থালির ব্যাপার নয়। তার চেয়ে ঢের গুরুতর, একেবারে আগামী শুভ রাষ্ট্রের অণুবিশ্ব। .. ‘জাতি-রাষ্ট্র’ নামক তত্ত্বমূল যাদের মূলধন সেই বুর্জোয়াদের বিশ্বাস : একান্তই আবশ্যক, ‘রাষ্ট্র’—‘পৌরসমাজ’—‘পরিবার’ ত্রয়ীর পরিষ্কার পারস্পরিকতা।.... ‘স্বাদেশিকতা’র জোরালো দাবিতেই বঙ্কিম তাঁর উপন্যাসে খাড়া করেন দাম্পত্যের নতুন আদর্শ। সেই আদর্শ অনুসারে : বহুবিবাহ রদ হোক বা না হোক, দম্পতিদের মধ্যে নির্ভেজাল প্রীতিবন্ধন তৈরি হওয়া নিতান্ত কাম্য; শুধু নারী কেন, পুরুষেরও, পরিণয় সম্পর্কের বাইরে যাওয়া, আসক্তিবশে পরকীয়া প্রেমে আবিষ্ট হওয়া, অনুচিত।’[২১]

এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে উনিশ শতকের রাষ্ট্র-পরিবার-দাম্পত্য এবং যৌনতার সম্পর্কের প্রেক্ষিতেই আমাদের, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকে বুঝে নেবার এই নব্য-প্রয়াস।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বর্তমান গবেষণায় প্রদত্ত প্রথম বন্ধনীভুক্ত প্রতিটি পৃষ্ঠা সংখ্যাই বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত বঙ্কিম-গ্রন্থাবলীর থেকে উদ্ধৃত। বঙ্কিমের ইংরাজি রচনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত রচনাবলী। আর বানান প্রসঙ্গে বর্তমান গবেষণা ‘আকাদেমি বিদ্যার্থী বাংলা অভিধান’-এর অনুসারী।

উল্লেখপঞ্জি ঃ

১. দ্র. প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত, উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিম, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০৬।

২. দ্র. সুধাকর চট্টোপাধ্যায়, কথাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র, এ. মুখার্জি অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রা. লি., কলিকাতা, মাঘ ১৩৭৯।

৩. মোহিতলাল মজুমদার, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ও বঙ্কিম-বরণ, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ১০৭।

৪. প্রমথনাথ বিশী, বঙ্কিম-সরণী, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, মাঘ ১৪০৮, পৃ. ১০।

৫. জগদীশ ভট্টাচার্য, আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী, ভারবি, কলকাতা, আষাঢ় ১৪০৬, পৃ. ২১।

৬. ভবতোষ দত্ত, চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, বৈশাখ ১৪১৫, পৃ. ১০৯।

৭. Sisir Kumar Das, The Artist in Chains, New Statesman Publishing Company, New Delhi, 1984, Pg. 213.

৮. Bhabatosh Chatterjee edited, Bankim Chandra Chatterjee : essays in perspective, Sahitya Akademi, New Delhi, 1994, Pg. 473.

৯. See. Ranajit Guha edited, A subaltern studies Reader, 1986-1995, Oxford University Press, New Delhi, 2000.

১০. See. David arnold and David Hardiman edited, Sub-altern Studies VIII, Oxford University Press, New Delhi, 2003.

১১. দ্র. সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী, অন্দরে অন্তরে উনিশ শতকে বাঙালি ভদ্রমহিলা, স্ত্রী, কলকাতা, ১৯৯৮।

১২. See. Tanika Sarkar, Hindu Wife, Hindu Nation, Permanent Black, New Delhi, 2011.

১৩. দ্র. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, প্রজা ও তন্ত্র, অনুষ্টুপ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৮।

১৪. দ্র. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ইতিহাসের উত্তরাধিকার, আনন্দ, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০০৬।

১৫. See. Michel Foucault, The History of Sexuality, Volume I, The will to Knowledge, translated by Robert Hurley, Penguin Books, Australia, 2008.

১৬. See. Michel Foucault, The History of Sexuality, Volume II, The use of pleasure, translated by Robert Hurley, Vintage Books, New York, March 1990.

১৭. See. Michel Foucault, The History of Sexuality, Volume III, The Care of the Self, translated by Robert Hurley, Pantheon Books, New York, 1986.

১৮. See. Charu Gupta, Sexuality, Obscenity, Community, Permanent Black, Delhi, 2001.

১৯. দ্র. সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত, যৌনতা ও সংস্কৃতি, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০০২।

২০. দ্র. অনিল আচার্য, অর্ণব সাহা সম্পাদিত, যৌনতা ও বাঙালি, অনুষ্টুপ, কলকাতা, বইমেলা ২০০৫।

২১. শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা উপন্যাসে 'ওরা', প্যাপিরাস, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃ. ৩৭-৩৮।

প্রথম অধ্যায়

যৌনতা, পরিবার এবং রাষ্ট্র ঃ উপনিবেশের আগে-পরে

যৌনতা ও স্মৃতিশাস্ত্র ঃ

অধুনাতন আমরা যাকে 'যৌনতা' বলছি, প্রাচীন ভারতে তার প্রতিশব্দ ছিল 'কাম' বা 'রতি'। অ-পূর্ব এই শব্দ। একই সঙ্গে অস্ত্যর্থক এবং নঞর্থক ভাবনার সমাহার। অস্ত্যর্থক, কারণ একে ছাড়া জীবসৃষ্টি অচল; এরই উর্ধ্বায়িত শিখাকে 'প্রেম' সম্বোধন করার রীতি। তাই ভরত তাঁর 'নাট্যশাস্ত্র'-এ মানবিক চিত্তবৃত্তি তথা 'স্থায়িভাব'-এর গোড়ায় স্থাপন করেছেন 'রতি'কে।[১] আবার, যৌনতা নঞর্থকও বটে, কারণ তার অতিরেকী অভ্যাস ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্র অবধি সব কিছুকেই ধ্বংস করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। তাই, 'ষড়রিপু'র আদিতেও সেই 'কাম'-এরই অবস্থান। প্রাচীন ভারতের স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে বারবার ধিক্কার জানানো হয়েছে, শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে, সেই কাম-চর্চাকে যা পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতিকারক। পাশাপাশি স্নেহে-সমাদরে বরণ করে নেওয়া হয়েছে সেই 'যৌনতা'র অভ্যাসকেই, যা রাষ্ট্র-পরিবার-ব্যক্তির পক্ষে মঙ্গলজনক। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের যৌনতাকে দ্বিধারায় বিন্যস্ত করেছিলেন মিশেল ফুকো : পাশ্চাত্য জানে 'scientia sexualis' বা 'যৌনতার বিজ্ঞান' আর প্রাচ্য মানে 'ars erotica' বা 'কামের শিল্পকলা' ঃ

> 'কামের শিল্পকলায় সত্যের নিষ্কর্ষণ হয়েছে প্লেজার বা সুখানুভূতি থেকে, এই সুখের এমন কোনো বিধানতন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, যে-বিধানতন্ত্র স্থির করবে কোনটি নিষিদ্ধ আর কোনটিই বা নয়, সম্পর্ক নেই কোনো উপযোগিতার মাপকাঠির সঙ্গেও।'[২]

বলাই বাহুল্য, ফুকোর এই ধারণা সর্বৈব ভুল! প্রাচীন ভারতে নিশ্চয় কামের নন্দনতাত্ত্বিক চর্চার ঝোঁক ছিল, কিন্তু তাতে কোনো 'বিধানতন্ত্রে'র খবরদারি ছিল না এমনটা ভাবলে অবশ্যই ভুল করা হবে।

'যৌনতা' বিষয়ে ভারতের বিশ্বব্যাপী খ্যাতির কারণ যে 'কামসূত্র', বাৎস্যায়নের সেই বইটির উপরেই প্রথমে চোখ বোলানো যাক। 'কাম'-এর অমঙ্গলকারী ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বাৎস্যায়ন। স্পষ্টই বলেন তিনি ঃ

> 'ইহাও শুনা যায়, বহু ব্যক্তি কামের বশবর্ত্তী হইয়া সদলে বিনষ্ট হইয়াছে। ...যথা ভোজবংশীয় দাণ্ডক্য কামবশে ব্রাহ্মণকন্যাকে স্বভোগ্য করিয়া (তৎপ্রতি অত্যাচার করিয়া) স্বজন ও রাষ্ট্রসহ বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল।'[৩]

ফলে কাম-সাধনাতেও হরেক বিধি-নিষেধ আরোপ করেন স্বয়ং বাৎস্যায়ন। 'লোকবহির্ভূত অসাধু ব্যবহার'[৪] বলে ধিক্কারও জানান, কামচর্চার বিশেষ ধারাকে। কোন্ সে ধারা?

> 'অন্যের বিবাহিতা সবর্ণাতেও প্রবর্ত্ত্যমান সংযোগ পুত্রের নিমিত্ত ও যশের নিমিত্ত হয় না এবং তাহা লৌকিক ব্যবহারের বহির্ভূত হয়। ইহাও নিষিদ্ধ। ইহা সুখের জন্যও হয় না। কারণ এই নিষেধ রাজবিধি অনুমোদিত, এই নিষেধাতিক্রমে রাজদণ্ড হয়।'[৫]

এর থেকে স্পষ্ট যে 'পরকীয়া'য় বাৎস্যায়ন আগ্রহ দেখাননি, এবং 'কামসেবা' তাঁর মতে মুখ্যত গার্হস্থ্যের গণ্ডিতেই অনুশীলনযোগ্য। লক্ষণীয়, বাৎস্যায়ন 'কামসূত্র'-এর দ্বিতীয় অধিকরণ 'কন্যাসম্প্রযুক্ত' এবং তৃতীয় অধিকরণ 'ভার্যাধিকরণ' জুড়ে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের কথাই আলোচনা করেছেন।

'কামসূত্র'-এর পঞ্চম অধিকরণ 'পারদারিক'-এ অবশ্য পরকীয়া নিয়েই বিস্তারে আলোচনা করেছেন বাৎস্যায়ন। কিন্তু, তাতেও রয়েছে বিশেষ উদ্দেশ্য। রাষ্ট্রের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বাৎস্যায়ন মুখ্যত 'কামসূত্র'-এর পুরুষ-পাঠকদের বুঝিয়ে দিতে চান 'পারদারিক' অধ্যায়ের দ্বিমুখী তাৎপর্য ঃ

> **এক.** পুরুষ-পাঠকদের জন্য চেতাবনি—অবাধ কামচর্চায়, বিশেষতঃ 'পরকীয়া'য় লাগাম টানবার আদেশ দেন বাৎস্যায়ন—'প্রয়োগ-পাক্ষিক অর্থাৎ উপায় প্রয়োগে ফল হইতেও পারে, নাও পারে; অপায় অর্থাৎ অনিষ্ট প্রায়ই দেখা যায়; ধর্ম্মের প্রতিকূল আবরণ এবং অর্থ ক্ষতি ইহা ত আছেই; অতএব পারদারিক কর্ম্ম—পারদার্য্য অর্থাৎ পরস্ত্রীগ্রহণ কদাচ করিবে না।'[৬]
>
> **দুই.** আবারও পুরুষ-পাঠকের উদ্দেশ্যেই—তবে এবারে বাৎস্যায়নের সাবধানবাণী। 'পারদারিক' অধ্যায় সু-অধীত হলে, 'ঘরের বউ'-এর চালচলনের উপর নজর রাখাটাও তো সুবিধাজনক!—'শাস্ত্রানুসারে পারদারিক অধিকরণ-লক্ষিত যোগসমূহ দর্শন করিয়া শাস্ত্রবিৎ হইলে নিজের পত্নী সম্বন্ধে অপরের নিকট ছলনা-প্রাপ্তি ঘটে না।'[৭]

'পরিবার'কে যেন আহত না করে 'যৌনতা'—এ'বিষয়টি নিয়ে বাৎস্যায়নের মতোই ভাবিত ছিলেন মনুও। 'মনুসংহিতা'র নবম অধ্যায়ে তাই মনু আদর্শ দাম্পত্যকে সংজ্ঞায়িত করেন এইভাবেইঃ

> 'মরণ পর্যন্ত পরস্পরের অব্যভিচার—স্ত্রী পুরুষের সংক্ষেপে এই শ্রেষ্ঠ ধর্ম।'[৮]

সমস্যা তবু রয়ে যায়। এত ভালো ভালো কথা সবাই কি আর শুনতে চাইত? যারা শুনতো না, তাদের জন্য তবে কি নিদান হেঁকেছিলেন প্রাচীন ভারতের স্মৃতিকারেরা? বলাই বাহুল্য, সে নিদান শাস্তির। মনুর সুরে সুর মিলিয়েই কৌটিল্যও রাষ্ট্রের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় ভেবেছিলেন—'পুত্রোৎপাদনের জন্যই স্ত্রী গ্রহণ করা হয়।'[৯] ফলে দাম্পত্যে আঘাত-হানা অবৈধ যৌনতা তথা ব্যভিচার তাঁরও না পসন্দ। 'অর্থশাস্ত্র'এর চতুর্থ অধিকরণ 'কন্টকশোধন'-এই তিনি শোনান, এ জাতীয় অপরাধের লোমহর্ষক শাস্তি ঃ

> ‘মাসী, পিসি, মামী, গুরুপত্নী, পুত্রবধূ, কন্যা ও বোনের উপর ব্যভিচার করলে তার লিঙ্গ ও অণ্ডকোষ ছেদন বা মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যেতে পারে। ঐ রমণীরা কামাসক্ত হয়ে ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তাদের স্তন ও ভগচ্ছেদনসহ মৃত্যুদণ্ড হবে।’[১০]

একা মনু বা কৌটিল্য নয়, প্রাচীন ভারতে একাধিক স্মৃতিকার যৌন-অপরাধে কঠোরতম শাস্তি প্রদানেরই পক্ষপাতী ছিলেন তা লক্ষ করা যেতে পারে। যৌন-অপরাধের মধ্যেও ঘৃণ্যতম ছিল অগম্যাগমন ঃ

> ‘অগম্যাগমন (incest) তীব্রভাবে নিন্দিত হয়েছে এবং এই অপরাধে কঠোর দণ্ড বিহিত হয়েছে। নারদের মতে (১৫.৭৩-৭৫) অগম্যা স্ত্রীলোক নিম্নলিখিতরূপ: বিমাতা, মামীমা, শাশুড়ি, কাকীমা, মাসীমা, পিসীমা, বন্ধুপত্নী, ছাত্রপত্নী, ভগ্নি, ভগ্নিবান্ধবী, পুত্রবধূ, কন্যা, আচার্যানী, ধাত্রী, অপরের সাধ্বী স্ত্রী, উচ্চবর্ণের নারী। এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত পুরুষের লিঙ্গচ্ছেদন।’[১১]

যৌনতা সংক্রান্ত প্রাচীন ভারতের এই ধারণাই ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে প্রাক্ ঔপনিবেশিক বঙ্গীয় স্মৃতিশাস্ত্রে। মুখ্যত ভবদেবের ‘প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ’, শূলপাণির ‘প্রায়শ্চিত্তবিবেক’ আর রঘুনন্দনের ‘প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব’ ঘাঁটলেই বেরিয়ে পড়ে দাম্পত্য-যৌনতা সম্পর্কে বাঙালি স্মৃতিকারদের মতামত। ‘গুর্বঙ্গনাগমন’কেই ‘মহাপাতক’ বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন তাঁরা। বাঙালি সমাজে চলিত ব্যভিচারের আভাস মেলে ‘গুর্বঙ্গনা’ শব্দের ব্যাখ্যায় ঃ

> ‘গুর্বঙ্গনাজনিত পাপের আলোচনা প্রসঙ্গে কোন কোন স্থানে ‘গুরুতল্প’ শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে; এই শব্দটির দ্বারাও বাংলার নিবন্ধকার মাতাকেই বুঝিয়াছেন। ...‘অতিদেশে’র সাহায্যে মাতার সপত্নী, ভগ্নী, আচার্যকন্যা, আচার্যানী এবং স্বীয় কন্যা—প্রভৃতির সহিত যৌন সম্বন্ধকেও গুর্বঙ্গনাগমনের তুল্য বিবেচনা করা হইয়াছে।’[১২]

এই জাতীয় যৌন-পাপে বাঙালি স্মৃতিকারেরা অজস্র ‘প্রায়শ্চিত্ত’-এর কথা বলেছেন। লক্ষ করা যেতে পারে প্রাচীন ভারতে যৌন-ব্যভিচারের শাস্তি যেমন ‘শরীর’ সংক্রান্ত, তেমনই বাঙালি সংস্কৃতিতে সেই পাপের ‘প্রায়শ্চিত্ত’-ও মুখ্যত ‘শরীর’-এর ‘শুদ্ধি’কেন্দ্রিক। দু’একটি ‘প্রায়শ্চিত্ত’-এর নমুনা দেখা যাকঃ

> **এক.** চান্দ্রায়ণ ঃ ‘মনুমতে—কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদে পঞ্চদশ গ্রাস আহার করিয়া তৎপর অমাবস্যা পর্যন্ত প্রতিদিন এক গ্রাস করিয়া খাদ্যহ্রাস এবং শুক্লপক্ষের প্রতিপদে এক গ্রাস বৃদ্ধি করিয়া দুই গ্রাস ও এইরূপে প্রতিদিন এক এক গ্রাস বৃদ্ধি করিয়া পূর্ণিমাতে উপবাস।’[১৩]
>
> **দুই.** তপ্তকৃচ্ছ্র ঃ ‘যাজ্ঞবল্ক্যমতে—তপ্তজল, তপ্তদুগ্ধ, তপ্তঘৃত, উত্তপ্ত দুগ্ধের বাষ্প—ইহাদের প্রত্যেকটি দ্রব্য তিন দিন করিয়া গ্রহণ।’[১৪]

কী হবে এই 'প্রায়শ্চিত্ত' করলে? যে 'পাপ' হয়েছে, তার স্ক্ষালন ঘটবে। সুন্দর একটি উপমা দিয়ে বিষয়টিকে বোঝান রঘুনন্দন ঃ

> 'ক্ষার, উত্তাপ, প্রচণ্ড আঘাত এবং প্রক্ষালনের ফলে যেমন মলিন বস্ত্র পরিষ্কৃত হয়, তেমনভাবেই তপশ্চর্যা, দান ও যজ্ঞের দ্বারা পাপী পাপমুক্ত হয়।'[১৫]

অর্থাৎ যৌন-ব্যভিচারজনিত কারণে 'সঞ্চিত পাপ'কে ধুয়ে ফেলাই 'প্রায়শ্চিত্ত'-এর উদ্দেশ্য। এতে করে পাপ করার পর, তাকে ধুয়ে ফেলার চেষ্টা আছে, কিন্তু পাপ না-করার অগ্রিম শপথ গ্রহণের চেষ্টা নেই, তা লক্ষণীয়। উপনিবেশপূর্ব বাঙালি সংস্কৃতিতে মুখ্যত এই ধারণারই প্রভাব আমরা লক্ষ করবো।

প্রাক্ ঔপনিবেশিক বাঙালি ও যৌনতা ঃ

উপনিবেশপূর্ব বাঙালি কবির খুব পছন্দসই বিষয় ছিল 'কলিযুগবর্ণন'। এর মধ্যে দিয়ে একভাবে সমকালীন ধর্মীয় বা সামাজিক বিচ্যুতিগুলির সমালোচনা করবার অবকাশ খুঁজে পেতেন কবিরা। এরকমই এক রচনায়, জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল'-এ মেলে নারী-পুরুষের অবাধ কামচর্চার সংবাদ ঃ

> 'সর্বলোক হৈল শিশ্নোদরপরায়ণ।
> .....
> মা বাপ ছাড়িব পুত্র স্বতন্ত্র যুবতী
> পরদারে রত হৈল লঙ্ঘে নিজপতি।'[১৬]

আর রূঢ় বাস্তবের ছবিটাও উঠে আসে জগাই-মাধাইয়ের বর্ণনায় ঃ

> 'নবদ্বীপে ব্রহ্মদৈত্য জগাই মাধাই
> ধুতালিয়া দুষ্ট চোর দস্যু দুই ভাই।
> .....
> অন্ন যোনি বিচার নাহিক দুই ভাই
> স্নান সন্ধ্যা বিবর্জ্জিত জগাই মাধাই।
> গোবধ ব্রহ্মবধ স্ত্রীবধ জত
> ছলে বলে গুরুপত্নী হরে শত শত।'[১৭]

অবাধ কামবাসনার আঘাতে জর্জরিত দাম্পত্যের আখ্যান উপনিবেশপূর্ব বাংলা সাহিত্যে বেশ সুলভ।

'মহাজ্ঞান' হরণার্থে দেবী মনসা যখন লাস্যময়ী নটীর বেশে ছয় পুত্রের জনক বণিক চন্দ্রধরকে প্রলোভিত করতে চান, তখন চাঁদ সদাগর ঃ

‘কামে গদগদ: হয়্যা বিদগধ: কহে সবিনয় কথা।।
শুনহ সুন্দরী: দন্তে তৃণ ধরি: প্রাণরক্ষা কর মোর।
ছটি পুত্র মোর: কাটি পাএ তোর: সনকারে দিব দাসী।
যত শোক পাব: সব বিসরিব: হেরিলে তোমার হাসি।’[১৮]

চাঁদের এই বল্‌গাহীন বাসনাই তার পরিবারকে ঠেলে দেবে ধ্বংসের মুখে। অসংযত কামনা কতদূর বিধ্বংসী হয়ে উঠতে পারে, তার আরেক উদাহরণ রূপরাম চক্রবর্তীর ‘ধর্মমঙ্গল’-এ শিবা বারুইয়ের বউ নয়নী। ‘স্বতন্তরা’ এই রমণী রতিবিলাসে আহ্বান জানায় লাউসেনকে ঃ

‘অস্থির আমার মন ঘরে নাই স্বামী।
পরিচয় পাইলে তোমার সঙ্গে যাব আমি।।
.....
কাড়চে রাখিব তোমা চাঁপা ফুল বলি।
আমি হব পদ্মফুল তুমি হবে অলি।।’[১৯]

প্রত্যাখ্যাত হয়ে, লাউসেনকে ‘মিছে অপবাদ’ দেওয়ার জন্য নিজের শিশুসন্তানকে হত্যা করে নয়নী ঃ

‘নয়নী চিন্তিল মনে কি বুদ্ধি করিব।
এ হেন নাগরে মিছে অপবাদ দিব।।
কূয়ায় ফেলিব শিশু এহার লাগিয়া।
বন্দিখানা দিব আজি এ বুদ্ধি করিয়া।।
পাসরিব পুত্রশোক দেখিলে এহারে।
কোলের বালকে পথে কাছাড়িয়া মারে।।
ঘাড় মুচড়িয়া শিশু পেলিল কূয়ায়।
পরিত্রাই ডাকে মাগী চারিপানে চায়।।’[২০]

পুরুষ হোক বা নারী, দাম্পত্যের আওতায় থাকা যে কোনো একজনের অসংযত কামবাসনাই ধ্বস্ত করে দিতে পারে পরিবারের ভিত; নাড়িয়ে দিতে পারে সমাজ বা রাষ্ট্রের ভিত্তিমূল। তাই, কৃষ্ণের জীবনকথা লিখতে বসে মালাধর বসু স্পষ্টই বলে দেন যে ‘রাস’-এর মতো লীলা দেবতাদেরই মানায়, আমজনতা ভুলেও যেন দেবতার দোহাই পেড়ে ও’সব নক্ল করতে না যায়; করলেই সর্বনাশ ঃ

‘ধর্ম্মময় গোসাঞি কেন হেন কর্ম্ম করি।
সংসারের সার হৈয়া হরে পরনারি।।
আত্মপর নাহি তার জগত ভিতরে।
পাপ পুণ্য জত তাঁর না লাগে সরিরে।।
.....
সংসারিকা লোক না করিহ পরদার।
পরদার অধিক পাপ না জানিহ আর।।
চৌরাসি নরক কুণ্ড জত জমলোকে।
পরদার করিলে তা ভূঞ্জয়ে একে একে।।
না করিহ পরদার সুন সর্ব্বজনে।
পরনারি পরসনে নরকে গমনে।।’[২১]

আর এরই বিপরীতে তাই প্রাক্ ঔপনিবেশিক বাংলা সাহিত্যে দু’একটি ব্যতিক্রমী দাম্পত্যের ছবিও ধরা পড়ে, কামনা যেখানে আঘাত হানতে ব্যর্থ হয়েছে। যেমন, কালকেতু ফুল্লরার দাম্পত্য। সুস্থ সবল কালকেতু ও ফুল্লরার সংসারে দারিদ্র্যের সমস্যা থাকতে পারে, কিন্তু পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস তথা ‘প্রেম’-এর অভাব নেই। তাই রূপসী যুবতীরূপিনী দেবী চণ্ডীর প্রলোভনকে অনায়াসে জয় করার ক্ষমতা রাখে কালকেতু ঃ

‘মাতা ছাড় এই স্থান মাতা ছাড় এই স্থান
আগুনি যে রক্ষা করি আপনার মান।
.....
বড়ার বহুআরী তুমি বড় লোকের ঝি
তোমার মোহন রূপে মোর লাভ কি।’[২২]

শুধু কামনার সংযম নয়, সেই সঙ্গে দাম্পত্য তথা পরিবারের প্রতি ভালোবাসার ব্যতিক্রমী ছবিও আমরা দেখতে পাই উপনিবেশপূর্ব বাংলা সাহিত্যে। কৃত্তিবাসের রামায়ণ থেকে অপহৃতা সীতার উদ্দেশ্যে বলা রামের কাতরোক্তি স্মরণে আসে সহজেই ঃ

‘সীতা বিনা নাহি রামের মুখে অন্য বাণী।
সীতা সীতা বলি রাম উঠিলা তখনি।।
.....

ত্রিভুবনে নাহি আর সীতা হেন নারী।
কেমনে সীতারে আমি পাশরিতে পারি।।
.....
সাগরসঙ্গমে গিয়া কাম্য করি মরি।
জন্মে জন্মে পাই যেন সীতা হেন নারী।।'[২৩]

অর্থাৎ, উপনিবেশপূর্ব বাংলা সাহিত্যেও কবিরা মুখ্যত কামনার আঘাতে বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়া পরিবারের স্বপক্ষেই কথা বলেছেন। ব্যতিক্রম মাত্র একটি ক্ষেত্র: বৈষ্ণব পদাবলী। অনভিপ্রেত দাম্পত্যে প্রবেশে বাধ্য-হওয়া রাধার প্রেমবাসনাকে অস্বীকার করার ক্ষমতা হয়নি কারোরই। ফলে রাধার মুখে বারংবার উচ্চারিত হয়েছে পরিবারকে অস্বীকার করা কামনার এক উর্ধ্বায়িত বাচন ঃ

'সই কি আর বলিব তোরে।
বহু পুণ্যফলে সে হেন বঁধুয়া
আসিয়া মিলিল মোরে।।
নহি স্বতন্তর গুরুজনে ডর
বিলম্বে বাহির হৈনু।
আহা মরি মরি সঙ্কেত করিয়া
কত না যাতনা দিনু।।
বঁধুর পিরীতি আরতি দেখিয়া
মোর মনে হেন করে।
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া
আনল ভেজাই ঘরে।।'[২৪]

উপনিবেশ ও যৌন-নৈতিকতা ঃ

প্রাক্ ঔপনিবেশিক বাঙালি সংস্কৃতিতে সুস্থিত পরিবার তথা দাম্পত্যের বোধ স্বল্প হলেও ছিল। যদিও বেশি ছিল কামনার আক্রমণ। সেই আঘাতের হাত থেকে দাম্পত্যকে বাঁচাবার জন্য রাষ্ট্রের তরফে শাস্তিমূলক নজরদারির বন্দোবস্তও ছিল, যার প্রমাণ 'স্মৃতিশাস্ত্র'। ফলে, সমাজে একরকমের নৈতিক বাঁধুনি ছিল। কিন্তু, উনিশ শতকে এসে বদলে গেল সবটাই। সেই সঙ্গে বদলে গেল বাঙালির যৌন-নৈতিকতার বোধও।

কোম্পানির হাত ধরে ভারত ইংল্যান্ডের উপনিবেশে পরিণত হওয়ার প্রথম যুগেই সর্বাগ্রে পরিবর্তিত

হল ভারতের সামন্ততান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থা ও তার উপর নির্ভরশীল অর্থনীতি। 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' নামক সেই আশ্চর্য ব্যবস্থার পটভূমি চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেন ঐতিহাসিক রণজিৎ গুহ ঃ

> 'তরুণ গরুড়ের মতো প্রবল ক্ষুধায় কোম্পানির রাজস্বনীতি দেওয়ানি হাতে পেয়েই বাংলার আদিম কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়। জমিদারির বদলে ইজারাদারি এবং নবাবি আমলার পরিবর্তে কলেক্টরি ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে রাজস্ব আদায়ের সঙ্গে গ্রাম্য অর্থনীতির নাড়ির যোগ ছিন্ন হলো; অপরপক্ষে, দেশজ শিল্পের একাধিক শাখায় কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করে এবং বয়ন-শিল্পকে কোম্পানির কুঠির নিষ্ঠুর বিধানের জালে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে গ্রাম্য-শিল্পীকে পরিণত করা হলো ভূমিহীন কৃষকে এবং কুটিরশিল্পী কৃষককে শ্রমজীবীতে। ... চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যথার্থ উৎপত্তিকাল তাই ১৭৭৫ থেকে ১৭৯৩ সাল। বলা বাহুল্য, আগের পর্যায়ের ভাঙনের কাজ এই যুগেও চলেছে : পুরোনো জমিদারি ব্যবস্থার চূড়ান্ত সর্বনাশ এই যুগেই ঘটে, সেচের অভাবে গ্রাম্য কৃষিব্যবস্থায় নিদারুণ সঙ্কট দেখা দেয়, একাধিক দুর্ভিক্ষ বাংলা ও বিহারে বিপর্যয় আনে, এবং কৃষকদের মধ্যে বেকারি ও দারিদ্র্যের তীব্রতা আরো বৃদ্ধি পায়।'[২৫]

পুরনো অর্থনীতির সম্পূর্ণ বদল না হলেও, যে আধা-খেঁচড়া বদল ঘটল, তা-ই প্রভাব বিস্তার করল, নতুন ঔপনিবেশিক শহরগুলিতে। গ্রামসমাজে 'বৃত্তি'র যে অচলতা ছিল, তা কেটে গিয়ে শহরে এল 'বৃত্তি'র সচলতা। শহরে 'মাটিমুঠা' ধরতে জানলেই হল; 'সোনামুঠা' তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। যে কোনো উপায়ে অর্থ উপার্জন করা যায়, এতে কোনো 'পাপ' নেই, অর্থই সব—উপনিবেশের নৈতিকতার প্রথম পাঠ এটিই! হবে না-ই বা কেন? ভারতের সনাতন যে জাতি-বর্ণ-ভিত্তিক সমাজ-কাঠামো, তাকে ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছিল এই নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। তাই 'কালীপ্রসাদী হেঙ্গাম' উপলক্ষে, হঠাৎ-ধনী রামদুলাল সরকার অনায়াসেই এই স্পর্ধিত উক্তি করতে পারেন, যে—'জাতি আমার বাক্সের ভিতর'।[২৬] আর কালাপানি পেরোবার দায়ে দেশে ফিরে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে কি না, ম্যাক্সমূলারের এই প্রশ্নের উত্তরে, শহুরে হঠাৎ-ধনী জমিদার, পিরালী বামুনের উত্তর-পুরুষ 'প্রিন্স' দ্বারকানাথ ঠাকুর 'হেসে' জানান—'না, দেশে সারাক্ষণই আমি বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণকে ভোজন করাচ্ছি। প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে তাই যথেষ্ট।'[২৭] বোঝা যায়, উপনিবেশের নতুন অর্থনীতির আঁচে পেকে উঠছিল নৈতিকতার নব্য-সংহিতা; প্রাক্ ঔপনিবেশিক নীতিশাস্ত্র থেকে তা বহু দূরবর্তী।

পাপ-পুণ্যের ভয় অপসৃতপ্রায়, আর অর্থের বিনিময়ে খরিদ করা যায় সবকিছু—এই দু'টি নতুন ধারণা উপনিবেশের দাম্পত্য-পরিবার-যৌনতা সব কিছুকেই প্রভাবিত করল প্রবলভাবে। সঙ্গতভাবেই,

ঔপনিবেশিকতার সূত্রপাতে বাঙালি সংস্কৃতিতে অবাধ কাম-চর্চার এক নীতিহীন অভ্যাস গড়ে উঠছিল। শিবনাথ শাস্ত্রীর স্মৃতিচারণে পাই ঃ

> 'সে সময়ের যশোহর নগরের বিষয়ে এরূপ শুনিয়াছি যে, আদালতের আমলা, মোক্তার প্রভৃতি পদস্থ ব্যক্তিগণ কোনও নবাগত ভদ্রলোকের নিকটে পরস্পরকে পরিচিত করিয়া দিবার সময়ে—''ইনি ইঁহার রক্ষিতা স্ত্রীলোকের পাকা বাড়ী করিয়া দিয়াছেন''—এই বলিয়া পরিচিত করিতেন। রক্ষিতা স্ত্রীলোকের পাকা বাড়ী করিয়া দেওয়া একটা মানসম্ভ্রমের কারণ ছিল। কেবল কি যশোহরেই? দেশের সর্ব্বত্রই এই সম্বন্ধে নীতির অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল।'[২৮]

'যশোহর'-এর যেমন, তেমনি একই অবস্থা সেদিন কলকাতারও। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে 'বটতলা' থেকে মুদ্রিত শ্যামাচরণ শান্যালের (Sic.) 'হদ্দ মজা রবিবার' বইতে পাই সেই অ-নৈতিকতার চিত্র ঃ

> 'ধন্য কল্কেতা সহর ধন্য রবিবার।
> ধন্য ধন্য সোনাগাজি ধন্য শোভা তার॥
> .....
> শনিবারে সদাশিব ত্যাজিয়া কৈলাস।
> এখানে আসিয়া সুখে করেন বিলাস॥
> সুরসিক কৃষ্ণচন্দ্র ত্যাজি বৃন্দাবন।
> নিত্য হেথা অবতীর্ণ লীলার কারণ॥
> .....
> দেবদেবী ব্রাহ্মণের পদে নাহি মতি।
> রতি মহোৎসবে কিন্তু অচলা ভকতি॥'[২৯]

লক্ষণীয়, শেষ দুই পংক্তিতে উপনিবেশপূর্ব নৈতিকতার ভাঙনের চিত্রটি স্পষ্ট।

প্রত্যক্ষত উপনিবেশের এই নীতিহীনতার ছত্রছায়ায় পুরুষের যৌন-ব্যভিচারের বাড়বাড়ন্ত দেখা দিলেও, অচিরেই তা প্রভাবিত করল অন্দরমহলকেও। বেশি নয়, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবুবিলাস'-এর উদাহরণটিই যথেষ্ট। 'নববাবু'র স্ত্রী তাঁকে অর্থ-অলঙ্কারাদি দিয়ে সাহায্য করে, বিনিময়ে বেশ্যাসক্ত বাবুর থেকে আদায় করে নেয় জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে একটি বিবৃতি ঃ

> 'তিনি কহিলেন আমি বুঝিয়াছি তোমার বড়ই টাকার দরকার হইয়াছে, কিন্তু সব দিতে পারি যদি তুমি সকলের সাক্ষাতে বল যে আমি অদ্য দুই মাসাবধি প্রতিদিন বাটির মধ্যেই শয়ন করিতেছি। বাবু কহিলেন তাহার আটক কি এ কথা আমি সকলকেই সর্ব্বদা কহিত তুমি টাকা দেও।'[৩০]

চাকরের নিয়মিত মনিবানীর শয়নকক্ষে প্রবেশ, এবং অবশেষে 'বাবু'র সন্তানলাভ এ কাহিনির অবশ্যম্ভাবী ফল।

সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার, মধ্যবিত্তের উত্থান এবং আরো নানা কারণে বদল ঘটতে থাকল এই পরিস্থিতির। গড়ে উঠতে থাকল নব্য-নীতি-সংহিতা।

মধ্যবিত্ত ও অনুশাসন ঃ

যৌন ব্যভিচারে হাতে-নাতে ধরা পড়ে-যাওয়া সুন্দরকে বর্ধমানরাজ বীরসিংহ মশানে পাঠান কোতল করার আদেশ দিয়ে ঃ

'নৃপ আজ্ঞা দিল কোপে কোটালিআ বীরদাপে
চোরেরে রাখিহ সাবধানে।
যত অনুচর বেড়ি দিয়া ঢেকা ধরি দড়ি
অতি বেগে লইল মশানে।।
খরতর কোতোয়াল বাতুলায় তরোয়াল
চোরের স্কন্ধের সন্নিকটে।'[৩১]

প্রাক্ ঔপনিবেশিক ভারত বা বাংলাদেশে রাষ্ট্রের খবরদারি এমনটাই; সোজা-সাপ্টা। যদি দোষ করে থাকো, তবে শ্রবণগোচর-দৃষ্টিগ্রাহ্য এবং শরীরে অনুভববেদ্য শাস্তি পাবে তুমি। 'স্মৃতিশাস্ত্র'গুলিও এমনই সব শাস্তির খবরেই ভর্তি। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র'-এর চতুর্থ অধিকরণ 'কণ্টকশোধন' থেকে দেখে নেওয়া যাক যৌন-ব্যভিচারের জন্য ধার্য কিছু শাস্তির নমুনা ঃ

> 'কেউ সমবর্ণা নাবালিকা কন্যাকে ধর্ষণ করলে তার হস্তচ্ছেদ বা ৪০০ পণ দণ্ড এবং ধর্ষণজনিত রক্তপাতে বালিকাটি মারা গেলে বধদণ্ড দেওয়া হবে।... পতির প্রবাসকালে স্ত্রী কারো সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হলে পতির আত্মীয়েরা স্ত্রী ও নাগরকে আটক রাখবে। পতি ফিরে এসে স্ত্রীকে ক্ষমা করে দিলে উভয়েই ছাড়া পাবে। পতি স্ত্রীকে ক্ষমা না করলে স্ত্রীর নাসা-কর্ণচ্ছেদ ও নাগরের বধদণ্ড দেওয়া হবে।'[৩২]

এই শাস্তি শরীরে বাজে, মনে নয়। আর ঠিক এই ক্ষেত্রেই উপনিবেশের ধারণা একেবারে বিপরীত মেরুর। উপনিবেশীরা শুধু উপনিবেশিতের ভূমিখণ্ড চায় না; সেইসঙ্গে দখল করতে চায় উপনিবেশিতের 'চৈতন্য'কেও। কেননা, জানাই আছে এ'কথা যে, উপনিবেশিতের 'চৈতন্য'কে দখলে না রাখতে পারলে; বশ্য-নম্র-বাধ্য করে গড়ে না তুলতে পারলে, যতই কেননা বজ্র আঁটুনি দিয়ে বাঁধতে চাও উপনিবেশিত ভূমিখণ্ডকে, শেষতক্ তা 'ফস্কা গেরো' হয়ে যাবেই যাবে। তাই, আধুনিক রাষ্ট্রক্ষমতা, এই চৈতন্যের

বেয়াড়াপনাকে দমন করবার জন্য, উপনিবেশের প্রজাদের বাধ্য-নম্র করে গড়ে তুলবার জন্য, 'শাস্তি'র বদলে নিয়ে এল নতুন এক ব্যবস্থা—'অনুশাসন' বা 'discipline'. ঐতিহাসিকের ব্যাখ্যায় ঃ

> 'আধুনিক ক্ষমতাতন্ত্র আদৌ সার্বভৌমত্বের ছক অবলম্বন করে চলে না। তা চলে অনুশাসন বা ডিসিপ্লিনের ছকে।....শাস্তির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা নয়, দোষীকে সংশোধন করা। সেজন্য দণ্ডও হওয়া উচিত শারীরিক নির্যাতন নয়—দোষীকে নজরবন্দী করে তাকে সামাজিক অনুশাসনে শিক্ষিত করে তোলা। ...এই শাসন শারীরিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে না, তা কাজ করে মানুষের চেতনায়। অনুশাসনের উদ্দেশ্য সার্বভৌম শক্তির ভয় দেখানো নয়, তার উদ্দেশ্য স্বশাসন। আধুনিক সমাজব্যবস্থা...কেন্দ্রহীন সর্বব্যাপী এক অনুশাসনতন্ত্র, যেখানে সকলেই স্বাধীন, অথচ স্বাধীনভাবেই তারা অনুশাসনের শৃঙ্খল পরতে রাজি।'[৩৩]

এ'সব কথা ভালোভাবেই বুঝতেন ইংরেজ 'ইউটিলিটারিয়ান' প্রশাসকরা; বুঝেছিলেন তাদের মুখ্য প্রতিনিধি চার্লস ব্যাবিংটন মেক্‌লেও। তাই অনুশাসনতন্ত্রের ছায়ায় বড়ো করে তুলতে চেয়েছিলেন এমন এক বশ্য-বাধ্য-চাকুরিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে, যাদের 'রুচি' এবং 'নৈতিকতা'র সবটাই হবে সাগর পারের আমদানি করা! মনে করুন, ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারির সেই ইতিহাসখ্যাত 'minute'-এ, মেকলের মধ্যবিত্ত পাশ্চাত্য-রুচিসম্পন্ন শ্রেণি-নির্মাণ-প্রকল্পের ঘোষণা ঃ

> 'who may be interpreters between us and the millions whom we govern– a class of persons Indian in colour and blood, but English in taste, in opinions, in morals, and in intellect.'[৩৪]

১৮১৭-র হিন্দু কলেজ থেকে, ১৮৩৫-এর 'মিনিট' হয়ে শেষতক ১৮৫৭-র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতেই বাস্তবায়িত হল মেক্‌লের প্রকল্প। নবোদ্ভূত ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি ভদ্রলোকদের 'Opinions' এবং 'morals' গড়ে উঠল প্রতীচ্যের ছাঁচে; বিশেষত যৌন-নৈতিকতার ক্ষেত্রে। মনে পড়বে আমাদের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে কলকাতানিবাসী 'প্লণ্ডর ফেয়ারলির বাড়ির মুৎসুদ্দি' শ্রীশচন্দ্র মিত্র, তাঁর শ্যালক নগেন্দ্রকে দ্বিতীয় বিবাহের জন্য তিরস্কার করলে, প্রত্যুত্তরে নগেন্দ্রর জবাব—'তুমি বলিবে, দুই বিবাহ নীতি-বিরুদ্ধ কাজ। ভাই, কিসে জানিলে ইহা নীতি-বিরুদ্ধ কাজ? তুমি একথা ইংরেজের কাছে শিখিয়াছ, নচেৎ ভারতবর্ষে এ কথা ছিল না।' (পৃ.৭৭) 'ভারতবর্ষে' ছিল না, এমনসব নীতিকথা বাঙালি মধ্যবিত্ত শিখছিল কোথা থেকে? মুখ্যত ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে প্রতীচ্যের সাহিত্য ও দর্শন থেকে।

'বঙ্গীয় যুবক' ও প্রতীচ্য কবি ঃ

অবাধ কামবাসনাতে লাগাম দিয়ে দাম্পত্য একনিষ্ঠতার নব্যনীতি কায়েম করতে চাইছিলেন উনিশ শতকের বাঙালি মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা। সেদিন তাঁদের চিন্তার উৎস প্রতীচ্য কাব্য। মিল্টনের 'প্যারাডাইস লস্ট' থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে মধুসূদন ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ রচনা করেন ইন্দ্রজিৎ ও প্রমীলার এক আবেগঘন দাম্পত্য-চিত্র ঃ

'প্রমীলার করপদ্ম করপদ্মে ধরি
রথীন্দ্র, মধুর স্বরে, হায় রে, যেমতি
নলিনীর কানে অলি কহে গুঞ্জরিয়া
প্রেমের রহস্য কথা, কহিলা (আদরে
চুম্বি নিমীলিত আঁখি) ''ডাকিছে কূজনে,
হৈমবতী ঊষা তুমি, রূপসি, তোমারে
পাখি কুল; মিল, প্রিয়ে, কমল-লোচন!
উঠ, চিরানন্দ মোর! সূর্যকান্তমণি—
সম এ পরাণ, কান্তা; তুমি রবিচ্ছবি;—
তেজোহীন আমি তুমি মুদিলে নয়ন।
ভাগ্য-বৃক্ষে ফলোত্তম তুমি হে জগতে
আমার।'[৩৫]

১২৮৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যা 'বঙ্গদর্শন'-এ 'মেঘনাদবধ কাব্য সম্বন্ধে কয়টি কথা' প্রবন্ধে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, মধুসূদনের উক্ত রচনার স্মৃতিচারণ করে লেখেন ঃ

> 'মেঘনাদবধ কাব্য' যখন লিখিত হয়, তখন বঙ্গসমাজে সবেমাত্র পাশ্চাত্য জ্ঞানচর্চ্চার উন্নতি আরম্ভ হইতেছিল। সুশিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক, হৃদয়ে যে সাম্যভাব ধারণ করিলেন, গৃহে তাহা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাই অবগুণ্ঠনবতী ব্রীড়াসঙ্কুচিতা বঙ্গনারীকে প্রমীলার বেশে দেখিয়া কৃতবিদ্য যুবক তখন মোহিত হইয়াছিলেন।'[৩৬]

'কৃতবিদ্য যুবক'রা এই নব্য-দাম্পত্যের রসাস্বাদন করছিলেন বলেই মিল্টনের ওই অংশের অনুবাদ করেন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ও। 'রহস্য সন্দর্ভে' প্রকাশিত সেই অনুবাদের নাম 'আদিম নরদম্পতীর প্রাতরূপাসনা'।[৩৭] একা মিল্টন নন, সেদিন আরো অনেকেই বাঙালির মন্ত্রদাতা গুরু! বায়রন, স্কট, পোপ, মুর, বার্নস, শেলি, কীটস, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ প্রমুখদের রচনা সেদিন বাঙালির ঠোঁটস্থ। তবে সবচেয়ে বেশি প্রভাব যিনি

বিস্তার করেছিলেন বাঙালির মন-মগজে, তিনি অবশ্যই শেক্সপিয়ার। 'বিষবৃক্ষ'-এ তাঁকে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, 'যথার্থ প্রণয়' (পৃ. ৯০)-এর কবি। আর বৈশাখ ১২৮২-র 'বঙ্গদর্শন'-এ 'শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্‌দিমোনা' প্রবন্ধে দেস্‌দিমোনাকেই সতী-শিরোমণির উপাধি দিয়েছিলেন তিনি—'যদি স্বামীর প্রতি অবিচলিত ভক্তি—প্রহারে, অত্যাচারে, বিসর্জ্জনে, কলঙ্কেও যে ভক্তি অবিচলিত, তাহাই যদি সতীত্ব হয়, তবে শকুন্তলা অপেক্ষা দেস্‌দিমোনা গরীয়সী।' (পৃ. ৮১-৮২)

বঙ্কিমচন্দ্রের সূত্রে যে-যুগ আমাদের গবেষণার অন্তর্গত, ইংরেজদের ইতিহাসের নিরিখে, তা ছিল 'Victorian Age'; সেই বিখ্যাত যুগ যা প্রসিদ্ধ তার যৌন-নৈতিকতার জন্যই। এই যুগের দুই কবিও যে বাঙালিকে সবিশেষ প্রভাবিত করেছিল, তা বলাই বাহুল্য। প্রথমে Alfred Tennyson-এর কথা। তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'In Memoriam'-এ মৃত বন্ধু আর প্রিয়তমা ভগ্নীর 'মরণ-মিলন'-এর মধ্যে ভিক্টোরিয় নীতিবাদ খুব স্পষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে এ-বইয়ের অনুবাদ করেন 'মিত্রবিলাপ' নামে।[৩৮] আর দ্বিতীয় কবি Robert Browning ভিক্টোরিয় যুগের নৈতিকতা সমর্থিত প্রেমের কবি। বিশেষত পত্নী এলিজাবেথের প্রতি তাঁর সুগভীর প্রণয়, তাঁর কবিতাকে করে তুলেছে ভিক্টোরিয় যুগের আদর্শ প্রেম-কবিতা।

তবে শুধু সাহিত্য নয়, পাশ্চাত্যের মাটিতে জন্ম নেওয়া এক বিশেষ দর্শন-প্রস্থানও প্রভাব বিস্তার করেছিল উপনিবেশের বাঙালির মস্তিষ্কে। 'অগুস্ত কোমৎ'-এর 'পজিটিভিজম্' সেই দর্শন-প্রস্থান যা, উনিশ শতকের বাঙালির, বিশেষত বঙ্কিমচন্দ্রের দাম্পত্য-যৌনতার ধারণায় গুরুতর প্রভাব ফেলতে পেরেছিল।

কোমৎ দর্শন ঃ

১৮৩০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ফরাসি দার্শনিক অগুস্ত কোমৎ-এর 'ধ্রুবদর্শন' (Positive Philosophy) প্রকাশিত হয়, সবসুদ্ধ ছ'টি খণ্ডে। দশ বছর বাদ, ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় কোমৎ-এর 'ধ্রুবরাজনীতি' (Positive Polity)। ব্রিটিশদের উপনিবেশ ভারতে, কোমতের মতামত ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য, স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে চলেও আসেন কেউ কেউ। G. H. Forbes তাঁর গবেষণায় দেখান ঃ

> 'Three English Positivists, without any directives about how to spread positivism in a theocracy, went to India as members of the Indian Civil Service and unofficially acted as positivist 'missionaries'. They were employed in different branches of the Civil Service—Samuel Lobb as a teacher; James Cruick-shank Geddes as a magistrate; and Henry J. S. Cotton as an administrator.'[৩৯]

সেই আমলের একদল বাঙালি প্রভাবিত হয়েছিলেন কোমতের মতামতের দ্বারা। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, দ্বারকানাথ মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ছিলেন তখনকার নামজাদা বাঙালি পজিটিভিস্ট। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙালির ধর্মীয় জীবনে যে উথাল-পাতাল ঘটছিল, তাতে একদল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক বাঙালি যেমন সনাতন হিন্দুধর্মকে আঁকড়ে থাকতে পারছিলেন না, তেমনই আবার খ্রিস্টান বা ব্রাহ্মধর্মকে বরণ করে নেওয়ার উৎসাহও তাঁদের ছিল না। এঁরাই 'পজিটিভিজম্'-এর সামাজিক হিতকামিতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে Forbes মনে করেছেন ঃ

> 'These were men who wanted a religion to replace the faith they had lost and a rational theory of social change to guide their actions. The existing alternatives to Hinduism were christianity and the Brahmo Samaj but it seemed that neither of these religion could adjust to the conclusions of modern Science. There were also a number of theories of social change. Religiously, positivism was a radical alternative to what existed because it was a religion focused entirely on the quality of human life.'[৪০]

যৌবনে বঙ্কিমচন্দ্রও কোমতের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। 'বঙ্গদর্শন'-এ কোমৎ দর্শন বিষয়ে দুটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। ১৮৭৪-এর ডিসেম্বরে প্রকাশিত প্রবন্ধটির লেখক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় আর ১৮৭২-এর জুলাইয়ে মুদ্রিত প্রবন্ধটি স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের লিখিত বলেই অনুমান করা হয়ে থাকে।[৪১] বঙ্কিমচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত কিন্তু তথ্যনিষ্ঠ সেই প্রবন্ধটির নাম—'কোমৎ দর্শন'।

'মনুষ্যদিগকে ধর্মশৃঙ্খলে বদ্ধ করাই'[৪২] এই দর্শনের উদ্দেশ্য। এই দর্শনে 'উচ্ছৃঙ্খলতার লেশমাত্র নাই।'[৪৩] বলাই বাহুল্য, কামবাসনাকেও এই দর্শন নির্জিত করতেই অভ্যস্ত। কোমতের ব্যক্তিগত জীবনের কথাও আনবেন বঙ্কিমচন্দ্র—'মাদাম ক্লোতিল্‌দ্ দেভো নাম্নী এক গুণবতী রমণীর প্রতি বিশুদ্ধ প্রীতি সঞ্চার হওয়ায় তাঁহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বর্দ্ধিত ও উত্তেজিত হইয়াছিল।'[৪৪] আর সেই 'উত্তেজনা'র ফল কোমতের দাম্পত্য-পরিবার সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত—'বিশুদ্ধ প্রেম, ভক্তি ও স্নেহ আমাদের উন্নতির এক প্রধান সোপান। কোম্‌তের মতে ভক্তিরূপা মাতা, প্রীতিরূপা ভার্য্যা, এবং স্নেহরূপা কন্যা আমাদের প্রত্যক্ষ গৃহদেবতা।'[৪৫] এই কোমত-বাণীই শুনতে পাবেন কমলাকান্তের গলায়—'মাতার আদর, স্ত্রীর প্রেম, কন্যার ভক্তি, ইহার অপেক্ষা জীবনের সন্তাপে আর কি সুখের আছে?' (পৃ.৪) সঙ্গতভাবেই 'ধর্মশৃঙ্খলে বদ্ধ' কোমৎ দর্শনে, সমাজের হিতার্থে 'বিবাহ' প্রতিষ্ঠানটিও ইহলোকে এবং পরলোকে সদা অনুশাসনতন্ত্রের অধীনস্থ—'জীবদ্দশায় ব্যভিচার দূরে থাকুক, দম্পতির একের মরণান্তেও জীবিত ব্যক্তি অন্য পতি বা পত্নী গ্রহণ করিতে পারিবে

না। কোম্‌ৎ বলেন, মৃতভর্তৃকা নারী অথবা মৃতভার্য্য পুরুষ পুনর্ব্বার বিবাহ করিলে বিশুদ্ধ প্রীতির... ব্যাঘাত হয়।'[৪৬] কোমতের এই অনুশাসনকে স্মরণে রাখলে বোঝা যায় কেন বঙ্কিমচন্দ্র, কৃষ্ণকমল, যোগেন্দ্রচন্দ্র বা দ্বারকানাথের মতো উনিশ শতকের ধ্রুববাদীরা যুগপৎ বিধবাবিবাহের এবং বহুবিবাহের বিপক্ষেই রায় দিচ্ছিলেন। মোদ্দা কথা উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালি ভদ্রলোকদের দাম্পত্য চিন্তায় কোমতের অবদান অনস্বীকার্য।

হিন্দু জাতীয়তাবাদ, যৌনতা ও পরিবার ঃ

যুবরাজ এডওয়ার্ড তাঁর কলকাতা সফরে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের ৩ জানুয়ারি, ভবানীপুরে হাইকোর্টের সরকারি উকিল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। হিন্দু পরিবারের অন্দরমহলে বিদেশি পরপুরুষের পা-রাখা নিয়ে সেদিন বাঙালির সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতি কীভাবে উত্তাল হয়ে উঠেছিল, তা আমরা জানি। আমরা শুধু লক্ষ করতে চাইছি হিন্দু জাতীয়তাবাদের সেই গোড়াপত্তনের যুগে এই বিষয়টিকে ঘিরে হিন্দু জাতীয়তাবাদের উদ্বেগ-আশঙ্কার স্বরূপটি। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র ২৩শে পৌষ ১২৮২ বঙ্গাব্দের প্রতিবেদনে পাই ঃ

> 'হিন্দু সমাজ সকল নিষ্পীড়নই সহ্য করিতে পারে, কিন্তু হিন্দু পরিবারের উপর কোনরূপ আঘাত হইলে উহা সহ্য করিতে পারে না। আমরা সর্বস্বচ্যুত হইয়াছি.... আমাদের থাকিবার মধ্যে হিন্দু পরিবার আছে, আমাদের গৌরবস্থান এই পরিবার। এই পরিবারে যাহাতে কলঙ্ক হয় এরূপ কার্য যিনি করেন তিনি হিন্দু জাতির পরম শত্রু, হিন্দু সমাজের কলঙ্ক।'[৪৭]

'পরিবার' বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা বাংলা পত্র-পত্রিকায় উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকেই আরম্ভ হয়। বাইরের কর্মব্যস্ত, প্রতিযোগিতাময় জগতের সম্পূর্ণ বিপরীতে পরিবার যে এক 'ছায়া সুবিনিড় শান্তির নীড়' এই বোধ বাঙালি সমাজে মাথাচাড়া দিতে থাকে। এরই সঙ্গে সাতের দশক থেকে যোগ দেয় হিন্দু জাতীয়তাবাদ। হিন্দু জাতীয়তাবাদের একটি মূল সুর ছিল, অতীত স্বর্ণযুগের জন্য বিলাপ। 'গিয়াছে যে দিন' নামে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কবিতাটি লক্ষ করা যাক ঃ

> 'ছিল এ ভারত বসুধা-উদ্যান,
> জগতের তীর্থ—পুণ্যময় স্থান,
> আজ সে ভারত আঁধার শ্মশান;
> কাঁদ আজ তবে ভারতবাসী।'[৪৮]

একই সুর আবর্তিত হতে থাকে 'পরিবার'কে ঘিরেও। আমাদের সব হারিয়েছে, বিশেষত বহির্জগতে

পুরুষেরা পদানত; এখন থাকবার মধ্যে একমাত্র আছে আমাদের সনাতন হিন্দু পরিবার, তাই একে যে কোন মূল্যে টিকিয়ে রাখতে হবে—এই ছিল হিন্দু জাতীয়তাবাদের পরিবারকেন্দ্রিক ভাবনা। শুধু তাই নয়, সেইসঙ্গে হিন্দু জাতীয়তাবাদের চোখে 'পরিবার' হয়ে উঠছিল, 'রাষ্ট্র'-এর অণু-সংস্করণ; জাতীয় উন্নতির সোপান হয়ে দাঁড়াচ্ছিল 'পরিবার'-এর উন্নতি। এ'বিষয়ে ঈষৎ-পরবর্তী একটি রচনা উদ্ধার করা যাক ঃ

> 'কতিপয় নরনারী লইয়া একটী পরিবার এবং কতকগুলি পরিবার লইয়া একটা জাতি। পরিবারের উন্নতি না হইলে জাতীয় উন্নতি সম্ভব না। জাতীয় অবনতি হইলে দেশের অবনতি অনিবার্য্য। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে পরিবারের উন্নতি সাধন করা কর্ত্তব্য।'[৪৯]

'বামাবোধিনী পত্রিকা'য় ফাল্গুন-চৈত্র ১২৭৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'গার্হস্থ্য দর্পণ' নামক রচনায় পাই হিন্দু জাতীয়তাবাদের অভিপ্রেত পরিবারের কথা ঃ

> 'পরিবারে শৃঙ্খলা আনতে না পারলে সমাজে শৃঙ্খলা আসে না। হিন্দুধর্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে প্রয়োজন এমন এক পরিবার যার ভিত্তি হল নৈতিকতা, এবং পরিবারে শৃঙ্খলার প্রয়োজন আরও বেশি কারণ পরিবারে মানুষের যে ভিত্তি রচিত হয়, তার ছাপ পরবর্তী জীবনেও থেকে যায়।'[৫০]

বলাই বাহুল্য যে-সব 'নৈতিকতা'-র ভিত্তিতে এই অভিপ্রেত হিন্দু পরিবার গড়ে উঠবে, তার মধ্যে একটি অবশ্যই যৌন-নৈতিকতা। অবাধ কামচর্চার প্রতি খড়্গহস্ত জাতীয়তাবাদও। কারণ দুটি। এক, তাতে করে হিন্দু আদর্শ পরিবার ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাই আর দুই, অবাধ কামবৃত্তি পুরুষকে দুর্বল করে দেয়, ফলে তারা বীর্যবান সন্তানের জন্মদানে অপারগ হয়ে পড়ে। অথচ, হিন্দু জাতীয়তাবাদের তো বলশালী হিন্দু সন্তান চাই। তাই, ১২৯২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যা 'চিকিৎসা-সম্মিলনী'তে প্রকাশিত অনামা লেখকের 'জাতীয় দৈহিক পুনরুজ্জীবন' প্রবন্ধে পাই যৌনতা ও দাম্পত্য বিষয়ে হিন্দু জাতীয়তাবাদের দৃষ্টিভঙ্গী ঃ

> '... আহারের অনাবশ্যকে শুদ্ধ আস্বাদনের লালসা চরিতার্থ করিবার জন্যে কোন দ্রব্য আহার করিলে যেমন শরীরের পীড়া জন্মে তেমন সন্তান উৎপাদন স্বরূপ উদ্দেশ্য অভাবে স্ত্রীপুরুষ সংসর্গ সুখভোগ শরীরের যথেষ্ট হানি করে, সেইজন্য কুলটা স্ত্রী সংসর্গ প্রকৃতির উদ্দেশ্যবিহীন বা ঐশ্বরীক (Sic.) নিয়ম বহির্ভূত বলিয়া শরীরের যথেষ্ট হানি করে, এবং পাপের মধ্যে গণ্য হয়।'[৫১]

মোদ্দা কথা, হিন্দু জাতীয়তাবাদও পরিবার-রক্ষা এবং কামনা-বাসনা সংযত করার পক্ষেই সেদিন রায় দিয়েছিল।

এবার তবে গুছিয়ে আনা যাক আমাদের বক্তব্য। প্রাক্ ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশে অতিরেকী কাম-চর্চার এক পরিবেশ ছিল, যার দ্বারা প্রায়শই ধ্বস্ত হতো দাম্পত্য ও পরিবার। তবে এর বিরুদ্ধে একরকমের নৈতিকতা ও শাস্তির কাঠামোও মজুত ছিল। উপনিবেশের গোড়াপত্তনের যুগে পুরনো সেই কাঠামো গেল ভেঙে; ফলে অবাধ ভোগবৃত্তি গ্রাস করে নিল বাঙালির সমাজ-সংস্কৃতিকে। এ'হেন পরিস্থিতিতে 'ইউটিলিটারিয়ান' ইংরেজ প্রভুদের হাত ধরে এক পাশে গড়ে উঠতে লাগল 'শাস্তি'র বিকল্প রূপে এক অনুশাসনতন্ত্র আর অন্যদিকে নবোদ্ভূত মধ্যবিত্ত শ্রেণি পাশ্চাত্য সাহিত্য ও দর্শনে স্নাত হয়ে বানিয়ে ফেলল এক নব্য-নীতির 'সহজপাঠ'। তারই উপরে সাতের দশকে আছড়ে পড়ল হিন্দু জাতীয়তাবাদের ঢেউ। 'পরিবার' ক্রমশঃ পরিণত হতে লাগল রাষ্ট্রের অণু-সংস্করণে, পবিত্রতার 'মন্দির'-এ। ফলে যৌনতার অভ্যাস সংকুচিত হয়ে একমাত্র 'প্রজনন'-এর গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল। এই পরিস্থিতির মধ্যে থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র গড়ে তুললেন তাঁর ব্যক্তিগত রাষ্ট্র-পরিবার-যৌনতার ত্রিধাবিন্যস্ত কাঠামো যা 'ধর্মতত্ত্ব'-এ বিধৃত। ব্যক্তিগত এই চিন্তনে বঙ্কিমচন্দ্র যেমন সমকালীন চিন্তাচেতনার শরিক, তেমনই আবার বহু ক্ষেত্রে সমকালীনতার একেবারে যুযুধান পক্ষ তিনি। পরবর্তী অধ্যায়ে আমাদের আলোচ্য, বঙ্কিমচন্দ্রের সেই সুবিন্যস্ত যুক্তিজাল।

উল্লেখপঞ্জি ঃ

১. সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, কাব্যবিচার, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০০৪, পৃ. ৭৮।
২. সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত, যৌনতা ও সংস্কৃতি, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০০২, পৃ. ১৮।
৩. পঞ্চানন তর্করত্ন মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বাৎস্যায়ন প্রণীত কামসূত্র, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, বৈশাখ, ১৩৯৮ সন, পৃ. ৩৭।
৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫।
৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫।
৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৭।
৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৭।
৮. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মনুসংহিতা, আনন্দ, কলকাতা, আগস্ট ২০০৭, পৃ. ২৫৯।
৯. সুকুমার সিকদার, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, অনুষ্টুপ, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ১২৪।
১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৫।
১১. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাচীন ভারতের অপরাধতত্ত্ব ও যৌনবিজ্ঞান, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, ২০শে মার্চ ১৯৭৯, পৃ. ১৪৭-৪৭।
১২. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙ্গালী, এ মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, পৌষ, ১৩৬৮, পৃ. ১২০-১২১।
১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৪।
১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৪।
১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১২।
১৬. সুখময় মুখোপাধ্যায় সুমঙ্গল রাণা সম্পাদিত, জয়ানন্দ বিরচিত চৈতন্যমঙ্গল, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, সেপ্টেম্বর ১৯৯৪, পৃ. ৫।
১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩-৫৪।
১৮. অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব সম্পাদিত, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত মনসামঙ্গল, লেখাপড়া, কলকাতা, ১৩৮৪, পৃ. ১৬০-৬১।
১৯. অক্ষয়কুমার কয়াল সম্পাদিত, রূপরাম চক্রবর্তী বিরচিত ধর্মমঙ্গল, ভারবি, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ২০৪।
২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৬।
২১. খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত, মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ২০১১, পৃ. ১৬৭।
২২. সুকুমার সেন সম্পাদিত, কবিকঙ্কন মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি, ২০০১, পৃ. ৬৬।
২৩. সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, কৃত্তিবাস পণ্ডিত বিরচিত রামায়ণ, ভারবি, কলকাতা, নভেম্বর ১৯৯৭, পৃ. ৯৫।
২৪. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, বৈষ্ণব পদাবলী, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, মাঘ ১৪০৬, পৃ. ৫৭।

২৫. রণজিৎ গুহ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূত্রপাত, তালপাতা, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০১০, পৃ. ২৪-২৬।
২৬. বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত, নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ, রাজনারায়ণ বসু, কলেজস্ট্রীট পাবলিকেশন প্রা.লি. কলিকাতা, ১ বৈশাখ ১৪০২, পৃ. ৩০৪।
২৭. সিদ্ধার্থ ঘোষ, দ্বারকানাথ ঠাকুর; সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত, দেশ, ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪, পৃ. ৩৭।
২৮. বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, শিবনাথ শাস্ত্রী, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, জানুয়ারি ২০০৭, পৃ. ২৬।
২৯. অদ্রীশ বিশ্বাস সম্পাদিত, বটতলার বই ১, গাঙচিল, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৩৩১-৩৩৭।
৩০. ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রসরচনাসমগ্র, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ৫২।
৩১. অক্ষয়কুমার কয়াল সম্পাদিত, প্রাণরাম কবিবল্লভের কালিকামঙ্গল, সাহিত্যলোক, কলকাতা, নভেম্বর ১৯৯১, পৃ. ১০৪।
৩২. সুকুমার সিকদার, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, অনুষ্টুপ, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ১৭২-৭৩।
৩৩. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ইতিহাসের উত্তরাধিকার, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ৬০-৬১।
৩৪. বিনয় ঘোষ, বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা ১৮০০-১৯০০, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ. ১৯৭।
৩৫. ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত, মধুসূদন রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, জানুয়ারি ২০০৪, পৃ. ৭৭।
৩৬. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত 'মাসিক বঙ্গদর্শন' পত্রিকার হুবহু পুনর্মুদ্রণ, বঙ্গদর্শন ৮, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ১৮০।
৩৭. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, বাংলা কাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, মাঘ ১৪০৬, পৃ. ২৯৫।
৩৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৯।
৩৯. Geraldine Hancock Forbes, Positivism in Bengal, papyrus, Calcutta, november 1975, Pg. 44.
৪০. Ibid, Pg. 85.
৪১. মৃদুলকান্তি বসু, বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, এপ্রিল ২০০৩, পৃ. ১২।
৪২. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত 'মাসিক বঙ্গদর্শন' পত্রিকার হুবহু পুনর্মুদ্রণ, বঙ্গদর্শন ১, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ১৩১।
৪৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩১।
৪৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩২।
৪৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩২।
৪৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩২।
৪৭. সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান, অনুষ্টুপ, কলকাতা, এপ্রিল, ২০০৮, পৃ. ২৩৫।
৪৮. রথীন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত, দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ডিসেম্বর ২০০৭, পৃ. ৪৮৫।

৪৯. প্রদীপ বসু সম্পাদিত, সাময়িকী পুরনো সাময়িকপত্রের প্রবন্ধ সংকলন দ্বিতীয় খণ্ড : গৃহ ও পরিবার, আনন্দ, কলকাতা, এপ্রিল ২০০৯, পৃ. ৬৫।
৫০. প্রদীপ বসু, পারিবারিক প্রবন্ধ : বাঙালি পরিবারের সন্দর্ভ বিচার, গাঙচিল, কলকাতা, মার্চ ২০১২, পৃ. ১৩।
৫১. প্রদীপ বসু সম্পাদিত, সাময়িকী পুরনো সাময়িকপত্রের প্রবন্ধ সংকলন প্রথম খণ্ড : বিজ্ঞান ও সমাজ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, মে ১৯৯৮, পৃ. ১৩৯।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাষ্ট্র-পরিবার-যৌনতা ঃ বঙ্কিমী একস্বর

স্ত্রী-সূক্ত ঃ

প্রাক্ ঔপনিবেশিক আমল থেকে শুরু করে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবদ্দশাতেই কীভাবে বদলে যাচ্ছিল বাঙালির দাম্পত্য-পরিবার-যৌনতা সংক্রান্ত ধারণা, তার একটা খতিয়ান আমরা ইতঃপূর্বেই নিয়েছি। উনিশ শতকের ছয়ের দশক থেকে এ-সব কিছুরই মধ্যমণি হয়ে উঠছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর তাঁর পত্রিকা 'বঙ্গদর্শন'। ঈষৎ-পরবর্তীকালে অবশ্য বঙ্কিম-চিন্তার ধারক-বাহক হয়ে উঠেছে 'নবজীবন' বা 'প্রচার'-এর মতো মাসিকপত্রও। এই সমস্ত পত্র-পত্রিকাতে, মুখ্যত 'বঙ্গদর্শন'-এর পাতায় প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন রচনার সাহায্যেই গড়ে নেওয়া সম্ভব তাঁর 'যৌনতা' বিষয়ক ধারণার একটি কাঠামো।

এ কাজের গোড়াতেই আমাদের প্রয়োজন একটি তালিকার। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাক্ষরিত অথবা অস্বাক্ষরিত যে-সব রচনা তাঁর যৌনতা-চিন্তার ধারক, বর্তমান তালিকাটি তারই কালানুক্রমিক উপস্থাপন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বঙ্কিমচন্দ্রের অস্বাক্ষরিত রচনাগুলি তারকা [*] চিহ্নিত ঃ

রচনার শিরোনাম	প্রকাশকাল
১. উত্তরচরিত	জ্যৈষ্ঠ-আশ্বিন, ১২৭৯ বঙ্গাব্দ।
*২. কোম্‌ত দর্শন	শ্রাবণ, ১২৭৯ বঙ্গাব্দ।
*৩. প্রাপ্ত পুস্তকের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা	অগ্রহায়ণ, ১২৭৯ বঙ্গাব্দ।
৪. বসন্ত এবং বিরহ	বৈশাখ, ১২৮০ বঙ্গাব্দ।
৫. প্রাচীনা এবং নবীনা	বৈশাখ, ১২৮১ বঙ্গাব্দ।
৬. ভালবাসার অত্যাচার	অগ্রহায়ণ, ১২৮১ বঙ্গাব্দ।
৭. অধঃপতন সঙ্গীত	অগ্রহায়ণ, ১২৮১ বঙ্গাব্দ।
৮. সর্ উইলিয়ম গ্রে ও সর্ জর্জ কাম্বেল	জ্যৈষ্ঠ, ১২৮২ বঙ্গাব্দ।
৯. বাহুবল ও বাক্যবল	জ্যৈষ্ঠ ও ভাদ্র, ১২৮৪ বঙ্গাব্দ।
* ১০.জন ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনী সমালোচনা। দ্বিতীয় প্রস্তাব—মিল প্রদত্ত শিক্ষা।	পৌষ ১২৮৪ বঙ্গাব্দ।

'বঙ্গদর্শন'-এর প্রথম বর্ষের জ্যৈষ্ঠ থেকে আশ্বিন—পাঁচটি সংখ্যা জুড়ে প্রকাশিত হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের দীর্ঘ সাহিত্য-সমালোচনা 'উত্তরচরিত'। উনিশ শতকের সাতের দশকে নবোদ্ভূত জাতীয়তার বোধ যে বাঙালির দাম্পত্য তথা যৌনচেতনাকে প্রভাবিত করেছিল, তা আমরা আগেই দেখেছি। বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রবন্ধটিকেও সেই উপযুক্ত পরিসরে রেখেই পাঠ করা যাক—'সীতার নির্ব্বাসন সামান্য স্ত্রীবিয়োগ নহে। স্ত্রীবিসর্জ্জন মাত্রই ক্লেশকর—মর্ম্মভেদী। যে কেহ আপন স্ত্রীকে বিসর্জ্জন করে, তাহারই হৃদয়োদ্ভেদ হয়। যে বাল্যকালের ক্রীড়ার সঙ্গিনী, কৈশোরে জীবন সুখের প্রথম শিক্ষাদাত্রী, যৌবনে যে সংসারসৌন্দর্য্যের প্রতিমা, বার্দ্ধক্যে যে জীবনাবলম্বন—ভাল বাসুক না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারে? গৃহে যে দাসী, শয়নে যে অপ্সরা, বিপদে যে বন্ধু, রোগে যে বৈদ্য, কার্য্যে যে মন্ত্রী, ক্রীড়ায় যে সখী, বিদ্যায় যে শিষ্য, ধর্ম্মে যে গুরু;—ভাল বাসুক বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে সহজে বিসর্জ্জন করিতে পারে? আশ্রমে যে আরাম, প্রবাসে যে চিন্তা, —স্বাস্থ্যে যে সুখ, রোগে যে ঔষধ,—অর্জ্জনে যে লক্ষ্মী, ব্যয়ে যে যশঃ—বিপদে যে বুদ্ধি, সম্পদে যে শোভা—ভাল বাসুক বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে সহজে বিসর্জ্জন করিতে পারে? আর যে ভালোবাসে, পত্নীবিসর্জ্জন তাহার পক্ষে কি ভয়ানক দুর্ঘটনা!' (পৃ.৪, নিম্নরেখাঙ্কন আমাদের) পুরুষের যৌন-আধিপত্য বিস্তার আর নারীর যৌন-আনুগত্য দাবি—প্রাক্ ঔপনিবেশিক বাঙালির দাম্পত্যে অতীব 'স্বাভাবিক' এক ধারণা রূপেই বিবেচিত হত। উপনিবেশ সেই ধারণাকেই ক্রমে ক্রমে বদলে দিচ্ছিল। নারীর জন্য দাম্পত্যে ধার্য করা হচ্ছিল পুরুষের সম-মর্যাদা, কখনো বা পুরুষের চেয়ে বেশিই। লক্ষণীয়, বঙ্কিমচন্দ্র 'উত্তরচরিত'-এর সমালোচনা-ছলে যে আশ্চর্য 'স্ত্রী-সূক্ত'টি রচনা করলেন, তাতে পত্নী-'বর্জন' বা পত্নী-'পরিত্যাগ' নয়—বারবার পত্নী-'বিসর্জ্জন' শব্দটি ঘুরে-ফিরে এসে, স্ত্রী-কেই প্রতিষ্ঠা করেছে দাম্পত্যের 'দেবী' রূপে। এহো বাহ্য। 'রঘুবংশম্'-এর অষ্টম সর্গের বিখ্যাত অজ-বিলাপ অনুসরণেই বঙ্কিমের এই প্রিয়া-স্তুতি। বহুলপঠিত হলেও উদ্ধার্য সেই শ্লোকঃ

> 'গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ/প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।'... 'হে প্রিয়ে! তুমি আমার গৃহিণী, মন্ত্রী, রহস্য-সখী এবং গীতবাদ্য প্রভৃতি সুললিত ক্রিয়াকলাপে প্রিয়শিষ্যা।'[১]

কালিদাসকে অনুসরণ করেও তাঁকে পিছনে ফেলেই বঙ্কিমচন্দ্র রচনা করেছেন তাঁর উনিশ শতকীয় 'গৃহ্য-সূক্ত'; যোগ করেছেন আশ্চর্য এক মাত্রা। দাসী-বন্ধু-অপ্সরা-মন্ত্রী-শিষ্যা, বহুবিধ এই ভূমিকায় নিরন্তর অভিনয় করার পরও স্ত্রী-র আরেকটি পরিচয়—'ধর্ম্মে যে গুরু।' কালিদাসের কালে স্ত্রী শুধুই 'শিষ্যা'; বঙ্কিমচন্দ্রের আমলে সংসারধর্মের 'গুরু'-র আসনে বসেছেন স্ত্রী। মনে পড়ছে 'ধর্মতত্ত্ব'-এর গুরুর কোমৎ অনুসারী বচন—'যেখানে স্ত্রী স্নেহে, ধর্ম্মে বা পবিত্রতায় শ্রেষ্ঠ, সেখানে তাঁহারও স্বামীর ভক্তির পাত্র হওয়া উচিত বটে। গৃহধর্ম্মে ইঁহারা ভক্তির পাত্র'। (পৃ. ৫৪)

এইসূত্রে নতুন করে পড়া যাক বঙ্কিমচন্দ্রের অস্বাক্ষরিত একটি রচনা। বঙ্গদর্শনের ১২৮৪ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'জন ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনী সমালোচনা। দ্বিতীয় প্রস্তাব—মিল প্রদত্ত শিক্ষা।' এতেই বঙ্কিমচন্দ্রের উচ্ছ্বসিত মন্তব্য—'সর্বোপরি যিনি প্রথমে মিলের সখী, শেষে পত্নী, সেই অদ্বিতীয়া রমণী প্রদত্ত শিক্ষা, অতি বিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। এবং অতিশয় মনোহর।—আমার ইচ্ছা করে এইটুকুই স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে পরিণত হইয়া বাঙ্গালীর গৃহিণীগণের হস্তে সমর্পিত হয়—তাঁহারা দেখুন কেবল সীতা এবং সাবিত্রী স্ত্রীজাতির আদর্শ হওয়া কর্ত্তব্য নহে। তদধিক উচ্চতর আদর্শ আছে। যে রমণী পতিপরায়ণা সে ভাল—কিন্তু যে পতির মানসিক উন্নতির কারণ সে আরও ভাল।'[২] (নিম্নরেখাঙ্কন আমাদের) 'ধর্ম্মে যে গুরু'—এহেন বঙ্কিম-সুভাষিতের অর্থ আশা করি স্পষ্ট হয়ে উঠছে। 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব'-এও আমরা লক্ষ করেছি বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—'যৌবনের যে অমূল্য রত্ন—শুধু যৌবনের কেন, যৌবনের, প্রৌঢ় বয়সের, বাদ্ধর্ক্যের তুল্যরূপেই অমূল্য রত্ন যে ভার্যা' (পৃ. ১২৯)—তাঁর কথা।

বঙ্কিমচন্দ্রের অভিপ্রেত দাম্পত্য-চেতনায় একদিকে যেমন স্ত্রীর গুরুত্ব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছিল, অন্যদিকে পুরুষের যৌন-ব্যভিচারকেও তেমনি তীব্র কশাঘাত করতে চাইছিলেন তিনি। ১২৮১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত হয় 'প্রাচীনা এবং নবীনা' শীর্ষক প্রবন্ধটি। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে না-পড়া অভ্যাসেই যাঁরা নারীদ্বেষী তক্‌মাটি প্রয়োগে অভ্যস্ত, এ-প্রবন্ধ তাঁদের অবশ্যপাঠ্য—'...সর্ব্বত্র স্ত্রীজাতির সতীত্বের জন্য এত পীড়াপীড়ি; পুরুষের সেই ধর্ম্মের অভাব, কোথাও তত বড় গুরুতর দোষ বলিয়া গণনীয় নহে।... পুরুষের সুখের পক্ষে স্ত্রীর সতীত্ব আবশ্যক। স্ত্রীজাতির সুখের পক্ষেও পুরুষের ইন্দ্রিয়সংযম আবশ্যক...।' (পৃ. ১৫৩-৫৪)

নারী নয়, মুখ্যত পুরুষের অবাধ যৌনতাকে লক্ষ্মণরেখায় বাঁধতে চেয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর সাহিত্যে তারই তোড়জোড় বেশি। শুধু প্রবন্ধ নয়, তাঁর কবিতাও সাক্ষী। 'বঙ্গদর্শন'-এ অগ্রহায়ণ ১২৮১ তে মুদ্রিত, 'অধঃপতন সঙ্গীত' নামক বঙ্কিমচন্দ্রের অনতিপরিচিত কবিতাটি 'বাবু'দের সংসারবিমুখতাকেই ধরেছে ব্যঙ্গের আখরে ঃ

'ঘরে আছে পদ্মমুখী কভু না করিল সুখী,
শুধু ভালবাসা নিয়ে, কি হবে সংসারে।
নাহি জানে নৃত্যগীত ইয়ার্‌কিতে নাহি চিত,
একা বসি ভালবাসা ভাল লাগে কার?
গৃহধর্ম্মে রাখে মন, হিতভাবে অনুক্ষণ,
সে বিনা দুঃখের দিনে অন্যগতি নাই!
এ হেন সুখের দিনে, তারে নাহি চাই।।' (পৃ. ২৯)

পুরুষের ইন্দ্রিয়াসক্তি বনাম নারীর পাতিব্রত্যের অভ্যস্ত ছকেই এ-কবিতাটিকেও দাঁড় করিয়েছেন তিনি। 'বঙ্গদর্শন'-এর ১২৮০ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত রম্যরচনা 'বসন্ত এবং বিরহ'-এও বঙ্কিমচন্দ্র 'লঘু' মুহূর্তে বিস্মৃত হননি 'গুরু' এই সমস্যাকে; শ্যামীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন তার দুঃখের সাতকাহন—'যেমন এক লাঙ্গলে যোড়া গোরু যুড়িয়া ক্ষেত্রকে চাষা ক্ষতবিক্ষত করে, তেমনি এক প্রেমলাঙ্গলে বিরহ এবং বারস্ত্রীভক্তিরূপ যোড়া গোরু যুড়িয়া আমার স্বামী চাষা আমার হৃদয়ক্ষেত্রকে ক্ষত বিক্ষত করিতেছেন।' (পৃ. ৪৪) ১২৭৯ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় বঙ্কিম 'প্রাপ্ত পুস্তকের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা' বিভাগে বলদেব পালিতের 'কাব্যমালা' বইটির তীব্র সমালোচনা করে লেখেন—'যাহা শারীরিক কুপ্রবৃত্তির উদ্দীপক, তাহাই দূষ্য এবং কাব্যের অযোগ্য। কিন্তু এদেশে কতকগুলিন অর্দ্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত লোক হইয়াছেন, —তাঁহাদিগের নিকট বিশুদ্ধ দম্পতী (Sic) প্রেম—যাহা সংসারের এক মাত্র পবিত্র গ্রন্থি, এবং মনুষ্যের প্রধান ধর্ম্ম, চিত্তোৎকর্ষের প্রধান উপায়, তাহাও আদিরস ঘটিত এবং অশ্লীল বলিয়া ঘৃণ্য।'[৩] (নিম্নরেখাঙ্কন আমাদের) লক্ষণীয় দাম্পত্যকে বঙ্কিমচন্দ্র 'সংসারের এক মাত্র পবিত্র গ্রন্থি' বলে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন—বাৎসল্য বা ভক্তিও তার পশ্চাদ্‌গামী। নিঃসন্দেহে বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিগত এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশের মধ্যেই সেদিন থেকে যাচ্ছিল, তাঁর এ'হেন চিন্তাসূত্র গড়ে তোলার মত পর্যাপ্ত উপাদান।

রাজলক্ষ্মী ও কমলাকান্ত ঃ

'ভাল বাসুক বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে সহজে বিসর্জ্জন করিতে পারে?'—'উত্তরচরিত'-এ পুনরাবৃত্ত এই কাকুবক্রোক্তিময় ধ্রুবপদ থেকেই বোঝা যায়, পত্নীবিসর্জন সর্বাবস্থাতেই বঙ্কিমি-ফতোয়ায় নিষিদ্ধ। জাতীয়তাবাদী চেতনায় যৌনতা-দাম্পত্য যে একটি যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিণত হচ্ছিল, আগের অধ্যায়েই তা আমরা দেখেছি। বঙ্কিমচন্দ্র সেদিন তার বাইরে নন। জানতে ইচ্ছা করে, কোন্ প্রেরণায় চালিত হয়ে বঙ্কিম সেদিন দাম্পত্যের এই নব্যনীতি নির্মাণে ব্রতী হয়েছিলেন?

যৌনতার পরিমিত আচরণ কীভাবে 'পরিবার'কে সংগঠিত করে তুলতে পারে, বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধুবৃত্তের মধ্যেই সেদিন তার উদাহরণের অভাব ছিল না। দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী লিখতে গিয়েই মনে করিয়ে দিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র—'একটি দুর্লভ সুখ দীনবন্ধুর কপালে ঘটিয়াছিল। তিনি সাধ্বী স্নেহশালিনী পতিপরায়ণা পত্নীর স্বামী ছিলেন।... দীনবন্ধু চিরদিন গৃহসুখে সুখী ছিলেন। দম্পতীকলহ (Sic) কখন না কখন সকল ঘরেই হইয়া থাকে, কিন্তু কস্মিন্‌কালে মুহূর্ত নিমিত্ত ইঁহাদের কথান্তর হয় নাই।' (পৃ. ৯১) অবশ্য, দাম্পত্য-যৌনতার সম্পর্কের জটিলতার আঁচ তিনি জীবন থেকেও পেয়ে থাকতে পারেন। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে বলা বঙ্কিমচন্দ্রের কথাগুলি স্মরণীয় ঃ

> ‘বঙ্কিমবাবু হাসিলেন, বলিলেন, ‘আমার জীবন অসার, তা লিখিয়া কি হইবে? ... জীবনে অনেক ভ্রম প্রমাদ আছে, তা বলা বড় কঠিন, কাজেই জীবনী হইল না। সে সব বলিতে পারিলে অনেক কাজ হয়।... একজনের প্রভাব আমার জীবনে বড় বেশি রকমের—আমার পরিবারের। আমার জীবনী লিখিতে হইলে তাঁহারও লিখিতে হয়। তিনি না থাকিলে আমি কি হইতাম, বলিতে পারি না। আমার যত ভ্রম প্রমাদ তিনি জানেন, আর আমি জানি।’[৪]
> (নিম্নরেখাঙ্কন আমাদের)

স্বামীর জীবনী লেখার ‘পুরশ্চরণ’ করতে হবে স্ত্রীর জীবনী দিয়ে, অভিনব এই স্বীকারোক্তি নব্য-দাম্পত্য-সূক্তের রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষেই সম্ভবপর।

লক্ষ করা যাক, সংক্ষিপ্ত এই ভাষণেই বঙ্কিম অন্তত দু’বার তাঁর জীবনের কোন ‘ভ্রম প্রমাদ’-এর কথা বলেছেন, যা নিতান্তই গোপনীয় এবং তার থেকে তাঁকে উদ্ধার করে এনেছিলেন রাজলক্ষ্মী দেবী—এমন ইঙ্গিত করতেও ভোলেননি তিনি। সঙ্গতভাবেই জানতে ইচ্ছা করে সেই ‘ভ্রম-প্রমাদ’-এর স্বরূপটি। এ প্রসঙ্গে অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের মুখে কুলুপ। মাত্র দু’একজন খুব ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি সামান্য যা কিছু ইঙ্গিত করেছেন। প্রথমে নবীনচন্দ্র সেন। কাঁটালপাড়ার বাড়িতে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাতের পর নবীন সেন তাঁর মুখ থেকেই ‘বিষবৃক্ষ’-এর পাঠ শুনতে চান ঃ

> ‘আমি বলিলাম—‘বিষবৃক্ষ’। তিনি—‘‘কোন্ স্থান পড়িব?’’ আমি—‘‘যে স্থান আপনার অভিরুচি।’’ তিনি ‘বিষবৃক্ষ’ খুলিয়া, যেখানে কমলমণির কাছে সূর্য্যমুখী তাঁহার পতিপ্রাণতা দেখাইয়া পত্র লিখিয়াছেন, সে স্থান পড়িতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পড়িয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন—‘‘বিষবৃক্ষ আমি পড়িতে পারি না। তুমি অন্য কিছু শুনিতে চাও ত পড়ি।’’ আমাকে অক্ষয়বাবু সত্যই বলিয়াছিলেন যে, বঙ্কিমবাবুর স্ত্রীর চরিত্রই তাঁহাকে ‘নভেলিষ্ট’ করিয়াছে। তিনিই সূর্য্যমুখী।’[৫]

নবীনচন্দ্রের স্মৃতিচারণ থেকে স্পষ্ট বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের ‘ভ্রম-প্রমাদ’ এবং তাকে শুধরে দেওয়ায় রাজলক্ষ্মী দেবীর অবদানের কথা জানতেন বঙ্কিমচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধুবৃত্তের কেউ কেউ। এখানেই মাথা-চাড়া দেয় সঙ্গত এক প্রশ্ন। যদি ‘বিষবৃক্ষ’-এর ‘সূর্য্যমুখী’ হন রাজলক্ষ্মী দেবী, তবে কোথাও কি কোন সম্ভাবনা রয়ে গেছে, বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনেও কোন-এক ‘কুন্দনন্দিনী’কে খুঁজে পাওয়ার? সোজা কথায় আমরা বলতে চাইছি, বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনেও কি কখনো কোন যৌনস্খলন ঘটেছে? সেইজন্যই কি বিবাহিত পুরুষের জীবনে দ্বিতীয়া নারীর আবির্ভাব, পুরুষের পদস্খলন এবং পরিশেষে পুরুষটির ‘চিত্তশুদ্ধি’-তে উপনীত হওয়া—বঙ্কিম-উপন্যাসের একটি পুনরাবৃত্ত কাহিনি-কাঠামো? বঙ্কিমচন্দ্রের সযত্ন-রক্ষিত গোপ্য জীবনকথায়

এর আভাস মেলা ভার, শুধুমাত্র সামান্য প্রাসঙ্গিক ইঙ্গিত করে গেছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের একদা ঘনিষ্ঠ সাবজজ দিগম্বর বিশ্বাসের ছেলে তারকনাথ বিশ্বাস ঃ

> 'সাহিত্যিক বঙ্কিমকে দেখানই আমাদের উদ্দেশ্য, সুতরাং তাঁহার স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে সকল কথা প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয় নহে। পদস্খলন হয় না কার? বঙ্কিমেরও হইয়াছিল, সুতরাং সে সকল লইয়া তোমার আমার তর্ক বিতর্কের আবশ্যকতা নাই।'[৬] (নিম্নরেখাঙ্কন আমাদের)

আজ সেই 'বঙ্কিমবাবুর গুপ্তকথা' আবিষ্কার করা হয়তো আমাদের পক্ষে আর সম্ভবপর নয়, তবু সে সম্পর্কে সামান্য অনুমানে আশা করি বাধা নেই। আর 'ভ্রম-প্রমাদ' শুধরে-দেওয়া স্ত্রী যে দাম্পত্য-ধর্মে পুরুষের 'গুরু' হয়ে উঠতে পারেন, তার প্রমাণ বঙ্কিম নিজের জীবন থেকেই পেয়ে গিয়েছিলেন; তাঁর 'ছদ্মনাম' তারই সাক্ষী। 'কমলাকান্ত চক্রবর্তী'। বঙ্কিমচন্দ্রের 'ব্রাহ্মণ্য' চট্টোপাধ্যায় থেকে চক্রবর্তীতে রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু, 'কমলাকান্ত'? 'কমলা'র 'কান্ত' যিনি। 'কান্ত' অর্থে স্বামী আর 'কমলা' তো 'লক্ষ্মী'-রই নামান্তর! 'রাজলক্ষ্মী'র 'স্বামী' যে বঙ্কিমচন্দ্র, নিজের জন্য, এর চেয়ে সত্য-ছদ্মপরিচয় আর কিছুই খুঁজে পাননি তিনি।[৭] বোঝা যায়, বন্ধুবৃত্ত থেকে যেমন, তেমনই ব্যক্তিগত যৌনজীবন থেকেও বঙ্কিম গড়ে তুলেছিলেন দাম্পত্য-যৌনতার 'অনুশীলন'-এর সহজপাঠ।

শুধুই ব্যক্তিগত জীবন? কর্মজীবনেও কি বঙ্কিমচন্দ্রকে এই সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়নি? 'দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইন' নামক রম্যরচনায় যে বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন—'স্ত্রী ভিন্ন অন্য কোন যুবতী স্ত্রীলোকের প্রতি কিছুমাত্র দয়া বা আনুকূল্য করিলেই লাম্পট্য গণ্য হইবে।' (পৃ. ৩৭) সেই 'হাকিম' বঙ্কিমচন্দ্র কি সত্যসত্যই তাঁর কর্মক্ষেত্রের আওতায় মুখোমুখি হননি এমনই সব সমস্যার? বঙ্কিমচন্দ্রের যৌনতার ধারণায় অবশ্য দ্রষ্টব্য তাঁর কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা।

দাম্পত্য-দণ্ড-বিধি ঃ

১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারি কমলাকান্তকে 'জোবানবন্দী' দিতে আদালতে হাজির হতে হয়। হরেক বেয়াদপিতে আদালতকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়েন তিনি। তবু আশ্চর্য হয়ে আমরা দেখি বিচারকর্তা কিন্তু স্মিতহাস্যে সবকিছুকে মাফ করে দেন—'হাকিমটি এক জন দেশী ধর্ম্মাবতার—পদে ও গৌরবে ডিপুটি।' (পৃ.৭৩) বোঝা যায় সৃষ্টি আর স্রষ্টার মুখোমুখি বসবারই এক বিরল আখ্যান এটি। হাকিম বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীতে আদালতের বিচারের কথা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে আরো অন্যত্র। জানতে ইচ্ছা করে তাঁর সেই কর্মজগৎ থেকেও কি বঙ্কিমচন্দ্র দাম্পত্য-যৌনতার জটিল সম্পর্কের কোন পাঠ গ্রহণ করেন নি?

নারী-পুরুষের ব্যভিচার, দাম্পত্যের ভাঙন কিংবা রূপমোহের কথা যে আদালতের আকাশে বাতাসে ঘুরত তা আমরা জানি। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও যে সেগুলি সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন, তা আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন তারকনাথ বিশ্বাস ঃ

> 'একবার একজন নালিশ করে যে, একটি বাবু জানালা খুলিয়া তাহার স্ত্রীকে দেখে। বঙ্কিমচন্দ্র মোকদ্দমা মিটাইয়া দিয়া বলেন—''হাওয়া আর চোখ কি কারও মানা মানে গা?''
>
> আর একটি এই ধরণের মোকদ্দমায় বলেন—''আসামি যে তোমার স্ত্রীর দিকে চেয়ে থাকে, তা জান্‌লে কী করে?'' উত্তর—''স্ত্রীর মুখেই শুনিয়াছি।'' বঙ্কিমবাবু—তাহলে বুঝতে হবে যে, তোমার স্ত্রীরও চেয়ে দেখা রোগটি আছে।'[৮]

এহো বাহ্য। সরাসরি যুক্ত না হলেও, হাকিম হওয়ার সুবাদে যৌনতা-ঘটিত অপরাধের খবর যে বঙ্কিমচন্দ্রের কানে পৌঁছতো তা তো আন্দাজ করাই চলে। বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালেই কলকাতায় বা তার পরিপার্শ্বে এমন একাধিক সাড়া-জাগানো মামলা ঘটেছিল, যা স্পষ্টত 'দম্পতিপ্রীতি' বনাম 'কামবৃত্তি'-র লড়াইকে কেন্দ্র করেই ছিল। এমনই দু'চারটে মামলার কথা উল্লেখ করা যাক।

১২৯৫ বঙ্গাব্দে সৌদামিনী দেবী 'মাতঙ্গিনী' নামে এক কাব্য লেখেন। এর ভিত্তি ছিল নবদ্বীপের মাম্‌জোয়ান গ্রামের এক বিশিষ্ট পরিবারের ব্যভিচার এবং খুনের মামলার বিবরণ। হারাণচন্দ্র কলকাতায় চাকরি করেন। তার স্ত্রী মাতঙ্গিনী, পরিবারের আশ্রিত যুবক বিহারীর সঙ্গে যৌন সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। হারাণচন্দ্র তা জানতে পারলে বিহারী এবং মাতঙ্গিনী মিলে তাকে হত্যা করে। কৃষ্ণনগরের ফৌজদারি আদালতের বিচারে বিহারীর ফাঁসি আর মাতঙ্গিনীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। সৌদামিনী দেবী তাঁর কাব্যে চরম ধিক্কার জানান অসতী মাতঙ্গিনীকে ঃ

> 'স্বর্গ ভোগ তুচ্ছ হয় হেরিলে যে পতি।
> সে পতি থাকিতে মাতি চাকরেতে মতি।।
> পুরুষেরা কহে নারী অতি অবিশ্বাসী।
> প্রধান দৃষ্টান্ত তার মাতী সর্ব্বনাশী।।'[৯]

দ্বিতীয় উদাহরণের জন্য দ্বারস্থ হওয়া যাক সে আমলের বিখ্যাত দারোগা প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের 'দারোগার দপ্তর'-এর। জ্যৈষ্ঠ ১৩০১ সংখ্যায় মুদ্রিত হয় 'প্রমদা (কুলবধূ ব্যভিচারে ঘটায় প্রমাদ!)' শীর্ষক রচনাটি। হরির সহায়তায় প্রমদা তাঁর স্বামী নবকুমারকে হত্যা করেন। এ বিবরণ তারই। বিবরণের শেষে আদালতে এই মামলার বর্ণনাও দেন প্রিয়নাথ ঃ

> ‘পরিশেষে চূড়ান্ত বিচারের নিমিত্ত এই মোকদ্দমা উচ্চ-আদালতের হস্তে অর্পিত হইল।.... দায়রার জুরির বিচারে প্রমদার বিচার আরম্ভ হইল। নিম্ন-আদালতে যে সকল সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করা হইয়াছিল, এখানেও পুনরায় সেই সকল সাক্ষীর জবানবন্দী গৃহিত হইল।... নিম্ন-আদালতে সে যাহা বলিয়াছিল, তাহাই বিশ্বাস করিয়া জুরিগণ প্রমদাকে দোষী সাব্যস্ত করিলেন। বিচারকও সেই মতের অনুমোদন করিয়া প্রমদাকে চরমদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন।’[১০]

অবশ্য এর চেয়েও বেশি সাড়া ফেলে দেওয়া একটি ব্যভিচারের মামলা সম্পর্কে বঙ্কিম যে রীতিমতো সজাগ ছিলেন তা আমরা তাঁর রচনা থেকেই জানতে পারি। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে বাঙালি জীবনের সবচেয়ে মুখরোচক কিস্‌সা ছিল তারকেশ্বরের মোহন্ত, এলোকেশী আর নবীনের জীবন-নির্ভর। তারকেশ্বরের নিকটবর্তী কুমরুল গ্রামের বাসিন্দা নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী এলোকেশী। বাবা তারকনাথের পুজো দিতে গিয়ে মোহন্ত মাধবগিরির নজরে পড়েন তিনি। মুগ্ধ মোহন্ত ছলে-কৌশলে এলোকেশীর ‘সতীত্ব’ নাশ করে। স্বামী নবীন সব জানতে পেরে আঁশবটি দিয়ে স্ত্রীকে হত্যা করে পুলিশে আত্মসমর্পণ করে। হুগলীর কোর্টে মামলা উঠলে ‘পরস্ত্রীগমন’-এর অভিযোগে মোহন্ত মাধবগিরিও ধরা পড়েন। মাধবগিরির তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয় আর আসামী নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। সেদিনকার বাঙালি সংস্কৃতির আনাচে-কানাচে কান পাতলেই শোনা যাবে দাম্পত্যকে ধ্বস্ত করা এই ‘কামবৃত্তি’-র আখ্যান।[১১] এই মামলাটি সম্পর্কে হুগলিরই বাসিন্দা বঙ্কিমচন্দ্র যে কতটা খেয়াল রাখতেন, তা বোঝা যায় ‘সর্‌ উইলিয়ম গ্রে ও সর্‌ জর্জ কাম্বেল’ নামক প্রবন্ধ থেকে—‘জুরির সৃষ্টি হইয়া অবধিই ভারতবর্ষে অবিচার হইতেছে— দোষী দোষ করিয়া, সেসন হইতে প্রায় খালাস হইয়া আসিতেছে—হুগলীতে নবীনের বিচার, ইহার একটি জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ।’ (পৃ.৩৩৩)

‘বিশুদ্ধ’ দম্পতিপ্রীতি’কে যে-বঙ্কিমচন্দ্র ‘সংসারের একমাত্র পবিত্র গ্রন্থি’ বলে মনে করতেন, তাঁর বন্ধুবৃত্ত, ব্যক্তিগত জীবন অথবা কর্মক্ষেত্র—সর্বত্র থেকেই উপাদান সঞ্চয় করে তিলে তিলে তিনি গড়ে তুলেছিলেন, উনিশ শতকের পুরুষের পক্ষে অ-পূর্ব এক ধারণা। আর সেই ধারণাকে কেন্দ্রে রেখেই আবর্তিত হবে তাঁর রাষ্ট্র-গঠন-প্রকল্পও। বঙ্কিমচন্দ্রের রাষ্ট্র-চিন্তার মর্মমূলেই এরপর বাসা বাঁধবে ‘দম্পতিপ্রীতি’।

রাষ্ট্র ও নৈতিকতা ঃ

‘বিষ্ণুশর্ম্মা ভারতবর্ষের মাকিয়াবেল্লি—....যাহারা এইরূপ গ্রন্থ বিদ্যালয়ের বালকদিগকে পড়াইবার

নিয়ম করিয়াছে, তাহাদিগের উচিত, আবার বিদ্যালয়ে প্রবেশ করা। তাহাদের শিক্ষা হয় নাই।' (পৃ. ১৭) 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' লিখতে বসে খাম্‌খা 'বিষ্ণুশর্ম্মা' বা 'মাকিয়াবেল্লি'-র উপর খড়্গহস্ত কেন বঙ্কিমচন্দ্র? কারণ, এদের বইতে নৈতিকতার অভাব লক্ষ করেছেন তিনি। বিষ্ণুশর্মার সমস্ত পরামর্শের মধ্যেই উদগ্রভাবে জেগে রয়েছে 'আত্মপ্রীতি' আর ম্যাকিয়াভেলির রাষ্ট্রচিন্তায় 'নীতি'র স্থান কতখানি তা সামান্য উদ্ধার করাই যেতে পারে ঃ

> 'সাফল্যের জন্য যা প্রয়োজন রাজনৈতিক বিচারে তা-ই নীতিসম্মত।.....তাঁর মতে, অপরের বিশ্বাসভাজন থাকা রাষ্ট্রনায়কের পথে প্রশংসনীয়, তথাপি ক্ষমতাসীন থাকার জন্য বিশ্বাসঘাতকতা, ভণ্ডামীর অপরিহার্যতা অস্বীকার করলে চলবে না। যে উপায়ে সিদ্ধিলাভ ঘটে, ম্যাকিয়াভেলি তাকেই প্রশংসনীয় বলে মনে করেছেন। সুতরাং, ম্যাকিয়াভেলির দর্শনে রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজনীয়তার স্থান নৈতিক মূল্যবোধের ঊর্ধ্বে।"[১২]

বলাই বাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্রের রাষ্ট্র-সংক্রান্ত ধারণা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি কখনোই নীতিহীনতাকে রাষ্ট্রের কাঠামোতে স্থান দিতে পারেননি।

উপনিবেশের রাজকর্মচারী ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। রাষ্ট্রযন্ত্রের অঙ্গ হিসেবে কাজ করার সুবাদে, আর পাঁচজন সমকালীন বাঙালির তুলনায় রাষ্ট্র-বিষয়ে কিছু বেশিই ভাবনাচিন্তা করেছিলেন তিনি। নির্দিষ্ট কোন প্রবন্ধে তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার পরিকাঠামো পাওয়া না গেলেও, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা তাঁর রচনাবলীর নানা মন্তব্য থেকেই তার নির্মাণ করে নেওয়া সম্ভব। বিশেষ করে আমরা দেখতে চাইব, বঙ্কিমচন্দ্রের রাষ্ট্র-ভাবনায় যৌনতার অবস্থানকে।

'কৃষ্ণচরিত্র'-এ বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন 'রাষ্ট্র'কে দৃঢ়বদ্ধ করতে হলে সবার আগে চাই উপযুক্ত শাসনব্যবস্থা—'রণজয়, রাজ্য স্থাপনের প্রথম কার্য্যমাত্র; তাহার শাসন জন্য বিধিব্যবস্থাই (Legislation) প্রধান কার্য্য।' (পৃ. ২৩৮-৩৯) 'ভগবদগীতা'র অনুবাদেও বঙ্কিম জানান—'রাজার স্বধর্ম্ম—রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন।' (পৃ.১৩১) অর্থাৎ, রাষ্ট্রের পরিচালনভার যাঁদের হাতে থাকবে তাঁদেরকে প্রজার পালন ও শাসনের জন্য 'বিধি-ব্যবস্থা' তৈরি করতে হবে। এই 'বিধি-ব্যবস্থা' আম-জনতার উপরে কীভাবে ক্রিয়াশীল হবে? বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তর—'দুই উপায়; বাহুবল এবং বাক্যবল।' (পৃ.৩৪৮) 'বাহুবল' মানে আজকের পরিভাষায় রাষ্ট্রের হাতে থাকা সেনা-বাহিনী। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে—'বাহুবল—পশুর বল; কিন্তু মনুষ্য অদ্যাপি কিয়দংশে পশু, এ জন্য বাহুবল মনুষ্যের প্রধান অবলম্বন।' (পৃ.৩৪৯) কিন্তু, 'বাহুবল' দিয়ে যে গোটা সমাজকে শান্তিপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় না, একথা 'হাকিম' বঙ্কিমবাবুর চেয়ে ভালো আর কে বুঝত। তাই 'সর্ উইলিয়ম গ্রে ও সর্ জর্জ কাম্বেল' প্রবন্ধে তিনি লেখেন—'যাহার প্রতি ঘৃণা আছে,

তাহার সুখ-দুঃখের ভাগী হওয়া যায় না, প্রজার সুখ-দুঃখের ভাগী না হইলে, কখন প্রজার সুখ বৃদ্ধি, দুঃখ নিবারণ করা যায় না।' (পৃ. ৩৩১) ফলে, বঙ্কিমচন্দ্রের ঝোঁক 'বাক্যবল'-এ—'সামাজিক অত্যাচার নিবারণের বাক্যবল একমাত্র উপায়।' (পৃ.৩৫০) কাকে বলব তবে 'বাক্যবল'? বঙ্কিমচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত উত্তর—'কথায় বুঝাইতে হয়। এই জন্য আমি ইহাকে বাক্যবল নাম দিয়াছি।' (পৃ. ৩৫০) 'ভগবদগীতা'র অনুবাদে এইসূত্রেই বঙ্কিম লেখেন—'ধর্মশাস্ত্রের কাছে অর্থশাস্ত্র দুর্ব্বল.... "Law"-র উপর "Morals".'(পৃ. ১৬)

বেশ, তবে বোঝা গেল, বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পিত রাষ্ট্রে 'বাহুবল' নয়, 'বাক্যবল'-এর দ্বারা 'বিধিব্যবস্থা' সংস্থাপনের মাধ্যমে 'রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন' করা হবে। এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের মতামত ঃ

> 'বঙ্কিমচন্দ্রের রাষ্ট্রচিন্তায় ব্যক্তিমানুষের অধিকার অপেক্ষা তার সামাজিক দায়দায়িত্ব অধিক গুরুত্ব পেয়েছে।..... তাঁর চিন্তায় কল্যাণকর রাষ্ট্রের প্রকৃত বনিয়াদ হল মানুষের শুভ প্রবণতা; সেজন্যে তিনি লোকের শুভ বোধ ও আচরণ, নীতিপরায়ণতা ও চেতনার উন্মেষ চাইতেন।'[১৩]

ঠিকই লক্ষ করেছেন শ্রীগঙ্গোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্র আসলে 'বাক্যবল'-এর মাধ্যমে জনসাধারণের 'শুভবোধ' ও 'নীতিপরায়ণতা'-র 'উন্মেষ' ঘটাতে চাইছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পিত রাষ্ট্রে রাজা 'বাক্যবল'-এর মাধ্যমে কোন নীতি শেখাবেন প্রজাদের? 'ভালবাসার অত্যাচার' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন, রাজা আমাদের 'হিতাহিতবেত্তা' (পৃ. ৯২)। ফলে তাঁর 'সদসৎ বিবেচনা' দিয়ে তিনি আমাদের 'প্রবৃত্তি দমনের' চেষ্টা করতে পারেন। কেননা, আমরা প্রজারাই সেই 'অধিকার তাঁহাকে দিয়াছি।' (পৃ. ৯২) বেশ কথা। কোন্ 'প্রবৃত্তি দমনের' কথা তবে বলতে চান বঙ্কিম? গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ৪৩ সংখ্যক শ্লোকের অনুবাদে তিনি লেখেন—'এইরূপ বুদ্ধির দ্বারা পরমাত্মাকে বুঝিয়া আপনাকে স্তম্ভিত করিয়া, হে মহাবাহো! তুমি কামরূপ দুরাসদ শত্রুকে জয় কর।' (পৃ.১৩৪) এই শ্লোকের 'কাম' শব্দের অর্থ বোঝাতে গিয়েই তাঁর মন্তব্য—'সভ্যসমাজে মনুষ্যের একটি ইন্দ্রিয় এত প্রবল দেখা যায় যে, "ইন্দ্রিয়দোষ" বলিলে সেই ইন্দ্রিয়ের দোষই বুঝায়।' (পৃ. ১৩৬) এই 'ইন্দ্রিয়দোষ'-এর 'প্রাবল্য নিবারণের' পঞ্চবিধ উপায় ব্যাখ্যা করেন বঙ্কিম। তার মধ্যেই অন্তিম এবং—'সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায়—কেবল ঈশ্বরচিন্তার নীচে—পবিত্র দাম্পত্য-প্রণয়।' (পৃ.১৩৭) আরো অদ্ব্যর্থ ভাষায় এই অনুবাদেই লিখবেন বঙ্কিমচন্দ্র—'ইন্দ্রিয়সংযম ভিন্ন কোন প্রকার ধর্ম্মাচরণ নাই, ইহা সকল ধর্ম্মগ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠা, সকল ধর্ম্মমন্দিরের প্রথম সোপান।' (পৃ.৯৯) বুঝতে অসুবিধা হয় না, বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ কল্পিত রাষ্ট্রেরও 'প্রথম সোপান' এই 'ইন্দ্রিয়সংযম' তথা পবিত্র 'দাম্পত্য প্রণয়'-ই। 'ধর্মতত্ত্ব' তারই সুবিস্তৃত ভাষ্য।

হেস্টি-বঙ্কিম বিতর্ক ঃ

জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আজীবন চিন্তারত যে বঙ্কিমচন্দ্র, 'বঙ্গদর্শন' পর্বের কয়েকটি রচনায় তাঁর দেখা মেলে। ১২৮০ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' 'একা—''কে গায় ওই?''—রচনায় কমলাকান্তরূপী বঙ্কিম লেখেন—'প্রীতি সংসারে সর্বব্যাপিনী—ঈশ্বরই প্রীতি।... মনুষ্যজাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে তবে আমি অন্য সুখ চাই না।' (পৃ. ২) ক্রমজায়মান এই প্রীতি-তত্ত্বের গাঢ়ত্ব প্রাপ্তি যে 'দম্পতিপ্রীতি'তে, তার প্রমাণ মেলে কমলাকান্তের 'আমার মন' (মাঘ, ১২৮০) রচনায়—'যদি বিবাহনিবন্ধন তোমাদের চিত্ত মার্জ্জিত না হইয়া থাকে, যদি আত্মপরিবারকে ভালবাসিয়া, তাবৎ মনুষ্যজাতিকে ভালবাসিতে না শিখিয়া থাক, তবে মিথ্যা বিবাহ করিয়াছ; কেবল ভূতের বোঝা বহিতেছ। ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি বা পুত্রমুখ নিরীক্ষণের জন্য বিবাহ নহে। যদি বিবাহবন্ধে মনুষ্য চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন না হইল, তবে বিবাহের প্রয়োজন নাই।... যে বিবাহে প্রীতি শিক্ষা না হয়, সে বিবাহে প্রয়োজন নাই।' (পৃ. ১৭) বঙ্গদর্শনেই প্রকাশিত 'মনুষ্যত্ব কি?' (আশ্বিন, ১২৮৪) প্রবন্ধ থেকে আরো স্পষ্ট, বঙ্কিম-মননে ক্রমপ্রসারণশীল 'মনুষ্যত্ব'-এর এক কাঠামো—'বস্তুতঃ সকল প্রকার মানসিক বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলন, সম্পূর্ণ স্ফূর্তি ও যথোচিত উন্নতি ও বিশুদ্ধিই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য।' (পৃ. ৩৬৩-৬৪) 'ধর্ম' যে আসলে একপ্রকার 'অনুশীলন', বোঝা যায়, 'বঙ্গদর্শন' পর্বেই বঙ্কিমচন্দ্রের মননে সেই ধারণা উদ্ভূত হয়েছিল। কিন্তু, ক্রমপরিস্ফূটমান সেই ধারণার দৃঢ়বদ্ধ রূপ ধারণের জন্য সম্ভবত একটি অনুঘটকের প্রয়োজন ছিল। রেভারেণ্ড হেস্টি সেই অনুঘটকরূপে আবির্ভূত হলেন, ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে।

১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ১৭ নভেম্বর শোভাবাজার রাজবাড়িতে মহারাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের পিতামহীর 'দানসাগর শ্রাদ্ধ' জাঁকজমকপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়। স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় ২০ নভেম্বর তার বিবরণ প্রকাশিত হয়। এই 'দানসাগর শ্রাদ্ধ'-এ উপস্থিত গৃহদেবতা 'গোপীনাথজী'-র মূর্তিকে উপলক্ষ করে 'জেনেরাল অ্যাসেমব্লিজ্ ইনস্টিটিউশন'-এর অধ্যক্ষ রেভারেণ্ড ডঃ হেস্টি ভারতীয়দের মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় তীব্র পত্রাঘাত করেন। হেস্টির প্রতিপক্ষ রূপে 'রামচন্দ্র' ছদ্মনামে বঙ্কিমচন্দ্র মসীযুদ্ধে লিপ্ত হন। সমকালীন 'ভারতবন্ধু' পত্রিকায় ২০ জানুয়ারি ১৮৮৩-তে এই হেস্টি-বঙ্কিম বিতর্ক সম্পর্কে আলোকপাত করা হয় ঃ

> 'কিছুদিন হইল শোভাবাজার রাজবাটীতে একটি শ্রাদ্ধোপলক্ষে অনেক টাকা ব্যয়িত হয়। জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনের প্রিন্সিপাল রেভারেণ্ড মেঃ হেস্টি এই সূত্রে 'এমন সামান্য বিষয়ে এত অর্থ ব্যয় করা নিতান্ত অন্যায়, ইহাপেক্ষা দাতব্য চিকিৎসালয় করিলেই

ভাল হইত। হিন্দুধর্ম ধর্মই নয়, ইহাতে কোন সার পদার্থ নাই, কেবল বাহ্যাড়ম্বর পূর্ণ।' এইরূপ অনেক কথা লিখিয়া 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রে একখানি দীর্ঘ পত্র প্রকাশ করেন। বঙ্কিমবাবু বিলক্ষণ করিয়া ঐ স্টেটস্‌ম্যানেই তাহার একটি উত্তর দেন। এইরূপে হেস্টিসাহেব ও বঙ্কিমবাবুতে প্রায় দেড় মাস ধরিয়া বিতণ্ডা চলে।'[১৪]

হেস্টির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের পত্র-বিতর্কের একটি কালানুক্রমিক খতিয়ান নিম্নরূপ ঃ

চিঠির শিরোনাম	প্রেরক	প্রকাশের তারিখ
The Supposed Necessity of Idolatry.	W. Hastie.	September 23, 1882.
The Alleged Harmlessness of Idolatry.	W. Hastie.	September 26,1882.
The Ultimate Philosophy of Brahmanism.	W. Hastie.	September 29, 1882.
The Modern St. Paul.	Ram Chandra.	October 6, 1882.
The Modern Ram Chandra.	W. Hastie.	October 7, 1882
The Challenge Renewed.	W. Hastie.	October 14, 1882.
European versions of Hindoo doctrines.	Ram Chandra.	October 16, 1882.
Ram Chandra Redivivus.	W. Hastie.	October, 17, 1882.
The Intellectual Superiority of Europe.	Ram Chandra.	October 28, 1882.

বঙ্কিম-হেস্টি বিতর্কে কীভাবে রাষ্ট্র, পরিবার, যৌনতা সংক্রান্ত ধারণাগুলি বঙ্কিম-মননে দানা বাঁধছিল, তা এই পত্রগুলির সাক্ষ্যেই বোঝা যায়। ১৮৮২-র ২৩ সেপ্টেম্বরের প্রথম চিঠিতেই রেভারেণ্ড হেস্টি অশ্লীলতা ও অতিরেকী যৌনতার প্রশ্নে আক্রমণ শানালেন হিন্দুদের প্রিয় দুই দেবতা শিব এবং কৃষ্ণের উপরে—'No delicate mind can look into a Shiva temple without a shudder... And to take the special example in point of the Krishna Cult, what is it at the best,

with all its merry music and mincing movements, but the apotheosis of sensual desire and the idolatry of merely finite life?' (Pg. 187)

২৬ অক্টোবরের চিঠিতে 'রামচন্দ্র' ছদ্মনামে বঙ্কিম আক্রমণ করেন হেস্টিকে, এই বলে, যে হেস্টির এই অন্যায় আক্রমণ আসলে একটি সম্মাননীয় পরিবারের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের গণ্ডি ছাড়িয়ে, হিন্দুসমাজ, হিন্দুধর্ম তথা রাষ্ট্রের প্রতি ধাবিত হচ্ছে—'Mr. Hastie attacks, without any provocation, the proceedings, in a solemn mourning ceremony held in the private dwelling house of one of the most respectable Hindu families in the country; attacks all the most respected members of native society; attacks their religion; attacks the religion of the Nation.' (Pg. 203) হেস্টির আক্রমণের মুখে, বঙ্কিমচন্দ্র ২৮ অক্টোবরের চিঠিতে শিব আর কৃষ্ণের যৌনজীবন সম্পর্কে যাবতীয় কুরুচিকর ইঙ্গিতের বিরুদ্ধে উপস্থাপন করলেন তাঁর ব্যাখ্যা—'Krishna is Soul, Radha is Nature...in this union of the Soul with Nature lies the source of all beauty, all truth, and all love. And this magnificent legend, the basis of the Hindu religion, of *love for all that exists.*' (Pg. 214) লক্ষ করে দেখুন, 'ধর্মতত্ত্ব'-এ একেই বঙ্কিম বলবেন 'জাগতিক প্রীতি'। আর, শিব-পার্বতীর পুরাকথা ব্যাখ্যার সূত্রে বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্টতই 'কামবৃত্তি'-'দম্পতিপ্রীতি'র দ্বৈরথের ইঙ্গিতও করেন—'The Kumara Sambhava,...celebrates the marriage of Nature with soul, typified in Uma and Siva...the union is a legitimate one—a holy marriage...the accomplishment of their union after purification through the sacrifice of earthly desires and the discipline of the heart.' (Pg. 215) আরেকটু পরে, ২৮ অক্টোবরের চিঠিতে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে 'ধর্মতত্ত্ব'-এর জন্ম-সম্ভাবনা—'Hinduism, like every other fully-developed religious system, consists of, first, a doctrinal basis or the creed; secondly, a worship or rites; and lastly, of a code of morals more or less dependent upon the doctrinal basis.' (Pg. 213)

হেস্টি-বিতর্কের সময় থেকেই যে বঙ্কিমচন্দ্রের মনে 'ধর্মতত্ত্ব'-এর কাঠামো বাঁধবার কাজ শুরু হয়ে গেছে, তার অন্যতর প্রমাণও মেলে। রেভারেণ্ড হেস্টির সঙ্গে মসীযুদ্ধের কিছু পরেই বঙ্কিম তাঁর

পজিটিভিস্ট বন্ধু যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষকে উদ্দেশ্য করে একগুচ্ছ পত্র-প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন। তাঁর জীবদ্দশায় অপ্রকাশিত এই 'Letters on Hinduism'-এই সহজলভ্য 'ধর্মতত্ত্ব' এবং 'কৃষ্ণচরিত্র'-এর সূতিকা-সমাচার। তৃতীয় চিঠিতে বঙ্কিম লিখেছেন—'I accept the worship of a personal God as the highest perfection of religion. A personal God alone realizes the highest and most perfect ideal of the Good, the Beautiful and the True. In that ideal alone is realized the complete unity and harmony of Goodness, Truth and Beauty. If religion is culture, the worship of such of a perfect ideal is by far the most important means of culture.' (Pg. 238) এই চিঠিরই অন্যত্র তাঁর বক্তব্য—'Religion, then, is a philosophy of life, and the principles of conduct flowing from it.' (Pg. 238) আর চতুর্থ চিঠিতে স্পষ্টই বোঝা যায়, 'ধর্মতত্ত্ব'-এর কাঠামো বাঁধার কাজ শেষ, এবার শুধু তার প্রকাশের অপেক্ষা—'I have said that religion is a philosophy of life in theory, and in practice principles of conduct in harmony with that philosophy.' (Pg. 241)

অনুশীলন-তত্ত্ব ঃ

'Calcutta University Institute'-এ বঙ্কিমচন্দ্রের তৈলচিত্র উন্মোচন করতে গিয়ে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন ঃ

> 'I have more than once heard him say that the object of Literature was aesthetic and moral culture and that he wrote his novels to prepare the way for his didactic works Dharmatattva and Krishnacharitra.'[১৫]

এই উল্টো চালের কথাটা শুনতে আশ্চর্য লাগলেও তা এক অর্থে অবশ্যই সত্য। আসলে ঘটনাটি অন্যোন্য। বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্মতত্ত্ব'-'কৃষ্ণচরিত্র'-এ যে তত্ত্বকাঠামো গড়ে তুলেছেন, তা যেমন তাঁর উপন্যাসে অনুসৃত হয়েছে, তেমনি বলা চলে উপন্যাসে ধাপে ধাপে তিনি যে তাত্ত্বিক বোধের কাঠামো গড়ে তুলেছেন, তা-ই পূর্ণাঙ্গ রূপ ধারণ করেছে 'ধর্মতত্ত্ব ও 'কৃষ্ণচরিত্র'-এ। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের সঙ্গে তাঁর এই তাত্ত্বিক বইদুটি, বিশেষত 'ধর্মতত্ত্ব'-এর সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।

১২৯১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে প্রথম প্রকাশিত হয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'নবজীবন' পত্রিকা। প্রথম সংখ্যাতেই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ 'ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা'। 'ধর্মতত্ত্ব'-এর গোড়াপত্তন এখানেই। শ্রাবণ থেকে পরের বছরের চৈত্র পর্যন্ত বঙ্কিম প্রায় ধারাবাহিকভাবে লেখেন বারোখানি প্রবন্ধ। কালানুক্রমিকভাবে তাদের পত্রিকা-প্রকাশের সূচী এইরূপ ঃ

প্রবন্ধ	প্রকাশকাল
ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা	শ্রাবণ, ১২৯১
মনুষ্যত্ব	ভাদ্র, ১২৯১
অনুশীলন	আশ্বিন, ১২৯১
সুখ	কার্তিক, ১২৯১
ভক্তি	মাঘ, ১২৯১
ভক্তি	বৈশাখ, ১২৯২
ভক্তি	আষাঢ়, ১২৯২
ভক্তি	শ্রাবণ, ১২৯২
ভক্তি	ভাদ্র, ১২৯২
ভক্তি	আশ্বিন, ১২৯২
প্রীতি	অগ্রহায়ণ, ১২৯২
দয়া	চৈত্র, ১২৯২

১২৯৫ বঙ্গাব্দে উপরোক্ত প্রবন্ধগুলিকে পুনর্বিন্যস্ত করে এবং কয়েকটি নতুন প্রবন্ধ যোগ করে বঙ্কিমচন্দ্র প্রকাশ করেন 'ধর্মতত্ত্ব' 'প্রথম ভাগ'—'অনুশীলন'। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে এই বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়, যার পরিবর্তনগুলি অবশ্যই বঙ্কিম-কৃত।

'কৃষ্ণচরিত্র' বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণের (১৮৯২) 'উপক্রমণিকা'-য় বঙ্কিম 'ধর্মতত্ত্ব'-এর মূল বক্তব্য সংক্ষেপে সূত্রবদ্ধভাবে উপস্থাপন করেছিলেন ঃ

'১। মনুষ্যের কতকগুলি শক্তি আছে। আমি তাহার বৃত্তি নাম দিয়াছি। সেইগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব।

২। তাহাই মনুষ্যের ধর্ম্ম।

৩। সেই অনুশীলনের সীমা, পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য।

৪। তাহাই সুখ।' (পৃ.৪)

মানুষের 'শক্তি' সম্ভারকে বঙ্কিমচন্দ্র 'বৃত্তি' নাম দিয়ে 'ধর্মতত্ত্ব'-এ চতুর্বিধ আয়তনে বিন্যস্ত করেন—

(১) 'শারীরিকী', (২) 'জ্ঞানার্জ্জনী', (৩) 'কার্য্যকারিণী' ও (৪) 'চিত্তরঞ্জিনী' (পৃ.২০)। যেহেতু সবরকম বৃত্তির 'অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতায়' ক্রমজায়মান হয় 'মনুষ্যত্ব', তার মানে 'শারীরিকী' বৃত্তির অনুশীলনও অবশ্য কাম্য। কিন্তু কতকগুলি 'শারীরিকী' বৃত্তি আছে, যেমন 'কামাদি', যারা 'সম্প্রসারণশক্তিশালিনী' (পৃ.২৩)। এই 'শারীরিকী' বৃত্তির অনুশীলন পদ্ধতি বলতে গিয়ে 'ধর্মতত্ত্ব'-এর গুরু শিষ্যকে জানান—'ইহার উপায় (১) ব্যায়াম, (২) শিক্ষা, (৩) আহার (৪) ইন্দ্রিয় সংযম। চারটিই অনুশীলন।' (পৃ. ৪৪) চতুপার্বিক অনুশীলনের মধ্যে 'ইন্দ্রিয় সংযম' অন্তিমে থাকলেও গুরুত্বে যে সেটিই সর্বাগ্রগণ্য তাও বুঝিয়ে দেন 'গুরু' বঙ্কিমচন্দ্র—'ইন্দ্রিয় সংযম ব্যতীত শরীরের পুষ্টি নাই, বল নাই, ব্যায়ামের সম্ভাবনা থাকে না, শিক্ষা নিষ্ফল হয়, আহার বৃথা হয়, আহার পরিপাকও হয় না।' (পৃ.৪৭) এই 'ইন্দ্রিয় সংযম'কেও আবার নিয়ন্ত্রণ করে কতকগুলি 'মানসিক বৃত্তি'—'ইন্দ্রিয়সংযম মানসিক বৃত্তির অনুশীলনের অধীন; মানসিক শক্তি ভিন্ন ইহা ঘটে না।' (পৃ.৪৭) এই 'মানসিক বৃত্তি'-র তিন প্রকার—(১) 'জ্ঞানার্জ্জনী' (২) 'কার্য্যকারিণী' ও (৩) 'চিত্তরঞ্জিনী'। তিন প্রকারের মানসিক বৃত্তির দ্বারা কীভাবে 'ইন্দ্রিয় সংযম' করা সম্ভব, 'অনুশীলন'-এর সেই পদ্ধতি বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসারেই বুঝে নেওয়া যাক ঃ

(১) 'জ্ঞানার্জ্জনী' ঃ 'জ্ঞানোপার্জ্জন ভিন্ন অন্য বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলন করা যায় না।' (পৃ. ৪৭) প্রত্যক্ষত 'পুস্তকপাঠ'-এর মাধ্যমে আর পরোক্ষত 'কথকতা' জাতীয় লোকশিক্ষার মাধ্যমে 'জ্ঞানোপার্জ্জন' সম্ভব, যা 'ইন্দ্রিয় সংযম'-এ সহায়তা করে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস থেকেই দুটি উদাহরণ নির্বাচন করা যাক ঃ

পদ্ধতি	উপন্যাস	উদাহরণ
প্রত্যক্ষ	রাজসিংহ	চঞ্চলকুমারীর প্রশ্নের উত্তরে রাজসিংহ 'রূপবতী ভার্য্যা'-র অপকারিতা বোঝাতে গিয়ে বলেছেন—'ঋণকারী পিতা শত্রুর্মাতা চ ব্যভিচারিণী।/ ভার্য্যা রূপবতী শত্রুঃ পুত্রঃ শত্রুরপন্ডিতঃ।।" (পৃ.১১১) এটি 'হিতোপদেশ' -এর শ্লোক। রাজসিংহ-এর 'পুস্তকপাঠ' তাঁর 'ইন্দ্রিয়সংযম'-এ সহায়তা করেছে।
পরোক্ষ	মৃণালিনী	হেমচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে মনোরমা বলেছে, সে 'পন্ডিতের নিকট' পুরাণ শুনেছে। শুনেছে গঙ্গা আর ঐরাবতের গল্প। তার থেকেই শিখেছে—'প্রণয় অমূল্য।' (পৃ. ৭২)

(২) 'চিত্তরঞ্জিনী' ঃ 'যেগুলি কেবল আনন্দ অনুভূত করায়' তাদেরকেই বঙ্কিম নাম দিয়েছিলেন 'আহ্লাদিনী' বা 'চিত্তরঞ্জিনী' (পৃ. ২০) বা 'মনোরঞ্জিনী' 'বৃত্তি' (পৃ. ৪৯)। স্থাপত্য, চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীত সব

থেকেই এই বৃত্তির অনুশীলন হতে পারে, কিন্তু—'কাব্যই চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলনের শ্রেষ্ঠ উপায়' (পৃ.১৩৪)। 'কুমারসম্ভবম্' কাব্য থেকে শিবের 'মহাক্রোধগীতি' উদ্ধার করে তাই বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন—'যোগভঙ্গকারী কুপ্রবৃত্তি ইহার দ্বারা বিনষ্ট' (পৃ.৬৩) হয়েছে।

(৩) 'কার্য্যকারিণী বৃত্তি' ঃ 'যেগুলির প্রবর্ত্তনায় আমরা কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, বা হইতে পারি, সেগুলিকে কার্য্যকারিণী বৃত্তি বলিব।' (পৃ. ২০) তার মধ্যে দু'টিকে বঙ্কিমচন্দ্র নির্দেশ করেন 'সর্বশ্রেষ্ঠ' বলে—'ভক্তি' আর 'প্রীতি' (পৃ.৫২)। তার মধ্যে—'প্রীতি ঈশ্বরে ন্যস্ত হইলেই সে ভক্তি হইল' (পৃ.৫২), অর্থাৎ মূলে একটিই বৃত্তি—'প্রীতি'। কেমন এই 'প্রীতি'?—'প্রীতি দ্বিবিধ, সহজ এবং সংসর্গজ।' (পৃ.১০৪) কিন্তু মানুষের প্রতি আমাদের প্রীতি 'স্বভাবসিদ্ধ'; বাৎসল্য বা প্রতিবাৎসল্য তার উদাহরণ। আর 'সংসর্গজ'? তার উদাহরণ 'স্ত্রীর প্রতি স্বামীর' আর 'স্বামীর প্রতি স্ত্রীর' প্রীতি। সংক্ষেপে 'দম্পতিপ্রীতি'।

তার মানে দাঁড়ালো এই যে 'কাম' একটি 'শারীরিকী বৃত্তি' যাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায় একটি 'কার্য্যকারিণী বৃত্তি' যার নাম 'দম্পতিপ্রীতি'। কিন্তু রাখতে পারে কি? 'ইন্দ্রিয়সংযম'-এর অনুশীলন না থাকলে, 'দম্পতিপ্রীতি'-কে 'কামবৃত্তি' আবৃত করতে চায় অথবা স্থানচ্যুত করতে চেষ্টা করে। 'ধর্মতত্ত্ব'-এর গুরুর ভাষায়—'অনেক সময়ে এই কামবৃত্তি আসিয়া দম্পতিপ্রীতিস্থান অধিকার করে। অনেক সময় তাহার স্থান অধিকার না করুক, দম্পতিপ্রীতির সঙ্গে সংযুক্ত হয়। সে অবস্থায় যে পরিমাণে ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি, বাসনার প্রবলতা, সেই পরিমাণে দম্পতিপ্রীতিও পাশবতা প্রাপ্ত হয়।' (পৃ.১২০)এর প্রতিকার কী? ইন্দ্রিয়ের উচ্ছেদ? তা অবশ্যই নয়—'বৃত্তি নিকৃষ্ট হউক বা উৎকৃষ্ট হউক, উচ্ছেদমাত্র অধর্ম্ম।' (পৃ. ২৫) গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫৮ সংখ্যক শ্লোকের ব্যাখ্যায় চমৎকারভাবে বুঝিয়ে দেন বঙ্কিম—'কূর্ম্ম তাহার হস্তপদাদি সংহৃত করিয়া রাখে—ধ্বংস করে না, এবং আবশ্যকমত তদ্বারা জৈবনিক কার্য্য নির্বাহ করে। ইন্দ্রিয়াদি সম্বন্ধেও তাই। ইহার সংযম ধর্ম্ম, ধ্বংস ধর্ম্ম নহে।' (পৃ. ১০০) 'কামাদি'র উচ্ছেদ নয়, অনুশীলন কাম্য বঙ্কিমচন্দ্রের। তাই সন্ন্যাস সম্পর্কেও তাঁর অনীহা স্পষ্ট—'সন্ন্যাসকে আমি ধর্ম্ম বলি না—অন্ততঃ সম্পূর্ণ ধর্ম্ম বলি না। অনুশীলন প্রবৃত্তিমার্গ—সন্ন্যাস নিবৃত্তিমার্গ।' (পৃ. ২৮) বোঝা যায় কেন বঙ্কিমচন্দ্র 'গার্হস্থ্য'কেই বলেছিলেন 'কার্য্যকারিণী বৃত্তি'র অনুশীলন-স্থল আর কেনই বা যিশু-বুদ্ধকে প্রত্যাখ্যান করে আদর্শ রূপে বেছে নিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণকে। মোদ্দা কথা, বঙ্কিমি-বাচন থেকে স্পষ্ট, জাতীয়তাবাদী যৌনতা-চিন্তার অন্যতম যে মাত্রা—'ব্রহ্মচর্য্য'—তার প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিগতভাবে অন্তত কোনও সহানুভূতি ছিল না।

'দম্পতিপ্রীতি'কে আঘাত করা 'কামবৃত্তি'কে 'উচ্ছেদ' না হয় না-ই বা করা হল; তবে এর 'অনুশীলন' করা হবে কী করে? বঙ্কিম-কল্পিত সেই 'অনুশীলন'-এর নাম 'দুঃখভোগ'। 'বিষবৃক্ষ'-এ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা—'... চিত্তসংযমপক্ষে শিক্ষাই মূল।... অন্তঃকরণপক্ষে দুঃখভোগই প্রধান শিক্ষা।' (পৃ. ৮৪) প্রচলিত

হিন্দুধর্মের ধারায় যে ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করার কথা বলা হয়, তবে তাই কি 'দুঃখভোগ'? 'চিত্তশুদ্ধি' প্রবন্ধে কোম্‌ত-শিষ্য বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তর ভিন্নধারার—'যোগে বা তপস্যায় ইন্দ্রিয় সংযম পাওয়া যায় না। কার্য্যক্ষেত্রেই, সংসার ধর্ম্মেই ইন্দ্রিয়সংযম লাভ করা যায়।... যে প্রত্যহ ইন্দ্রিয়চরিতার্থের উপযোগী উপাদানসমূহের সংসর্গে আসিয়াছে, তাহাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া কখন জয়ী, কখন বিজিত হইয়াছে, সেই পরিশেষে ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারিয়াছে।' (পৃ. ১৭২-৭৩) এই নিরন্তর সংঘর্ষেরই অপর নাম 'দুঃখভোগ'। অর্থাৎ, 'দুঃখভোগ'-এর মাধ্যমে চিত্ত সংযমের শিক্ষা পাওয়া যায়, যা 'কামবৃত্তি'-কে নির্জিত করে 'দম্পতিপ্রীতি'-তে উপনীত হতে সহায়তা করে। কিন্তু, এই 'দম্পতিপ্রীতি'-র মধ্যেও তো 'কামবৃত্তি' রয়েছে। তার 'অনুশীলন' করতে হবে কীভাবে? স্বামী এবং স্ত্রী—উভয়ের পক্ষ থেকেই বিষয়টিকে ভেবেছেন বঙ্কিমচন্দ্র ঃ

(ক) '... স্ত্রীর পালন ও রক্ষা ব্যতীত প্রজার বিলোপ সম্ভাবনা। এ জন্য তৎপালন ও রক্ষণ জন্য স্বামীর প্রাণপাত করাও ধর্ম্মসঙ্গত।' (পৃ. ১১৯)

(খ) 'স্বামীর পালন ও রক্ষণ স্ত্রীর সাধ্য নহে, কিন্তু তাঁহার সেবা ও সুখসাধন তাঁহার সাধ্য।... অতএব স্বামীর সেবা, সুখসাধন ও ধর্ম্মের সহায়তা, ইহাই স্ত্রীর ধর্ম্ম।' (পৃ. ১১৯)

'প্রজার বিলোপ' শব্দযুগলেই ইঙ্গিত আছে, বঙ্কিম দাম্পত্যের ক্ষেত্রে পুরুষের একমাত্র 'প্রজননমুখী যৌনতা'কেই স্বীকার করে নিচ্ছেন। অন্যদিকে 'স্বামীর সেবা, সুখসাধন' করার বক্তব্যে বোঝা যায়, নারীর ক্ষেত্রেও একমাত্র 'প্রজননমুখী যৌনতা'কেই দাম্পত্যের বন্ধনের মধ্যে তিনি স্বীকৃতি দিয়েছেন। 'দম্পতিপ্রীতি'র মধ্যস্থ 'কামবৃত্তি' অনুশীলিত হবে সুখসাধন এবং সন্তান-উৎপাদনের মাধ্যমে।

'কামবৃত্তি' তথা 'আশ্লেষমুখী যৌনতা'-কে নানাভাবে সংহত-সংযত করে 'দম্পতিপ্রীতি'ময় 'পরিবার গড়ে তোলবার এই যে বঙ্কিমী-আকুলতা, আসলে তা ছিল তাঁর বৃহত্তর স্বদেশ-গঠন পরিকল্পনারই অংশমাত্র। 'ধর্মতত্ত্ব' অনুসরণে সাজিয়ে নেওয়া যাক বঙ্কিমচন্দ্রের রাষ্ট্র-পরিবার-যৌনতার সেই অভিপ্রেত কাঠামো, অবশ্যই টীকা-সহযোগে ঃ

(ক) 'গৃহস্থ পরিবারের যে গঠন, সমাজের সেই গঠন। গৃহের কর্তার ন্যায়, পিতা মাতার ন্যায়, রাজা সেই সমাজের শিরোভাগ। তাঁহার গুণে, তাঁহার দণ্ডে, তাঁহার পালনে সমাজ রক্ষিত হইয়া থাকে।' (পৃ. ৫৪) লক্ষণীয় দুটি বিষয়। এক. 'রাষ্ট্র'-এর প্রতিশব্দ বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে সমাজ আর দুই. বঙ্কিম বারবার 'রাজা' শব্দ প্রয়োগ করলেও—'যে দেশে একজন রাজা নাই—যে রাজ্য সাধারণতন্ত্র' (পৃ. ৫৪) তার পরিকল্পনাও যে তাঁর মাথায় ছিল, তা আমরা বুঝি।

(খ) 'সমাজকে ভক্তি করিবে। ইহা স্মরণ রাখিবে যে, মনুষ্যের যত গুণ আছে, সবই সমাজে

আছে। সমাজ আমাদের শিক্ষাদাতা, দণ্ডপ্রণেতা, ভরণপোষণ এবং রক্ষাকর্ত্তা। সমাজই রাজা, সমাজই শিক্ষক।' (পৃ. ৫৯-৬০) বঙ্কিম-কল্পনায় রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব সর্বময়। রাষ্ট্র 'শিক্ষাদাতা' এবং 'দণ্ডপ্রণেতা'। তার মানে যৌনতা বিষয়ে আমাদের আচরণ কী হবে, সেই মান্য বিধি 'শিক্ষা' দেবেও রাষ্ট্র, আবার সেই মান্যতা থেকে চ্যুত হলে 'দণ্ড' দেওয়ার ক্ষমতাও 'রাষ্ট্র'-এর হাতে রইল।

(গ) 'ধর্ম্মজন্য সমাজ আবশ্যক। সমাজগঠনের পক্ষে একটি প্রথম প্রয়োজন বিবাহপ্রথা। বিবাহপ্রথার স্থূল মর্ম্ম এই যে, স্ত্রী-পুরুষ এক হইয়া সাংসারিক ব্যাপার ভাগে নির্ব্বাহ করিবে।' (পৃ. ১২১) গোটা 'ধর্মতত্ত্ব' জুড়ে যে 'মনুষ্যত্ব' ধর্মের অনুশীলনের কথা বলা হয়, রাষ্ট্র তাতে সহায়তা করবে। কীভাবে? রাষ্ট্রের সমাধান—'বিবাহপ্রথা'। কেন এই বিবাহ? বঙ্কিমের উত্তর—'ধর্ম্মাচরণের জন্য দম্পতিপ্রীতি'। (পৃ. ১১৯) মনুষ্যত্বের অনুশীলন নিজের গৃহ থেকে, পরিবার থেকে, আরো নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের থেকে শুরু হবে, অর্থাৎ 'দম্পতিপ্রীতি' থেকে—'পরিবার হইতে প্রথম প্রীতিবৃত্তির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হই।'(পৃ. ১০৪)

(ঘ) আগেই বলেছেন বঙ্কিমচন্দ্র, পরিবার আর রাষ্ট্রের গঠনগত মিল আছে। তাহলে পরিবারের মধ্যে 'প্রীতি'র অনুশীলন নিশ্চয় ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের প্রতি ধাবিত হবে—'পারিবারিক অনুশীলনে প্রীতিবৃত্তি কিয়ৎপরিমাণে স্ফুরিত হইলে পরিবারের বাহিরেও বিস্তার কামনা করে। ... ক্রমে আপনার গ্রামস্থ, নগরস্থ, দেশস্থ, মনুষ্যমাত্রের উপর নিবিষ্ট হয়। যখন নিখিল জন্মভূমির উপর এই প্রীতি বিস্তারিত হয়, তখন ইহা সচরাচর দেশবাৎসল্য নাম প্রাপ্ত হয়।' (পৃ. ১০৪) তার মানে 'স্বদেশপ্রীতি'-তে উপনীত হওয়ার প্রথম ধাপ 'পরিবারপ্রীতি' তথা 'দম্পতিপ্রীতি'। আর 'ধর্মতত্ত্ব'কারের শেষ বাণী—'স্বদেশপ্রীতিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলা উচিত।' (পৃ. ১৪১)

এবার তবে সারসংক্ষেপ করা যাক বঙ্কিমি-পরিকল্পনার। সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম 'স্বদেশপ্রীতি'। 'স্বদেশপ্রীতি'র প্রথম ধাপ 'দম্পতিপ্রীতি'। সেই 'দম্পতিপ্রীতি'-কে আঘাত করতে পারে 'কামবৃত্তি'। তাই বৃহত্তর অর্থে 'রাষ্ট্র'-এর মঙ্গলার্থেই 'কামবৃত্তি'-কে সংযত করা উচিত। অর্থাৎ, 'রাষ্ট্র'-এর স্থিতিশীলতার অন্যতম মূলীভূত কারণ 'ইন্দ্রিয় সংযম'। সঙ্গতভাবেই 'ধর্মতত্ত্ব'-এর গুরুর বাচন—'... বিশেষতঃ দম্পতিপ্রীতি, সকল জাতির কাব্য-সাহিত্য অধিকৃত করিয়া রাখিয়াছে। সমস্ত জগতে ইহাই কাব্যের একমাত্র উপাদান বলিলেও বলা যায়।' (পৃ. ১২২) 'সমস্ত জগতে' না হোক্ অন্তত বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যজগতে যে 'দম্পতিপ্রীতি'-ই 'একমাত্র উপাদান'—তা মোটেই অত্যুক্তি নয়।

উল্লেখপঞ্জি ঃ

১. বহু পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্যে অনূদিত, মহাকবি কালিদাসের গ্রন্থাবলী, শ্রীনবকুমার বসু এণ্ড কোম্পানি দ্বারা প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৩০২ সাল, পৃ. ৩৩৩।

২. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, বঙ্কিমচন্দ্রজীবনী, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯১, পৃ. ৪৭৬।

৩. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত 'মাসিক বঙ্গদর্শন' পত্রিকার হুবহু পুনর্মুদ্রণ, বঙ্গদর্শন ১, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলিকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃ. ৩৪০।

৪. সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত, বঙ্কিমপ্রসঙ্গ, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ১১৯।

৫. সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, নবীনচন্দ্র রচনাবলী, প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৬৬, পৃ. ৪৫৮।

৬. অশোককুমার রায় সম্পাদিত, বঙ্কিম প্রসঙ্গ, তারকনাথ বিশ্বাস, পারুল প্রকাশনী, কলিকাতা, ২০০৮, পৃ. ৪।

৭. বঙ্কিমচন্দ্রের ছদ্মনামের সঙ্গে তাঁর 'পরিবার'-এর এই গোপন যোগটুকু আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন শ্রীতপোব্রত ঘোষ।

৮. অশোককুমার রায় সম্পাদিত, বঙ্কিম প্রসঙ্গ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭।

৯. চিত্ররেখা গুপ্ত, প্রথম আলোর চরণধ্বনি [উনিশ শতকের লেখিকাদের কথা], উর্বী প্রকাশন, কলকাতা, জুন ২০০৯, পৃ. ২০২।

১০. অরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত; প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, দারোগার দপ্তর, প্রথম খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ২৪৫।

১১. দ্র. শ্রীপান্থ, মোহন্ত এলোকেশী সম্বাদ, আনন্দ, কলকাতা, এপ্রিল ২০০৫।

১২. নির্মলকুমার সেন, রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ২৭।

১৩. সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, বাঙালির রাষ্ট্রচিন্তা, প্রথম খণ্ড, জি. এ. ই. পাবলিশার্স, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ১৯৮৬, পৃ. ৯২।

১৫. অলোক রায়, আলেকজাণ্ডার ডাফ ও অনুগামী কয়েকজন, প্যাপিরাস, কলিকাতা, ১৯৮০, পৃ. ৭৮-৭৯।

১৪. রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, ঐতিহ্য ও পরম্পরা, প্যাপিরাস, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃ. ১২০।

তৃতীয় অধ্যায়

ত্রিধাবিন্যস্ত কাঠামো ও বঙ্কিম-উপন্যাসের নির্মাণ

কবিতা-পাঠ ঃ

'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের পর থেকে তার পাতায় বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজনৈতিক ধারণার একটি স্পষ্ট রূপরেখা স্ফুটতর হয়ে উঠতে থাকে, মুখ্যত প্রবন্ধ, গৌণত উপন্যাসের মাধ্যমে। তৎপূর্ববর্তী সময়ে পরিবার, যৌনতা ইত্যাদি বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা কী ছিল তার খতিয়ান মেলে ১৮৬৪-তে প্রকাশিত 'Rajmohan's Wife' থেকে শুরু করে ১৮৬৯-এর 'মৃণালিনী' অবধি চারটি উপন্যাসে। তারও পূর্বে, বঙ্কিম-প্রতিভার 'সল্‌তে পাকানোর কালে' এ বিষয়ে কী ভেবেছিলেন তিনি, তা জানার একমাত্র উপায় বঙ্কিমের কৈশোরক কাব্যকৃতির তন্নিষ্ঠ বিচার।

যৌনতা বিষয়ে তরুণ বঙ্কিমচন্দ্রের 'আঁতের কথা' লুকিয়ে রয়েছে যে-সমস্ত কবিতাগুলিতে, মুদ্রণের কালানুক্রম অনুসারে তারা এইরূপ ঃ

কবিতার নাম	পত্রিকা	প্রকাশকাল
প্রথম চরণে স্ত্রীর উক্তি দ্বিতীয় চরণে পতির উত্তর	সংবাদ প্রভাকর	২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫২
হেমন্ত বর্ণনাছলে স্ত্রীর সহিত পতির কথোপকথন	সংবাদ প্রভাকর	১০ জানুয়ারি, ১৮৫৩
শিশির বর্ণনাছলে স্ত্রী-পতির কথোপকথন	সংবাদ প্রভাকর	৫ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৩
দূরদেশ গমনের বিদায়	সংবাদ প্রভাকর	১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৩
বিচিত্র নাটক (তিন মিত্রের কথোপকথন)	সংবাদ প্রভাকর	২৭ মে, ১৮৫৩

অবশেষে ১৮৫৬ সালে মুদ্রিত হয় বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ কাব্য 'ললিতা-পুরাকালিক গল্প তথা মানস।' ঠিক কী লিখেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, এই কবিতাগুলিতে, দাম্পত্য ও যৌনতা বিষয়ে?

১৮৫২-র ২৫ ফেব্রুয়ারির কবিতায় স্ত্রী হরেক প্রাকৃতিক ঘটনার কারণ জানতে চায় আর স্বামী পর্যায়ক্রমে প্রত্যেকটি কারণের সঙ্গে ভারতচন্দ্রীয় রীতিতে যুক্ত করে দেয় স্ত্রীর সৌন্দর্যের এক-একটি বৈশিষ্ট্য। নব্য-দাম্পত্য-ভাবনার প্রাণ-ভোমরা যে একাত্মতা, বঙ্কিমচন্দ্রের এই কবিতায় তার প্রথম হদিশ মেলে ঃ

'স্ত্রীং। সখা হোলে একাঙ্গ কি, হয় গুণমণি।
পং। ভাবের এমনি ভাব, এ ভাব এমনি॥
স্ত্রীং। তবে কেন তুমি আমি, এক অঙ্গ নই।
পং। দেহে যদি নই, কিন্তু অন্তরেতে হই॥' (পৃ. ৩-৪)

ঠিক এক বছর বাদে 'দূরদেশ গমনের বিদায়' কবিতায় স্বামী-স্ত্রীর অনন্যব্রত হয়ে ওঠার সংবাদ পাই ঃ

'যথা যাব তথা রব, প্রেমডোরে বাঁধা তব,
অন্তরে অন্তরে বাঁধা, প্রণয়েরি পাশে লো।
স্বপনে নয়নে মনে, হেরিব সে চন্দ্রাননে,
হেরিব সে বিধুমুখ, মৃদু মৃদু হাসে লো।।' (পৃ. ২৩)

'বিচিত্র নাটক' কবিতাতেও 'প্রথম মিত্র'-এর কলমে কিশোর বঙ্কিমচন্দ্রের অস্ফুট দাম্পত্য চেতনার নৈতিক খসড়াটি ফুটে উঠতে দেখি ঃ

'এ কথাটি ভাল বটে, রটে ধরাময়।
পরমে পুলকপ্রদ, প্রমদা প্রণয়॥
বিশেষতঃ কত তাহে, ধর্ম্মের সঞ্চার।
বিবাহ বিশেষ তাই, বিধি বিধাতার॥
নর নারী উভয়েতে, হইয়া মিলিত।
আরাধনে করিবেক, পরমেশে প্রীত॥' (পৃ. ৪০)

এই পর্যায়ে ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে রচিত 'ললিতা' কাব্যের আখ্যানভাগ লক্ষণীয়। ললিতা আর মন্মথর প্রণয়, বিবাহ এবং মৃত্যুর পর তাদের বৃক্ষরূপে জন্মান্তরীয় দাম্পত্যযাপন—এই কাব্যের বিষয়বস্তু। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বিবাহ হয় পঞ্চমবর্ষীয়া মোহিনী দেবীর সঙ্গে। ষোড়শী মোহিনী দেবী মারা যান ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে। প্রথম 'দম্পতিপ্রীতি' যা উন্মেষ-সম্ভাবনাতেই খণ্ডিত, তার স্মৃতিচারণে ব্যথিত

বঙ্কিমচন্দ্রের হাহাকারও তাঁর এই সময়ের কবিতাতেই প্রকাশিত ঃ

'কেন কাঁদিব না সখে, কেন ভা[বি]ব না
সে কম মোহিনী মূর্ত্তি নয়নরঞ্জন
তুমি কি জানিবে হায়, কতেক বৎ[স]র আজ
কত সুখ কত আশা দিয়া বিসর্জ্জন
পাগলের মত আহা, বেড়াইয়াছি ছুটি ছুটি,...
নির্জনে চীৎকার করি, কাঁদিয়াছি প্রাণভরি—
করিবারে লঘু পথে হৃদয়ের ভার।'[১]

প্রৌঢ় বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্মতত্ত্ব'-এ লেখেন 'দম্পতিপ্রীতি'র মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে 'কামবৃত্তি'-ও থাকে। নবীন যৌবনে প্রণয়িনী গৃহিণীতে তৃপ্ত বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতায় দাম্পত্যের গুণগানের পাশেই যথাযোগ্য মর্যাদা পেয়েছে তদন্তর্গত 'কামবৃত্তি'ও। 'শিশির বর্ণনাছলে স্ত্রী-পতির কথোপকথন'-এ তাই রীতিমতো ডাকাবুকো স্ত্রীর মন্তব্য ঃ

'দেখ প্রাণ ধন, মুদিয়া নয়ন,
তাড়াই আগুন, শয্যায় চল।।' (পৃ. ২১)

আর 'হেমন্ত বর্ণনাছলে স্ত্রীর সহিত পতির কথোপকথন' কবিতায় স্বামী স্ত্রী-কে বলে ঃ

'মোর বোধ হয়, এলো হিমালয়,
কুচগিরি হোতে তোর।
কেন না সে স্থল, বড়ই শীতল,
স্নিগ্ধ কর হৃদি মোর॥' (পৃ. ১৬)

রূপভোগলালসা ঃ

'মনুষ্য মাত্রেই পতঙ্গ। সকলেরই এক একটি বহ্নি আছে—সকলেই সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে চাহে' (পৃ. ১২)—এমনটাই মনে হয়েছিল কমলাকান্তরূপী বঙ্কিমচন্দ্রের। আর সেই 'বহ্নি' রাজির মধ্যেও সবচেয়ে বেশি দাহিকাশক্তি সম্পন্ন কামবহ্নি বা রূপ-বহ্নি। বঙ্কিম-উপন্যাসে অক্লান্তভাবে পুনরাবৃত্ত হয়েছে তা। মুখ্য চরিত্রদের ক্ষেত্রে তো বটেই, গৌণ চরিত্র এমনকী প্রায় অনতিলক্ষ, উপন্যাসের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে-থাকা অসংখ্য মানুষের মধ্যেও বঙ্কিম লক্ষ করেছেন 'কামাতুরের চিত্তচাঞ্চল্য' (পৃ. ৮৯)।

মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে 'Indian Field' পত্রিকায় যে প্রায় রোমান্সধর্মী সামাজিক

উপন্যাস 'Rajmohan's Wife' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করলেন বঙ্কিমচন্দ্র, তার গোড়াতেই রয়েছে জনৈকা বিধবা জমিদারপত্নী 'করুণাময়ী'-র ব্যভিচারের কথা। স্বামীর মৃত্যুর পর নায়েব বংশীবদন ঘোষকে ঘিরে গুঞ্জরিত হয় যার 'কামবৃত্তি'—'... যদি একটা সজীব পতিপ্রতিনিধি করি তা'হলে আরও সুখদ হইবে সন্দেহ কি? কেন না, সজীব প্রতিনিধিতে কেবল যে চক্ষুর তৃপ্তি হইবে এমত নহে, সময়ে সময়ে কার্য্যোদ্ধারও সম্ভাবনা। অতএব একটা উপ-স্বামী স্থির করা আবশ্যক। পতি এমন পরম পদার্থ যে, একেবারে পতিহীন হওয়া অপেক্ষা একটা উপপতি রাখাও ভাল।' (পৃ. ২৬৭) লক্ষণীয়, ১৮৬৪-তেই বিধবা নারীর ব্যভিচার যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যঙ্গের লক্ষ্য হয়েছে, তেমনি তাঁর চোখ এড়ায়নি বংশীবদন ঘোষের মতো বিবাহিত পুরুষের অসংযত ইন্দ্রিয়লালসাও। একা বংশীবদন নন, তার উত্তরপুরুষ মথুর ঘোষের যে চিত্র বঙ্কিম আমাদের উপন্যাসের চতুর্দশ পরিচ্ছেদে উপহার দেন, তাও সমান কলঙ্করঞ্জিত—'Mathur Ghose was not perhaps formed by nature to love and be loved; affection was not certainly the ruling passion of his heart, but the power of woman and her beauty have their influence upon all...' (Pg. 57). বঙ্কিম-উপন্যাসের জগতে অতি-নগণ্য চরিত্রেরাও 'রূপ-বহ্নি' বিবিক্ষু 'পতঙ্গ'।

'আনন্দমঠ' উপন্যাসের এক রসিক জ্ঞানবৃদ্ধ পাহারাওয়ালা কল্যাণীকে বলেছিল—'বয়স আছে; মায়ি বয়স আছে, দুনিয়ামে ওহি তো জেওরাত হ্যায়! বল্‌কে হামি ডেকেত হতে পারে।' (পৃ. ১০০) 'রমণীরূপলাবণ্যে' লোলুপ অনেকেই। তাই ইন্দিরার মতো 'রাঙ্গা মেয়ে'কে একজন 'যুবা দস্যু' বলে—'আমি ইহাকে লইয়া ফাটকে যাই, সেও ভাল, তবু ইহাকে ছাড়িতে পারি না।' (পৃ. ৫) শেষ নয় এখানেই—'সে আর যাহা বলিল, তাহা লিখিতে পারি না।' (পৃ. ৫) রজনীও লক্ষ করেছিল এই কামাতুরতাকে; তার আত্মকথায় সে বলে—'অনেক বার পদচারীর ঘাড়ে পড়িয়াছি বটে—তাহার কারণ, কেহ কেহ অন্ধ যুবতী দেখিয়া সাড়া দেয় না, বরং বলে, ''আ মলো! দেখতে পাস্‌নে? কানা না কি?'' আমি ভাবিতাম, ''উভয়তঃ।'' ' (পৃ. ১২-১৩) তাই ইন্দিরাকে 'মহেশপুর' পৌঁছে দিতে 'পুরুষ অনেকেই স্বীকৃত হইল' কিন্তু আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণ বারণ করলেন—'উহাদিগের চরিত্র ভাল নহে।' (পৃ. ৯)

বঙ্কিমের উপন্যাসের জগতে এই যে অসংখ্য চরিত্র, যারা রূপ-বিবিক্ষু, কামোন্মত্ত, মুখ্যতই তারা পুরুষ। নিশির সঙ্গে প্রফুল্লর কথোপকথনের সামান্য অংশ উদ্ধার করা যাক—'প্র। রাজারা বিয়ে দিলে না? বয়স্যা। রাজপুত্র ইচ্ছুক ছিলেন—কিন্তু বিবাহটা গান্ধর্বমত। প্র। নিজে পাত্র বুঝি? বয়স্যা। তাও কয় দিনের জন্য বলিতে পারি না।' (পৃ. ৪৪) মাণিকলালের পত্রের ফাঁদে পা দেয় জনৈক নুর মহম্মদ খাঁ; ভাবে— 'পত্র যারই হউক, আমি কেন এই সুবিধাতে বিবিটাকে দেখিয়া আসি না।' (পৃ. ৮৭) সেনাবাহিনীর

মধ্যে ইন্দ্রিয়-অতৃপ্তির যে অভ্যাস বঙ্কিমচন্দ্র লক্ষ করেছেন, তারই করুণতম উপসংহার লক্ষ করি 'মৃণালিনী' উপন্যাসে নবদ্বীপ বিজয়ের পর যবন সেনার উন্মত্ত আচরণে—'গৃহপ্রবেশ করিয়া, গৃহস্থের সর্বস্বাপহরণ, পশ্চাৎ স্ত্রীপুরুষ, বৃদ্ধ, বণিতা, বালক, সকলেরই শিরশ্ছেদ, ইহাই নিয়মপূর্ব্বক করিতে লাগিল। কেবল যুবতীর পক্ষে দ্বিতীয় নিয়ম।' (পৃ. ৯৮)

সে যুগে যেমন, এ'যুগেও তেমনই পুরুষের কামবৃত্তির অলজ্জ প্রকাশ খুঁজে পেয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র। 'রজনী'র সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয় গোপাল বসুর। কী তার পরিচয়?—'গোপালের বয়স ত্রিশ বৎসর—একটি বিবাহ আছে, কিন্তু সন্তানাদি হয় নাই।' (পৃ. ১৮) ফলে, দ্বিতীয়া রজনীকে তার চাই, শুধুমাত্রই সন্তান উৎপাদনের যন্ত্ররূপে—'গৃহধর্ম্মার্থে তাহার গৃহিণী আছে—সন্তানার্থে অন্ধ পত্নীতে তাহার আপত্তি নাই।' (পৃ. ১৮) আর এর হাত থেকে বাঁচতে চাঁপার পরামর্শে যার হাতে গিয়ে পড়ল রজনী, সেই হীরালালের চরিত্র কেমন? যুগের হাওয়ায় হীরালাল যে কয়েক দিনের জন্য পত্রিকা-সম্পাদক হয়েছিল, সেই পত্রিকার চরিত্র থেকেই সম্পাদকের চরিত্রের আঁচ মেলে—'কিন্তু অশ্লীলতা দোষে পুলিসে টানাটানি আরম্ভ করিল—ভয়ে হীরালাল কাগজ ফেলিয়া রূপোষ হইল।' (পৃ. ২১) তবে এদের সকলের চেয়ে সেরা বোধ করি 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসের ব্রহ্মঠাকুরাণীর স্বর্গত পতিদেবতা—'তোর ঠাকুরদাদার তেষট্টিটা বিয়ে ছিল—কিন্তু চৌদ্দ বছরই হোক্—আর চুয়াত্তর বছরই হোক্—কই, কেউ ডাক্‌লে তো কখন 'না' বলিত না।' (পৃ. ২৩)

'কামবৃত্তি'র প্রসঙ্গেই 'ধর্মতত্ত্ব'-এ বঙ্কিম লেখেন—'অনেক কামুকী কামাতুর হইয়া সন্তান পরিত্যাগ করিয়া যায়।' (পৃ. ১১৯) ব্যক্তিগত অথবা কর্মক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা থেকেই হয়তো এমন মন্তব্য করতে পেরেছিলেন বঙ্কিম। কামবৃত্তির কাছে নির্জিত হয় অপত্যপ্রীতি—এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন তিনি। তত্ত্বের আগেই অবশ্য তাঁর উপন্যাসে এসেছে উদাহরণ। 'বিষবৃক্ষ'-এ সূর্য্যমুখীর 'পিত্রালয়'-এর দাসী ছিল 'বিধবা কায়স্থকন্যা' শ্রীমতী। শ্রীমতীরই শিশুপুত্র তারাচরণ—'শ্রীমতি বিশেষ রূপবতী ছিল, সুতরাং অচিরাৎ বিপদে পতিত হইল। গ্রামস্থ এক জন দুশ্চরিত্র ধনী ব্যক্তির চক্ষে পড়িয়া সে সূর্য্যমুখীর পিতার গৃহ ত্যাগ করিয়া গেল। কোথায় গেল, তাহা কেহ বিশেষ জানিতে পারিল না। কিন্তু শ্রীমতী আর ফিরিয়া আসিল না।' (পৃ. ১৫) এহো বাহ্য। 'কামবৃত্তি' পরাজিত করতে পারে এমনকী 'অপত্যপ্রীতি'কেও—একথাই এ কাহিনির নিষ্কর্ষ—'শ্রীমতী, তারাচরণকে ফেলিয়া গিয়াছিল।' (পৃ. ১৫)

'কামবৃত্তি'র আরেকটি বৈশিষ্ট্য, তা আত্মানুরাগী। সেই 'আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি'-রই আশ্চর্য উদাহরণ 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসের দুর্লভ আর ফুলমণি। প্রফুল্লর গ্রামেই ফুলমণির বাস। কী তার পরিচয়?—'দেখিতে শুনিতে মন্দ নয়, বেশ-ভূষায় একটু পারিপাট্য রাখিত। একে ইতর জাতির মেয়ে, তাতে বালবিধবা;

চরিত্রটা বড় সে খাঁটি রাখিতে পারে নাই' (পৃ. ২৫)। গ্রামের জমিদারের গোমস্তা দুর্লভ চক্রবর্তীর সে 'অনুগৃহীতা' (পৃ. ২৬)। মাতৃহারা সুন্দরী যুবতী প্রফুল্লকে জমিদারের 'বিহার-মন্দির'-এ (পৃ. ২৬) নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দুর্লভ আর ফুলমণি। পথে ডাকাত পড়ে। 'কামবৃত্তি' আত্মপরায়ণ, আমরা আগেই বলেছি সে কথা। ফলে বিপদের মুখে অনায়াসে ফুলমণিকে ত্যাগ করে পলায়ন করে দুর্লভ—'দুর্লভের এমনই পলাইবার রোখ্ যে, তিনি পশ্চাদ্ধাবিতা প্রণয়িনীর কাছে নিতান্ত দুর্লভ হইলেন।' (পৃ. ৩৩) কামাতুর আত্মানুরাগী এক্ষেত্রে নারীটিকে পরিত্যাগ করল। ঠিক এর উল্‌টো চালের গল্প রয়েছে 'দেবী চৌধুরাণী'তেই। কৃষ্ণগোবিন্দ দাস বৈষ্ণব—'সে স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিত, কিন্তু অনেক বয়সে একটা সুন্দরী বৈষ্ণবীর হাতে পড়িয়া, রসকলি ও খঞ্জনিতে চিত্ত বিক্রীত করিয়া, ভেক লইয়া বৈষ্ণবীর সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবন প্রয়াণ করিল।' (পৃ. ৩১) ফল? কৃষ্ণগোবিন্দের বাসাবদল ঃ

> **এক.** 'শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া কৃষ্ণগোবিন্দের বৈষ্ণবী ঠাকুরাণী, সেখানকার বৈষ্ণবদিগের ... নধর গড়ন দেখিয়া, তৎপাদপদ্মনিকর সেবনপূর্ব্বক পুণ্যসঞ্চয়ে মন দিল।' (পৃ. ৩১) বাধ্যত কৃষ্ণগোবিন্দকে বৈষ্ণবী-সহ বৃন্দাবন থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হতে হল।
>
> **দুই.** 'একজন হাব্‌সী খোজা বৈষ্ণবীকে বেগম করিবার অভিপ্রায়ে তাহার নিকেতনে যাতায়াত করিতে লাগিল। বৈষ্ণবী লোভে পড়িয়া রাজি হইল।' (পৃ. ৩১) ফলে, কৃষ্ণগোবিন্দকে আবার মুর্শিদাবাদ থেকে 'পদ্মাপার' হয়ে বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে বৈষ্ণবী সমেত আশ্রয় নিতে হল।

এখানেই তার শেষ সময় উপস্থিত হল—'বৈষ্ণবী বুড়াকে মুমূর্ষু দেখিয়া তাহার দ্রব্যসামগ্রী যাহা ছিল, তাহা লইয়া পলাইয়াছে।' (পৃ. ২৯) 'ধর্মতত্ত্ব' কারের অমোঘ বাণী ভেসে আসে—'প্রীতিবৃত্তি পরানুরাগিনী। কেবল আত্মানুরাগিনী প্রীতি প্রীতি নহে।' (পৃ. ১১৫)

'ধর্মতত্ত্ব'-এর মতানুসারে অনুশীলনের মাধ্যমে 'কামাদি' শারীরিকী বৃত্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। কিন্তু সকলের সেই অনুশীলনের সাধ্য কই? আমরা ইতঃপূর্বেই লক্ষ করেছি, কৌটিল্য তাঁর 'অর্থশাস্ত্র'-এ যৌন ব্যভিচারের শাস্তি প্রায়শই ধার্য করেছেন মৃত্যু ঃ

> 'কেউ সমবর্ণা নাবালিকা কন্যাকে ধর্ষণ করলে তার হস্তচ্ছেদ বা ৪০০ পণ দণ্ড এবং ধর্ষণজনিত রক্তপাতে বালিকাটি মারা গেলে বধদণ্ড দেওয়া হবে।... মাসী, পিসি, মামী, গুরুপত্নী, পুত্রবধূ, কন্যা ও বোনের উপর ব্যভিচার করলে তার লিঙ্গ ও অণ্ডকোষ ছেদন বা মৃত্যুদণ্ডও দেওয়া যেতে পারে।'[২]

লক্ষ করলে দেখা যাবে বঙ্কিমের এই জাতীয় অসংযতকাম চরিত্রদেরও অন্তিম পরিণতি প্রায়শই মৃত্যু। প্রথমেই মনে পড়ছে 'দুর্গেশনন্দিনী'-র কতলু খাঁর কথা—'একান্ত আত্মসুখরত, ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অভিলাষী।'

(পৃ. ১১৯) তাঁর কামুকত্বের দাহিকাশক্তি কত নারীর সর্বনাশ করেছে, তারও ইঙ্গিত করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র—'ঐ যে দেখিতেছ, সুন্দরী সীমন্তপার্শ্বে হীরকতারা ধারণ করিয়াছে, দেখিয়াছ উহার কি সুন্দর ললাট! প্রশান্ত, প্রশস্ত, পরিষ্কার; এ ললাটে কি বিধাতা বিলাসগৃহ লিখিয়াছিলেন?' (পৃ. ১২০) নিরন্তর ইন্দ্রিয়সেবক এই মানুষটির মৃত্যু তার ঐ কামুকত্বের ছিদ্রপথেই এসেছে। কতলু খাঁরই প্রতিরূপ 'মৃণালিনী' উপন্যাসের ব্যোমকেশ। তার দুশ্চরিত্রতার প্রমাণ মিলবে কথায় ও কাজে। প্রথমে কথা। তার পিতার আশ্রিতা মৃণালিনীকে সে বেশ্যা হওয়ার ইঙ্গিত করেছে—'যদি একের মনোরঞ্জন করিয়াছ, তবে অপরের পার না?' (পৃ. ২৪) এবার কাজ। বঙ্কিমচন্দ্রের শালীন বর্ণনার নিহিতার্থে ব্যোমকেশ ধর্ষক মাত্র—'সে মৃণালিনীর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়াছিল, এবং স্বাভিলাষ পূরণের অন্য কোন সম্ভাবনা নাই জানিয়া বলপ্রকাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল।' (পৃ. ২৪) সঙ্গতভাবেই হাকিম বঙ্কিমচন্দ্র একেও মৃত্যুদণ্ডই দিয়েছেন। আর তকি খাঁ? যে নবাবপত্নী দলনীকে বলেছিল—'শুন সুন্দরী—আমাকে ভজ' (পৃ. ১০৯)। তাকে দলনী 'পদাঘাত' (পৃ. ১০৯)-এ সম্মানিত করেছিল; আর নবাব স্বয়ং দিয়েছিলেন চরম শাস্তি—'নবাব সেই সময়ে স্বীয় কটিবন্ধ হইতে অসি নিষ্কোষিত করিয়া, তকির বক্ষে স্বহস্তে বিদ্ধ করিলেন। তকি মরিল।'(পৃ. ১২৭)

লক্ষ করা যেতেই পারে যে অসংখ্য নারী-পুরুষের যৌন-ব্যভিচারের কথা বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার ভাঁজে-ভাঁজে লুকিয়ে থাকলেও, প্রায়শই তিনি অজাচারীয় সম্পর্কের কথা আনেন না। এইক্ষেত্রে ব্যতিক্রম 'রাজসিংহ'। বঙ্কিম মোগল অন্তঃপুরের অতিরেকী যৌনতার ইঙ্গিত দিয়ে লেখেন শাহজাহান-দুহিতা 'জাহানারা'-র কথা—'ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্য অসংখ্য লোক তাঁহার অনুগৃহীত পাত্র ছিল। সেই সকল লোকের মধ্যে ইউরোপীয় পর্য্যটকেরা এমন ব্যক্তির নাম করেন যে, তাহা লিখিয়া লেখনী কলুষিত করিতে পারিলাম না।' (পৃ. ৪৩) বহুপাঠী বঙ্কিমের কি নজরে এসেছিল Francois Barnier-এর 'Travels in the Mogul Empire' (A.D. 1656-1668) বইটি? কারণ এই 'ইউরোপীয় পর্য্যটকের' রচনাতেই হদিশ মিলছে বঙ্কিমচন্দ্রের সেই 'লেখনী কলুষিত' না করতে চাওয়া ঘটনার ঃ

> 'সাজাহানের জ্যেষ্ঠা কন্যা বেগমসাহেবা অসাধারণ সুন্দরী ও গুণবতী ছিলেন। সম্রাট তাঁকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন। তাঁদের এই প্রীতির সম্পর্ক নিয়ে রাজদরবারে ওমরাহমহলে নানারকমের কানাঘুষা গুজব পর্যন্ত রটেছিল। শেষ পর্যন্ত সম্রাট নিজে মোল্লাদের ডেকে ব্যাপারটা বিচার করে একটা ফয়সালা করতে বলেছিলেন। মোল্লারা নাকি বলেছিলেন, কন্যার সঙ্গে সম্রাটের এই সম্পর্ক রাখার অধিকার ন্যায়সঙ্গত, কারণ যে-বৃক্ষ তিনি নিজে রোপন করেছেন, তার ফল আস্বাদনের অধিকারও তাঁর আছে। মোল্লাদের এই কথার অর্থই বাইরে বিকৃত হয়ে রটেছিল।'[৩]

বঙ্কিম-উপন্যাসের এই অজস্র কামাতুর নরনারীর ভিড় থেকে বিশেষভাবে আমরা লক্ষ করব দুইজনকে। দেবেন্দ্র আর হীরা। কারণ এদের 'কামবৃত্তি'-র নিয়ন্ত্রণহীনতা শুধুমাত্র তাদেরই ক্ষতি করেনি, সেই সঙ্গে মূল উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার জীবনেও আঘাত হেনেছে।

দেবীপুরের জমিদার দেবেন্দ্র দত্ত আদ্যন্ত কামাতুর। 'স্ত্রীজাতি আমাদিগের শুভাশুভের মূল' (পৃ. ১৫৩)—'প্রাচীনা এবং নবীনা' প্রবন্ধে একথা বলেছিলেন স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র। দেবেন্দ্রের জীবনে তার স্ত্রী অশুভের মূল। তার লাম্পট্যের পশ্চাতে রয়েছে 'দম্পতিপ্রণয়াকাঙ্ক্ষা' (পৃ. ২৭)-র ব্যর্থ ইতিহাস। 'বয়োগুণে' দেবেন্দ্রের যে 'রূপতৃষ্ণা' (পৃ. ২৭) জন্মেছিল, তা 'কুরূপা, মুখরা, অপ্রিয়বাদিনী, আত্মপরায়ণা' (পৃ. ২৭) স্ত্রী হৈমবতীর কারণেই হয়ে উঠল বিপথগামী। বয়স্য তারাচরণের স্ত্রী কুন্দনন্দিনীর 'নবযৌবনসঞ্চারের অপূর্ব শোভা' (পৃ. ২০) তাকে মুগ্ধ করল। কুন্দপ্রাপ্তির আশায় রূপ-লুব্ধ দেবেন্দ্র ছদ্মবেশে দত্তগৃহে যাতায়াত আরম্ভ করল। দত্তবাড়ির যুবতী পরিচারিকা হীরা। হীরা সুন্দরী—'উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী, পদ্মপলাশলোচনা।' (পৃ. ৪৪) সে 'বাল্যবিধবা' হওয়া সত্ত্বেও 'সধবা'র মতো 'কেশবিন্যাস' করে, ব্যবহার করে সধবার প্রসাধনীও। 'ছেলেদের বিবাহের আবদার করিতে শিখাইয়া দেয়' (পৃ. ৪৪) হীরা। এ তারই মনোগত সুপ্ত-ইচ্ছার তির্যক প্রতিফলন মাত্র।

দেবেন্দ্রের সঙ্গে আলাপে জন্ম নেয় দেবেন্দ্র-রূপমুগ্ধ হীরা-পতঙ্গ। হীরার মাধ্যমে কুন্দকে হস্তগত করতে চায় দেবেন্দ্র; আর হীরা যাচ্ঞা করে স্বয়ং দেবেন্দ্রের প্রণয়। চিত্তসংযমের শক্তি হীরার ছিল, কিন্তু দেবেন্দ্রের কপট প্রীতির অভিনয়ের সামনে ভেঙে যায় সেই বাঁধ। অসংযত হয়ে পড়ে হীরা। তারপর যেদিন কুন্দকে পেল না দেবেন্দ্র, সেদিন হীরার চরম সর্বনাশ করে গেল সে—'দেবেন্দ্রের প্রেম বন্যার জলের মত; যেমন পঙ্কিল, তেমনি ক্ষণিক। তিন দিনে বন্যার জল সরিয়া গেল, হীরাকে কাদায় বসাইয়া রাখিয়া গেল।' (পৃ. ১১২) 'কামবৃত্তি'-গ্রস্ততার অ-পূর্ব বর্ণনা।

'পাত্রবিশেষে, বিষবৃক্ষে রোগশোকাদি নানাবিধ ফল' (পৃ. ৮৪)—লিখেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। 'স্মরজ বৃত্তি'-কে অনুশীলিত না করতে পারা দুই নর-নারী, দেবেন্দ্র আর হীরাও শাস্তিস্বরূপ পেয়েছে 'রোগ' ফল। হীরার অবদমিত 'কামবৃত্তি' আর হীনম্মন্যতাজাত ঈর্ষা, তাকে উন্মাদ করেছে আর দেবেন্দ্র তার ব্যভিচারের ফলস্বরূপ 'কদর্য্যরোগগ্রস্থ' হয়েছেন। 'কামবৃত্তি'-র প্রতি নিষ্করুণ বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

দম্পতিপ্রণয়াকাঙ্ক্ষা ঃ

'ধর্মতত্ত্ব' অনুসরণে আমরা আগেই দেখেছি 'দম্পতিপ্রীতি' বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন ধর্মের অন্যতম সাধ্য বস্তু। ফলে বঙ্কিম-উপন্যাসের জগতে সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে কোনো-না-কোনো দম্পতির আখ্যান। যাদের মধ্যে 'দম্পতিপ্রণয়াকাঙ্ক্ষা'-র উন্মেষ ঘটছে, এমন সব হবু দম্পতিদের সেখানে দেখা মেলাই ভার।

মাত্র দু'বার তেমনটা ঘটেছে। আর দু'বারই 'কামবৃত্তি'কে নির্জিত করে 'দম্পতিপ্রীতি'কে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে এই যুগলেরা।

জগৎসিংহ-তিলোত্তমা

'বিষবৃক্ষ'-এ হরদেব ঘোষাল লিখবেন—'রূপেও প্রণয় জন্মে।' (পৃ. ৯০) রূপজাত সেই প্রণয়েরই আলম্বন বিভাব জগৎসিংহ-তিলোত্তমা। প্রথম দর্শনে জগৎসিংহ আর তিলোত্তমা তাই পারস্পরিক রূপমুগ্ধতায় মূঢ়—'নবীনা রমণী ক্রমে ক্রমে অবগুণ্ঠনের কিয়দংশ অপসৃত করিয়া সহচরীর পশ্চাদ্ভাগ হইতে অনিমেষচক্ষুতে যুবকের প্রতি দৃষ্টি করিতেছিলেন। কথোপকথন মধ্যে অকস্মাৎ পথিকেরও সেই দিকে দৃষ্টিপাত হইল; আর দৃষ্টি ফিরিল না; তাঁহার বোধ হইল, যেন তাদৃশ অলৌকিক রূপরাশি আর কখন দেখিতে পাইবেন না।' (পৃ. ৪) জগৎসিংহকে প্রথম দর্শনের পর নবীনা তিলোত্তমার যে পাঠরুচি, তা-ই অনাবৃত করে দেয় তার নবীন বয়সের প্রেমাকুতিতে পুষ্পকেতুর ইশারা কতখানি ঃ

এক. 'পুস্তকখানি কাদম্বরী। কিয়ৎক্ষণ পড়িয়া বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কাদম্বরী পরিত্যাগ করিলেন।' (পৃ. ১৯) 'কাদম্বরী'-তে 'বিরক্তি' কেন? বাণভট্টের 'কাদম্বরী' দুই প্রণয়ীযুগলের আখ্যান; মহাশ্বেতা-পুণ্ডরীক আর চন্দ্রাপীড়-কাদম্বরী।[৪] মৃত্যুচ্ছিন্ন বিরহ এই কাহিনির পট রচনা করেছে। মিলনাকাঙ্ক্ষায় বিভোর তিলোত্তমার 'নবীন বয়সে' বিরহস্পৃষ্ট আখ্যানে অরুচি স্বাভাবিক।

দুই. 'বাসবদত্তাও ভাল লাগিল না।' (পৃ. ১৯) সুবন্ধুকৃত 'বাসবদত্তা'র আখ্যানে নায়ক কন্দর্পকেতু আর নায়িকা বাসবদত্তার প্রণয় ঋষিশাপের দ্বারা সাময়িকভাবে খণ্ডিত।[৫] পুনর্মিলনের আশ্বাস সত্ত্বেও নায়ক-নায়িকার স্বল্পকালীন বিচ্ছেদও তিলোত্তমার পক্ষে অসহনীয়।

তিন. 'তাহা ত্যাগ করিয়া গীতগোবিন্দ পড়িতে লাগিলেন; ... পড়িতে পড়িতে সলজ্জ ঈষৎ হাসি হাসিয়া পুস্তক নিক্ষেপ করিলেন।' (পৃ. ১৯) তিলোত্তমার 'সলজ্জ' হাসির কারণটি প্রথম সংস্করণে স্পষ্ট ছিল; ছিল পাঠ্য চরণের উল্লেখ—'মুখর মধীরং ত্যজ মঞ্জীরং রিপুমিব কেলিষু লোলম্।' (পৃ. ১৪১) গীতগোবিন্দের পঞ্চম সর্গ 'সাকাঙ্ক্ষপুণ্ডরীকাক্ষ'-এর দ্বাদশ শ্লোকের অর্ধভাগ এটি। অর্থ—'সখি! ঐ তোমার চঞ্চল মুখর নূপুর ত্যাগ করিয়া চল, কারণ উহা বিহারের সময় চাঞ্চল্য প্রকাশ পূর্ব্বক শত্রুতা করে।'[৬] এই কামাবেগই এবার অনুশীলনের পথে এগিয়ে যাবে 'দম্পতিপ্রণয়াকাঙ্ক্ষা'য়।

পড়ার পরে লেখা। কী লিখলেন তিলোত্তমা? 'বাসবদত্তা', 'মহাশ্বেতা', 'গীতগোবিন্দ' আর 'সেঁজুতির শিব।' এই 'সেঁজুতির শিব'-ই তিলোত্তমার 'দম্পতিপ্রণয়াকাঙ্ক্ষা'-র চিহ্ন। কীভাবে? 'সেঁজুতির শিব'-এর কাছে নারীদের কামনা কী, তা ধরা পড়ে সেঁজুতি ব্রতের মন্ত্রে। একখানি মন্ত্র দেখা থাক ঃ

'কোঁড়ার মাথায় ঢালি মউ,
আমি যেন হই রাজার বউ।
কোঁড়ার মাথায় ঢালি পানি,
আমি যেন হই রাজার রানি।'[৭] (নিম্নরেখাঙ্কন আমাদের)

তিলোত্তমার অবচেতন মনের গতিমুখ স্পষ্ট। এক পক্ষকালের মধ্যে তার 'রূপজ মোহ' পরিণত হচ্ছে 'দম্পতিপ্রীতি'-তে। জগৎসিংহের মনোজগতের খবর কী? সেঁজুতির শিবকে সাক্ষী মেনেছে তিলোত্তমা, আর শৈলেশ্বর মহাদেবের সামনে শপথ নিয়েছেন জগৎসিংহ—'তিলোত্তমা ব্যতীত অন্য কাহাকেও ভালবাসিব না।' (পৃ. ৪৫)

কিন্তু গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজের থেকে যখন জগৎসিংহ শুনলেন কতলু খাঁর 'বিহার মন্দিরে' তিলোত্তমা 'উপপত্নী' হয়েছেন, তখনই তার 'হৃদয়মধ্যে অগ্নি' জ্বলে উঠল (পৃ. ৯৬)। 'কামবৃত্তি' যথার্থভাবে অনুশীলিত হয়ে 'দম্পতিপ্রীতি'তে পরিণতি পায়নি বলেই তা 'অনন্যব্রত' হয়ে উঠতে পারেনি। একদা বিমলাকেই বলেছিলেন জগৎসিংহ—'লোকে আমার হৃদয় পাষাণ বলিয়া থাকে, পাষাণে যে মূর্ত্তি অঙ্কিত হয়, পাষাণ নষ্ট না হইলে তাহা আর মিলায় না।' (পৃ. ৪৪) সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পাষাণে 'অঙ্কিত' মূর্তি রূপান্তরিত হয়েছে 'হৃদয়-মন্দিরাধিষ্ঠাত্রী দেবীমূর্ত্তি'-তে (পৃ. ৯৭)। তিলোত্তমা জগৎসিংহের 'হৃদয়েশ্বরী' (পৃ. ৯৭)। দাম্পত্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। জীবনের মর্মমূলে বাসা বেঁধেছে জগৎসিংহের ভালবাসা—'সে প্রতিমা জগৎসিংহের হৃদয়মধ্যে বদ্ধমূল হইয়াছিল, তাহাকে উন্মূলিত করিতে মূলাধার হৃদয়ও বিদীর্ণ হইবে।' (পৃ. ৯৭) সেই 'প্রতিমা'র রক্ষার্থে 'প্রণয়ে আত্মবিসর্জ্জন'-এও উন্মুখ জগৎসিংহ—'তোমার সখীর রক্ষার্থ প্রাণত্যাগ করিব।' (পৃ. ৬১) 'কামবৃত্তি'-কে নির্জিত করে 'দম্পতিপ্রীতি'-তে স্থিতিকামী এই আখ্যানের মূল সুর তাই ধরা থাকে আয়েষাকে বলা জগৎসিংহের এই বাক্যে—'এ জীবন ত্যাগ করিতে ব্যতীত আর ধারণ করিতে ইচ্ছা করে না।' (পৃ. ১১৫) 'হৃদয়েশ্বরী' যেখানে অন্যকরলগ্না, 'হৃদয়মন্দিরাধিষ্ঠাত্রী দেবীমূর্ত্তি' যেখানে অপহৃতা, সেখানে শূন্য দেহ-মন্দিরের ধ্বংস যাচ্ঞা, 'দম্পতিপ্রীতি'-রই অম্লান স্বাক্ষর। তাই শেষে বিচ্ছেদ-বিরহের অগ্নিতে স্নাত-শুদ্ধ হয়েই জগৎসিংহ স্থিতি পেলেন দাম্পত্যে। 'বিষবৃক্ষ'-এ হরদেব ঘোষালের জবানিতে বঙ্কিমচন্দ্রের ঘোষণা—'অন্তঃকরণের পক্ষে দুঃখভোগই প্রধান শিক্ষা।' (পৃ. ৮৩) 'কান্তাবিরহ' জগৎসিংহকে 'চিত্তসংযমের' শিক্ষা দিয়ে গেল, যা তাকে এরপর করে তুলবে 'অনন্যব্রত'। উপন্যাসের সমাপ্তি ঘোষণা হবে জগৎসিংহ-তিলোত্তমার বিবাহের 'ফুল ফুটিল' (পৃ. ১৩৬) এই আনন্দ-সংবাদেই।

রজনী-শচীন্দ্র

'রূপ-বহ্নি' বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত উপন্যাসেই মূল সমস্যা। 'রজনী' সেই আশ্চর্য উপন্যাস যেখানে একপক্ষে 'রূপ' দেখার ক্ষমতা থাকলেও, অন্যপক্ষে রূপের ভাঁড়ার শূন্য। কারণ, নায়িকা রজনী 'জন্মান্ধ' (পৃ. ৯)। সে জানে, বলেও—'যদি আমার রূপসুখের পথ বন্ধ থাকে, তবে শব্দ স্পর্শ গন্ধ কেন রূপসুখের ন্যায় মনোমধ্যে সর্ব্বময় না হইবে?' (পৃ. ১৬) তা-ই ঘটে। রূপ তার জীবনে নেই তো কী হয়েছে, আছে শব্দ।—'তুমি রূপ দেখিয়া সুখী, আমি শব্দ শুনিয়াই সুখী।' (পৃ. ৯) প্রথমে এই 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল' তার প্রণয়াস্পদের বাণী। লবঙ্গলতার কাছ ফুল বেচতে গিয়ে রজনী শুনল শচীন্দ্রের কণ্ঠস্বর—'বড় পুত্রের কণ্ঠ একদিন শুনিয়াছিলাম—সে এমন অমৃতময় নহে—এমন করিয়া কর্ণবিবর ভরিয়া, সুখ ঢালিয়া দেয় নাই। বুঝিলাম, এ ছোট বাবু।' (পৃ. ১৩) শুধু 'শব্দ' নয় 'স্পর্শ'-ও অন্ধ রজনীর অনুরাগের অবলম্বন—'ফুলের স্পর্শ বড় সুন্দর' (পৃ. ৯)। শব্দের পর সেই স্পর্শে 'মরল' রজনী! ডাক্তার শচীন্দ্র জন্মান্ধ রজনীর চক্ষু-পরীক্ষার্থে তার চিবুক স্পর্শ করলেন—'সেই চিবুক স্পর্শে আমি মরিলাম! সেই স্পর্শ পুষ্পময়!' (পৃ. ১৩) এই শব্দ আর স্পর্শের পথ ধরেই পূর্ণ যুবতী অতৃপ্ত রজনীর মনে জেগে উঠল রূপ-বুভুক্ষা—'বল মা, তোমার হৃদয়ের সারভূত, পুরুষজাতি দেখিতে কেমন?... আমার হৃদয়ের মধ্যে চক্ষু ফুটাইয়া দে, আমি একবার অন্তরের ভিতর অন্তর লুকাইয়া, মনের সাধে রূপ দেখে, নারীজন্ম সার্থক করি।' (পৃ. ১৪) নিঃশব্দ পদপাতে রজনীর 'নারীজন্ম সার্থক' করে এল 'প্রেম'—'রূপে হোক, শব্দে হোক, স্পর্শে হোক, শূন্য রমণীহৃদয়ে সুপুরুষসংস্পর্শ হইলে কেন প্রেম না জন্মিবে?' (পৃ. ১৬) এই 'প্রেম' আসলে 'দম্পতিপ্রণয়াকাঙ্ক্ষা'। তাই শচীন্দ্র 'হাত' ধরে রজনীকে সিঁড়ি চড়তে সাহায্য করলে তৎক্ষণাৎ রজনী মনে মনে ভেবে ফেলে—'কি করিলে প্রাণেশ্বর! না বুঝিয়া কি করিলে! তুমি আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছ। এখন তুমি আমায় গ্রহণ কর না কর—তুমি আমার স্বামী—আমি তোমার পত্নী—ইহজন্মে অন্ধ ফুলওয়ালীর আর কেহ স্বামী হইবে না।' (পৃ. ২০) ফলে, লবঙ্গলতা রজনীর অন্যত্র বিবাহ স্থির করলেও, সে-বিবাহে অ-রাজি রজনী গৃহত্যাগিনী হয়।

কিন্তু, 'দম্পতিপ্রীতি'-তো অন্যোন্য হওয়ার কথা। শচীন্দ্রের মনের খবর কী? বিপত্নীক শচীন্দ্র—'আর বিবাহ করেন নাই।' (পৃ. ১৫) এক বৎসর পর প্রথম তাঁর চোখে পড়ল—'রজনী পরমা সুন্দরী' (পৃ. ৪৪)। মুগ্ধও হল সে—'কানা হউক, এমন লোক নাই, যে তাহার রূপে মুগ্ধ হইবে না।' (পৃ. ৪৪) কিন্তু, শচীন্দ্র রূপ-মুগ্ধ হলেও, রূপবহ্নি-বিবিক্ষু নয়; সে 'পতঙ্গবৃত্ত' পুরুষ নয়। মনে মনে রজনীকে সে সত্যই ভালবাসে, তাই হীরালালের সঙ্গে রজনীর গৃহত্যাগের সংবাদে—'কেহ বলিল, সে ভ্রষ্টা। আমি বিশ্বাস করিলাম না। আমি তাহাকে অনেকবার দেখিয়াছিলাম—শপথ করিতে পারি, সে কখন ভ্রষ্টা হইতে পারে

না।' (পৃ. ৪৩) 'দম্পতিপ্রীতি'-র প্রাণভোমরা যে বিশ্বাস, রজনীর প্রতি শচীন্দ্রের মনে তা-ই জন্ম নিয়েছে। ফলে তাঁর 'আঁতের কথা' তির্যকভাবে প্রকাশ পেয়েছে তাঁরই মুখে—'আর বলিতে কি, যাহাকে স্বয়ং বিবাহ করিতে না পারি, তাহার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করে।' (পৃ. ৪৪)

কেন 'বিবাহ করিতে' পারেন না শচীন্দ্র? এই বিবাহে বাধা দু'টি। একটি সামাজিক, দ্বিতীয়টি শারীরিক। দু'টিরই অবশ্য উপন্যাসের মধ্যে ক্রমে ক্রমে সমাধান ঘটেছে ঃ

সামাজিক সমস্যা ও সমাধান	'রজনী পুষ্পবিক্রেতার কন্যা' (পৃ. ৪৬)	অমরনাথের উদ্যোগে মোকদ্দমার সূত্র ধরে প্রমাণিত হল—'রজনীত সৎকায়স্থের মেয়ে' (পৃ. ৫৩)
শারীরিক সমস্যা ও সমাধান	'রজনী সুন্দরী হইলেও অন্ধ' (পৃ. ৪৬)	সন্ন্যাসী—'ঔষধ দিয়া... এক মাসে রজনীর চক্ষের দৃষ্টি সৃজন করিলেন।' (পৃ. ৮৩)

সামাজিক-শারীরিক বাধার আড়ালে সদাজাগ্রত ছিল শচীন্দ্রের 'দম্পতিপ্রণয়াকাঙ্ক্ষা'। বিশেষ করে যখন জানা গেল সম্পত্তি রজনীর, তখন লবঙ্গলতার বিশেষ পীড়াপীড়িতেই শচীন্দ্রের রজনীকে বিবাহের সুপ্ত-ইচ্ছা, দমিত হয়ে এক প্রবল সামাজিক অনিচ্ছার রূপ ধারণ করল—'টাকার জন্য রজনীকে বিবাহ করা বড় অন্যায়।' (পৃ. ৫৪) কিন্তু, শচীন্দ্রের স্বপ্নদর্শনই বুঝিয়ে দেয়, তার 'হৃদয়মন্দিরে' (পৃ. ৭২) রজনীর চির-অধিষ্ঠান। ফলে শচীন্দ্রের যে মনোবিকার দেখা দেয়, তার ব্যাখ্যায় মনোরোগ-বিশেষজ্ঞ সন্ন্যাসী বলেন—'এই রোগের এক গতি এই যে, হৃদয়স্থ লুক্কায়িত এবং অপরিচিত ভাব বা প্রবৃত্তি সকল প্রকাশিত হইয়া পড়ে, এবং অত্যন্ত বলবান্ হইয়া উঠে। ... স্বাভাবিক নিয়ম এই যে, যে আমাদিগকে ভালবাসে বুঝিতে পারি, আমরা তাহার প্রতি অনুরক্ত হই। অতএব সেই রাত্রে শচীন্দ্রের মনে রজনীর প্রতি অনুরাগের বীজ গোপনে সমারোপিত হইল। কিন্তু রজনী অন্ধ, এবং ইতর লোকের কন্যা, ইত্যাদি কারণে সে অনুরাগ পরিস্ফুট হইতে পারে নাই। ... শচীন্দ্র অধ্যয়নে মন দিলেন। সেই বিদ্যালোচনার আধিক্য হেতু, চিত্ত উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিল। তাহাতেই এই মানসিক রোগের সৃষ্টি।' (পৃ. ৭৪) সে-রোগেও সদা-উচ্চারিত 'রজনী'-রই নাম। কে না জানে 'দম্পতিপ্রীতি'তে স্ত্রী-ই 'রোগে...বৈদ্য'? অবশেষে তাই রজনী-প্রাপ্তিতেই শচীন্দ্রের রোগের উপশম ঘটে।

রজনীর শচীন্দ্র-প্রাপ্তিও অবশ্য খুব সহজে ঘটেনি। কারণ, তাদের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছিল অমরনাথ। ফুলওয়ালী থেকে সম্পত্তির অধিকারিণী হয়ে-ওঠা, রজনীর জীবনে এই অভাবনীয় উত্তরণ ঘটেছে

অমরনাথের দৌলতে। অমরনাথের প্রতি তাই রজনীর 'ভক্তি'র অন্ত নেই। কিন্তু, ভক্তি আর ভালবাসা যে এক নয়, সে কথা তো 'ধর্মতত্ত্ব'-এর গুরু বলেইছেন। ফলে রজনীও অমরনাথকে বলে—'আপনি যদি চিরকাল দস্যুবৃত্তি করিয়া থাকেন—আপনি যদি সহস্র ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, স্ত্রীহত্যা করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও আপনি আমার কাছে দেবতা। আপনি আমাকে চরণে স্থান দিলেই আমি আপনার দাসী হইব। কিন্তু আমি আপনার যোগ্য নহি।... আমার এই পাপ মন পরের কাছে বিক্রীত।' (পৃ. ৭৭-৭৮) 'ভক্তি'-কে প্রত্যাখ্যান করে 'প্রীতি'-কে বরণ করে নিল রজনী। আর শচীন্দ্র-রজনীর এই 'দম্পতিপ্রীতি' আদর্শস্থানীয় বলেই, সেই 'ভক্তি' আর কৃতজ্ঞতার চিহ্ন রয়ে গেল সন্তানের 'অমরপ্রসাদ' নামকরণে।

'অনুশীলন' ও পুরুষ ঃ

না-পড়া কানে-শোনা অভ্যাসে যারা বঙ্কিমচন্দ্রকে নারীবিদ্বেষী বলে অভিযুক্ত করেন, তাদের জন্য বঙ্কিমের অভিনব উত্তর 'প্রাচীনা এবং নবীনা।' সেই প্রবন্ধ থেকেই সামান্য অংশ উদ্ধার করা যাক—'সর্বত্র স্ত্রীজাতির সতীত্বের জন্য এত পীড়াপীড়ি; পুরুষের সেই ধর্ম্মের অভাব, কোথাও তত বড় গুরুতর দোষ বলিয়া গণনীয় নহে। বাস্তবিক নীতিশাস্ত্রের স্বাভাবিক মূল ধরিতে গেলে এমত কোন বিষয়ই পাওয়া যায় না, যদ্দারা স্ত্রীকৃত ব্যভিচার পুরুষকৃত পরদারগ্রহণ অপেক্ষা গুরুতর দোষ বিবেচনা করা যায়।... পুরুষের সুখের পক্ষে স্ত্রীর সতীত্ব আবশ্যক। স্ত্রীজাতির সুখের পক্ষেও পুরুষের ইন্দ্রিয়সংযম আবশ্যক, কিন্তু পুরুষই সমাজ, স্ত্রীলোক কেহ নহে। অতএব স্ত্রীর পাতিব্রত্যচ্যুতি গুরুতর পাপ বলিয়া সমাজে বিহিত হইল; পুরুষের পক্ষে নৈতিক বন্ধন শিথিল রহিল।' (পৃ. ১৫৩-৫৪) বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতেও আমরা বারবার তার এই মানসিকতার ছাপই খুঁজে পাব। দেখবো 'অনুশীলন'-এর অভাবে প্রায়শই পুরুষ অসংযমী। তুলনায় নারী স্বভাবত অনুশীলিত। আর যেহেতু স্ত্রী, স্বামীর 'শুভের' 'মূল', তাই আরো লক্ষ করবো আমরা, যে স্ত্রীরাই বারবার সংশোধন করে দেবে স্বামীর 'ভ্রমপ্রমাদ'। ঠিক, বাস্তব জীবনে রাজলক্ষ্মী দেবীর মতোই। কখনো অবশ্য পুরুষ নিজেই 'অনুশীলন' এর রাস্তায় হেঁটে শুধরে নেবে নিজের জীবন। অনুশীলিত হতে-চাওয়া অথবা হতে-পারা তেমনই পুরুষ-পঞ্চক নগেন্দ্র, গোবিন্দলাল, উপেন্দ্র, চন্দ্রশেখর এবং নবকুমার।

<u>নগেন্দ্র</u>

তাদের 'দম্পতিপ্রীতি'র সাক্ষ্য যে শয়নমন্দির, তার দেওয়ালে নগেন্দ্র-সূর্য্যমুখী মিলেই ছবি আঁকিয়েছিলেন —'সূর্য্যমুখী নগেন্দ্র উভয়ে মিলিত হইয়া চিত্রের বিষয় মনোনীত করিয়া এক দেশী চিত্রকরের দ্বারা চিত্রিত

করাইয়াছিলেন।' (পৃ. ১২১) চিত্রের বিষয়গুলি তাদের 'দম্পতিপ্রীতি'-রই স্মারকঃ

শ্রীরাম-জানকী	লঙ্কা থেকে পুষ্পকরথে চড়ে প্রত্যাবর্তনকালে রামচন্দ্র সীতাকে 'তমালতালীবনরাজিনীলা' (পৃ. ১২১) সমুদ্রবেলা দর্শন করাচ্ছেন। দীর্ঘ বিচ্ছেদান্তে স্বামী-স্ত্রীর মিলন।
অর্জুন-সুভদ্রা	অর্জুন সুভদ্রাকে হরণ করছেন। সুভদ্রা স্বয়ং সারথি। রথের রশ্মি তারই করলগ্না। স্বামীর জীবন-রথের রশিও কি নয়?
দুষ্মন্ত-শকুন্তলা	দুষ্মন্তকে প্রথম দেখার অভিজ্ঞতায় শকুন্তলার ভাবব্যঞ্জনা। এঁদেরই সন্তান ভাবী ভারত-সম্রাট।
অভিমন্যু-উত্তরা	যুদ্ধযাত্রারত অভিমন্যুকে বিদায়দানে অস্বীকৃতা উত্তরা। স্বামীর অনিষ্ট আশঙ্কায় উদ্বেগাকুল স্ত্রী।
সত্যভামার তুলাব্রত	তুলাযন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ। সত্যভামা নিজের অলঙ্কার দিয়েও কৃষ্ণের ভার অপনোদনে অক্ষম। এই চিত্রের ভাষ্যরচনা করেছেন স্বয়ং সূর্য্যমুখী—'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। স্বামীর সঙ্গে, সোনা রূপার তুলা?' (পৃ. ১২৩)

এহেন আপাত-নিশ্ছিদ্র দাম্পত্যের মধ্যেও কি কোথাও কোন ছিদ্র রয়ে গিয়েছিল? তা না হলে স্বামী-স্ত্রী 'উভয়ে মিলিত হইয়া' যেসব চিত্র নির্বাচন করেছেন, তারমধ্যে এ'রকম দুটি অভাবিত চিত্র স্থান পাবে কেন?

চিত্র	তাৎপর্য
হরধ্যানভঙ্গের মুহূর্তে পার্বতী সম্মুখে অবস্থানরত। পশ্চাতে কন্দর্প 'পুষ্পধনুতে পুষ্পশর সংযোজিত' (পৃ.১২১) করে অপেক্ষারত। 'কুমারসম্ভবম্' থেকে গৃহীত।	'ধর্মতত্ত্ব'-এর গুরু 'দম্পতিপ্রীতি'-তে আঘাত হানা 'কামবৃত্তি'র উদাহরণ বোঝাতে শিষ্যকে ঠিক এই ছবিটির কথাই বলেন।
'সাগরিকাবেশে' রত্নাবলী 'উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ' (পৃ.১২২) করতে উদ্যত। শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী' থেকে দৃশ্যটি নির্বাচিত।	রাজা উদয়নের প্রথমা পত্নী বাসবদত্তার দ্বারা ভৎর্ষিত হয়েই রত্নাবলী আত্মহননে উদ্যত। এই গল্পে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্যে 'মধ্যবর্তিনী'র প্রবেশের কথাই ব্যক্ত।

স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্যে হানা দিচ্ছে 'কামবৃত্তি' বা 'রূপমোহ'—এমন অবাঞ্ছিত বিষয়, শয়নমন্দিরে লম্বমান চিত্রের জন্য নগেন্দ্র-সূর্য্যমুখী 'উভয়ে মিলিত হইয়া' কীভাবে নির্বাচিত করতে পারলেন? তবে কি 'অনন্যব্রত' নয় তাদের 'দম্পতিপ্রীতি'?

দাম্পত্যের এই ছিদ্রপথেই এরপর হানা দেবে পুষ্পকেতুর শর। সপ্তদশবর্ষীয়া উদ্ভিন্নযৌবনা বিধবা কুন্দনন্দিনী দত্তবাড়ির আশ্রিতা হওয়ার পরই 'বিষবৃক্ষ'-এর অঙ্কুরোদ্গম শুরু। 'ধর্মতত্ত্ব'-এর গুরু বলবেন—'অনুরাগ নানা কারণে জন্মিতে পারে; কিন্তু সৌন্দর্যের মোহঘটিত যে অনুরাগ, তাহা মনুষ্যে সর্বাপেক্ষা বলবান্।' (পৃ. ১৩৮) আর সূর্য্যমুখী লক্ষ করবেন, নগেন্দ্র—'যে দিকে কুন্দনন্দিনী থাকে, সাধ্যানুসারে সেদিকে নয়ন ফিরান না।...যদি কুন্দনন্দিনী অন্য স্ত্রীলোকের মত তাঁহার চক্ষে সামান্য হইত, তবে তিনি কেন তাহার প্রতি না চাহিবার জন্য ব্যস্ত হইবেন?' (পৃ.৩১) 'রূপজ মোহ' তথা 'কামবৃত্তি'-র টানেই শুরু হল নগেন্দ্রের অধঃপতন। শেষপর্যন্ত 'কামবৃত্তি' স্থানচ্যুত করল 'দম্পতিপ্রীতি'কে। কুন্দর দত্তগৃহ-ত্যাগের সংবাদকে উপলক্ষ করে সূর্য্যমুখীর কাছে মনের আগল খুলে দিলেন নগেন্দ্র—'তোমাতে আমার আর সুখ নাই...। আমি অন্যাগতপ্রাণ হইয়াছি—সে কথা তোমাকে স্পষ্ট বলিব' (পৃ.৬৬)। 'সুখ'-এর জন্য 'স্মরজ বৃত্তি' গ্রস্ত নগেন্দ্র যেন-তেন-প্রকারেণ অধিকার করতে চায় কুন্দকে। লক্ষ করা যাক শ্রীশচন্দ্রকে লেখা পত্রে নগেন্দ্রের তর্কপ্রণালী ঃ

শাস্ত্রীয় আপত্তি

'যদি কেহ বলে যে, বিধবাবিবাহ হিন্দুধর্ম্মবিরুদ্ধ, তাহাকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবন্ধ পড়িতে দিই।' (পৃ.৭৭) কোন্ প্রবন্ধ? নিশ্চয় 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব'-এর কোনো একটি খণ্ড। অন্যকে পড়তে দেওয়ার আগে নগেন্দ্র নিজে ভালো করে প্রবন্ধটি পড়েছেন তো? 'বিধবাবিবাহ' সংক্রান্ত দ্বিতীয় পুস্তকে স্বয়ং বিদ্যাসাগর লিখেছেন—'পতির মৃত্যু হইলে অক্ষতযোনি স্ত্রীর পুনরায় বিবাহ সংস্কার হইতে পারে।'[৮] তিন বছর তারাচরণের গৃহিণী থাকা কুন্দনন্দিনী কি আদপেই 'অক্ষতযোনি' হতে পারেন?

নৈতিক আপত্তি

'...দুই বিবাহ নীতিবিরুদ্ধ কাজ। ...একথা ইংরেজের কাছে শিখিয়াছ....।' (পৃ.৭৭) সহজ সমাধান। নগেন্দ্র ইংরেজের 'যিহুদী বিধি' মানেন না। বেশ। বিদ্যাসাগরের মতো 'শাস্ত্রবিশারদ মহামহোপাধ্যায়'-এর কথা তো মানেন? তবে তাঁর কথাই শুনুন না-হয়, ওই 'বিধবাবিবাহ'

সংক্রান্ত 'দ্বিতীয় পুস্তক' থেকেই—'স্ত্রী অন্য পুরুষে উপগতা হইলে, তাহার পক্ষে যে বিষম পাতক স্মরণ আছে, পুরুষ অন্য নারীতে উপগত হইলে, তাহার পক্ষেও সেই বিষম পাতক স্মরণ আছে।... যে পুরুষ বাল্যাবধি সাধুশীলা পতিব্রতা পত্নীকে অতিক্রম করিবেক, তাহারও ভূতলে এই পাতক হইবেক।'[৯] বলাই বাহুল্য এতদূর পড়ার ধৈর্য্য অথবা প্রয়োজন কোনোটাই বোধ করি নগেন্দ্রের ছিল না।

ফলে 'কামবৃত্তি'র কাছে হার মানল 'দম্পতিপ্রীতি'। কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করলেন নগেন্দ্র। তাদের ফুলশয্যার রাত্রেই গৃহত্যাগিনী হলেন সূর্য্যমুখী। আর সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগের আঘাতে শুরু হল নগেন্দ্রের 'চিত্তসংযমের শিক্ষা'।

সূর্য্যমুখীর সন্ধানে নগেন্দ্রও গৃহত্যাগ করলেন। 'দেশে দেশে' ঘুরে অবশেষে রানীগঞ্জে পৌঁছে পেলেন সূর্য্যমুখীর মৃত্যুসংবাদ। 'এতদিনে সব ফুরাইল' (পৃ.১০৫)। প্রায়শ্চিত্ত নগেন্দ্রকে অনুশীলিত করেছে। 'কুন্দনন্দিনীর ছায়ায়' আবৃত হয়েছিল সূর্য্যমুখীর প্রতি তাঁর যে 'গাঢ় স্নেহ' (পৃ.৮৯) তাকে ফিরে অনুভব করতে পারছেন নগেন্দ্র। হরদেব ঘোষাল বলেছিলেন—'গুণজনিত প্রণয় চিরস্থায়ী বটে—কিন্তু গুণ চিনিতে দিন লাগে।' (পৃ. ৯০) সেই 'দিন' সমাগত। ফলে 'রূপ' নয়, সূর্য্যমুখীর 'গুণ'-ই ভেসে উঠতে থাকে অনুশীলিত নগেন্দ্রের চিত্তপটে—'সূর্য্যমুখী আমার—সব। সম্বন্ধে স্ত্রী, সৌহার্দ্দে ভ্রাতা, যত্নে ভগিনী, আপ্যায়িত করিতে কুটুম্বিনী, স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা, প্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্য্যায় দাসী।' (পৃ. ১০৭) 'উত্তরচরিত'-এর দাম্পত্য-সূক্তই ফিরে এসেছে নবরূপে।

বঙ্কিমচন্দ্র 'প্রচার' পত্রিকায় ১২৯২ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যায় লেখেন অনুশীলনের সারসত্য—'চিত্তশুদ্ধি'। লেখেন—'চিত্তশুদ্ধির স্থূল লক্ষণ ঈশ্বরে ভক্তি, মনুষ্যে প্রীতি এবং হৃদয়ে শান্তি।' (পৃ. ১৭৪) 'চিত্তশুদ্ধির' এই ত্রয়ী লক্ষণের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া যাক অনুশীলিত নগেন্দ্রের আচরণঃ

ঈশ্বরে ভক্তি

নগেন্দ্র শ্রীশচন্দ্রকে বলেন—'তুমি স্বর্গ মান না—আমি মানি।' (পৃ.১০৮) শ্রীশচন্দ্র বুঝলেন যে—'এ স্বর্গ প্রেম ও বাসনার সৃষ্টি।' (পৃ.১০৮) নগেন্দ্রের 'ঈশ্বরে ভক্তি'-ই তাঁর সীমাস্বর্গের ঈশ্বরী করে তুলেছে সূর্য্যমুখীকে—'নগেন্দ্র মুদ্রিত নয়নে স্বর্গারূঢ়া সূর্য্যমুখীর রূপ ধ্যান করিতেছিলেন।' (পৃ.১১০)

মনুষ্যে প্রীতি

অসহায়া সূর্য্যমুখী পথশ্রমে, ক্লান্তিতে হতচৈতন্য হয়েছিলেন জেনে নগেন্দ্রের সিদ্ধান্ত—'যেখানে যেখানে অনাথা স্ত্রীলোক দেখিব, সেইখানে প্রাণ দিয়া তাহার উপকার করিব।' (পৃ.১০৭)

হৃদয়ে শান্তি

গৃহ-প্রত্যাগত নগেন্দ্রের বর্ণনা—'যেমন নদী, প্রথম জলোচ্ছ্বাসকালে অত্যন্ত বেগবতী, কিন্তু জোয়ার পূরিলে গভীর জল শান্তভাব ধারণ করে, তেমনি নগেন্দ্রের সম্পূর্ণ-শোক-প্রবাহ এক্ষণে গম্ভীর শান্তিরূপে পরিণত হইয়াছিল।' (পৃ.১২০)

অবশেষে শয়নমন্দিরে দাম্পত্যের পূর্বস্মৃতিচারণে রত হলেন নগেন্দ্র। 'ছায়া স্ত্রীরূপিণী' হয়ে দেখা দিলেন সূর্য্যমুখী। মৃত্যু-প্রত্যাগত 'সাধ্বী প্রণয়শালিনী' স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হলেন 'দুঃখভোগের' শিক্ষায় অনুশীলিত নগেন্দ্র। 'কামবৃত্তি'-কে 'বিসর্জন' দিয়ে 'প্রতিষ্ঠা' পেল 'দম্পতিপ্রীতি'।

তবু শতকরা একশোভাগ অনুশীলিত হতে পারলেন কি নগেন্দ্র? বৈদিক মন্ত্রেই যে কুন্দকে জীবনসঙ্গিনী করে নিয়েছিলেন গৃহপ্রত্যাগমনের পর তার প্রতি নিছক 'মনুষ্যে প্রীতি'-র আচরণটুকুও কি করতে পারতেন না তিনি? কুন্দের আত্মহননের সিদ্ধান্তকে কি তরান্বিত করেনি নগেন্দ্রের নিষ্ঠুর শীতলতা? 'অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমপ্রজ্ঞা'-র বলেই অনুশীলনের যান্ত্রিকতাকেও লঙ্ঘন করে যান বঙ্কিমচন্দ্র।

গোবিন্দলাল

হরিদ্রাগ্রামের জমিদার কৃষ্ণকান্ত রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র বাবু গোবিন্দলাল রায়। 'মূর্তিমান্ স্কন্দবীরের' (পৃ.৩০) মতো দেখতে গোবিন্দলালের স্ত্রী 'ক্ষুদ্রশরীরা' (পৃ.২১) ভ্রমর; গাত্রবর্ণ 'উজ্জ্বল শ্যাম' (পৃ.২৪)। ভ্রমরের তরফে অনন্যব্রত, অনন্যগতি এই দাম্পত্য—'আট বৎসরের সময়ে আমার বিবাহ হইয়াছে—আমি সতের বৎসরে পড়িয়াছি। আমি এ নয় বৎসর আর কিছু জানি না, কেবল তোমাকে জানি।' (পৃ.৫৩) 'দম্পতিপ্রীতি'র সার-শব্দ যে 'বিশ্বাস' তা-ই বেঁধে রেখেছিল ভ্রমর-গোবিন্দলালকে—'গোবিন্দলালের বিশ্বাসেই ভ্রমরের বিশ্বাস। গোবিন্দলাল তাহা বুঝিয়াছিলেন। ভ্রমরকে চিনিতেন। তাই সে কালো এত ভালোবাসিতেন।' (পৃ.২৩) কিন্তু, গোবিন্দলালের সেই 'কালো'কে ভালোবাসার মধ্যে কি কোনো অস্বস্তি ছিল না? ছিল না কি রূপের অতৃপ্তিজনিত কোনো লোভ? ছিল যে, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ গোবিন্দলালের বারুণী পুষ্করিণীর পার্শ্ববর্তী উদ্যানে স্থিত 'জলনিষেকরতা পাষাণসুন্দরীর' (পৃ.৩৫) মূর্তিটি—'বারুণীর কূলে, উদ্যানমধ্যে, এক উচ্চ প্রস্তরবেদিকা ছিল, বেদিকামধ্যে একটি শ্বেতপ্রস্তরখোদিত স্ত্রী প্রতি-মূর্ত্তি—স্ত্রীমূর্ত্তি অর্দ্ধাবৃতা, বিনতলোচনা—একটি ঘট হইতে আপন চরণদ্বয়ে যেন জল ঢালিতেছে,.....সেইখানে গোবিন্দলাল

বসিতে ভাল বাসিতেন।.....ভ্রমর পাষাণময়ী স্ত্রীমূর্ত্তি অর্দ্ধাবৃতা দেখিয়া তাহাকে কালামুখী বলিয়া গালি দিত—' (পৃ.৩৪)। ভ্রমরের যে রূপের অভাব, গোবিন্দলালের মনের অতলে বাসা বেঁধেছিল, এই 'শ্বেতপ্রস্তরখোদিত' মূর্তি কি তারই বিকল্প নয়? স্মরণীয়, প্রথমবার যখন রোহিণীকে বারুণী তীরে দেখবেন গোবিন্দলাল, তখনই তাঁর মনে হবে— 'ভাস্করকীর্তিকল্প মূর্ত্তি' (পৃ.১৫)। আর এই 'রূপজ মোহ'-এর পথেই গোবিন্দলালের দাম্পত্যে প্রবেশ করবে রোহিণী—'এ কালো! রোহিণী কত সুন্দরী! এর গুণ আছে, তার রূপ আছে। এত কাল গুণের সেবা করিয়াছি, এখন কিছু দিন রূপের সেবা করিব।' (পৃ.৫৩)

গোবিন্দলাল কিয়ৎপরিমাণে অনুশীলিত। তাই রোহিণীকে প্রথমবার বারুণীর কূলে বসে কাঁদতে দেখে 'পরদুঃখকাতর' (পৃ.২৪) গোবিন্দলাল ভাবে—'এ স্ত্রীলোক সচ্চরিত্রা হউক, দুশ্চরিত্রা হউক, এও সেই জগৎপিতার প্রেরিত সংসারপতঙ্গ—আমিও সেই তাঁহার প্রেরিত সংসারপতঙ্গ; অতএব এও আমার ভগিনী। যদি ইহার দুঃখ নিবারণ করিতে পারি—তবে কেন করিব না?' (পৃ.১৫) এইজন্যই রোহিণীর প্রতি তার রূপমোহ ধাবিত হলে, বুঝতে পেরে গোবিন্দলাল 'আত্মজয়' (পৃ.৩৮) করার চেষ্টা করেন—'মনে মনে শপথ করিয়া, স্থির করিলেন, মরিতে হয় মরিব, কিন্তু তথাপি ভ্রমরের কাছে অবিশ্বাসী বা কৃতঘ্ন হইব না।' (পৃ.৩৯) কিন্তু ইন্দ্রিয়সংযম তো অপরের জন্য নয়, নিজের জন্য, তা বুঝতে পারেননি বাবু গোবিন্দলাল রায়। তাই মাত্র দুটি আঘাতেই তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল তাঁর শপথ ঃ

প্রথম আঘাত ঃ ভ্রমরের চিঠি

রোহিণীর রটনা ভ্রমরকে উত্তেজিত করিয়ে চিঠিতে লিখিয়ে নিল—'যতদিন তুমি ভক্তির যোগ্য, ততদিন আমারও ভক্তি; যত দিন তুমি বিশ্বাসী, ততদিন আমারও বিশ্বাস। এখন তোমার উপর আমার ভক্তি নাই, বিশ্বাসও নাই।' (পৃ.৪৫)

দ্বিতীয় আঘাত ঃ কৃষ্ণকান্তের উইল

'ভ্রমর গোবিন্দলাল অভিন্নসম্পত্তি জানিয়া গোবিন্দলালের চরিত্রদোষসম্ভাবনা দেখিয়া, কৃষ্ণকান্ত রায় গোবিন্দলালের শাসন জন্য ভ্রমরকে বিষয় দিয়া গিয়াছিলেন।' (পৃ.৫৬)

'ভ্রমরের অবিশ্বাস' (পৃ.৪৭) আর 'স্ত্রীর মাসোহারা খাইব না কি?' (পৃ.৫৫) এই অভিমান, যুগপৎ গোবিন্দলালকে 'রূপজ মোহ'-এর 'পিছল' (পৃ.৪৮) পথে ঠেলে দিল— 'গোবিন্দলালের অধঃপতন বড় দ্রুত হইল।—কেননা, রূপতৃষ্ণা অনেক দিন হইতে তাঁহার হৃদয় শুষ্ক করিয়া তুলিয়াছে।' (পৃ.৪৮)

'ধর্মতত্ত্ব'-এ গুরু শিষ্যকে বোঝান—'যাহাদিগকে যাবজ্জীবন ইন্দ্রিয়পরায়ণ দেখি, তাহাদিগের ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তি চেষ্টা বড় প্রবল বটে, কিন্তু তেমন পরিতৃপ্তি ঘটে নাই।... অনুশীলনের দোষে, হৃদয়ে আগুন জ্বলিয়াছে,—দাহ নিবারণের জন্য তারা জল খুঁজিয়া বেড়ায়; জানে না যে, অগ্নিদগ্ধের ঔষধ জল নয়।' (পৃ. ৬৪) ফলে 'যশোর' জেলার 'প্রসাদপুর' (পৃ. ৬৪)-এ 'নিঃশঙ্কে পাপাচরণ করিবার' (পৃ. ৬৭) জন্য যে নীলকুঠিতে আশ্রয় নিয়েছিল গোবিন্দলাল-রোহিণী, সেখানেই অচিরে আয়ু শেষ হয়ে আসল তাদের 'কামবৃত্তি'র।

'ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি'র পথে যে শ্রান্তি নেমে আসে, গোবিন্দলাল-রোহিণীর জীবনে এসেছে তাই-ই। তাই 'একটু তাকাতাকি, আঁচাআঁচি'-র (পৃ. ৭৩) 'রূপ-বহ্নি'তে নতুন করে ঝাঁপ দিল রোহিণী-পতঙ্গ; আর শ্রান্ত বাবু গোবিন্দলাল রায় 'ভরাই থাকিত' (পৃ. ৭৬) যে পিস্তল, তাই দিয়ে রোহিণী-হত্যা সম্পন্ন করে হাঁপ ছাড়লেন। আর রোহিণীকে হত্যার অব্যবহিত পূর্বে তিনি স্বীকার করলেন, 'কামবৃত্তি'র চর্চায় ক্লান্তপ্রাণ তিনি ফিরে পেতে ইচ্ছুক তাঁর হারিয়ে ফেলা 'দম্পতিপ্রীতি'—'তুমি কি রোহিণী, যে তোমার জন্য ভ্রমর, জগতে অতুল, চিন্তায় সুখ, সুখে অতৃপ্তি, দুঃখে অমৃত, যে ভ্রমর—তাহা পরিত্যাগ করিলাম?' (পৃ. ৭৬) লক্ষণীয়, গোবিন্দলালের মুখে ফিরে এসেছে 'উত্তরচরিত'-এর ভাষা; শুরু হয়েছে তার 'চিত্তশুদ্ধি।' এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার, গোবিন্দলালের মন থেকে 'দম্পতিপ্রীতি' কখনোই মুছে যায়নি। শুধুমাত্র 'কামবৃত্তি' এসে তাকে আচ্ছাদিত করেছিল। তাই বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্ট ভাষায় জানান—'রোহিণীর রূপে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন—যৌবনের অতৃপ্ত রূপতৃষ্ণা শ্রান্ত করিতে পারেন নাই। ভ্রমরকে ত্যাগ করিয়া রোহিণীকে গ্রহণ করিলেন। রোহিণীকে গ্রহণ করিয়াই জানিয়াছিলেন যে, এ রোহিণী, ভ্রমর নহে—এ রূপতৃষ্ণা, এ স্নেহ নহে — এ ভোগ, এ সুখ নহে—... যখন প্রসাদপুরে গোবিন্দলাল রোহিণীর সঙ্গীতস্রোতে ভাসমান, তখনই ভ্রমর তাঁহার চিত্তে প্রবলপ্রতাপযুক্ত অধীশ্বরী—ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে। তখন ভ্রমর অপ্রাপনীয়া, রোহিণী অত্যাজ্যা,—তবু ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে।' (পৃ. ৮৭) ফলে 'জ্যোতির্ম্ময়ী ভ্রমরমূর্ত্তি'র (পৃ. ৯০) থেকেই আদিষ্ট হলেন গোবিন্দলাল 'চিত্তশুদ্ধি'র। ভ্রমরের মৃত্যুর 'বার বৎসর পরে' (পৃ. ৯১) 'অজ্ঞাতবাস' (পৃ. ৯১) সম্পন্ন করে হরিদ্রাগ্রামে দেখা দিলেন শুদ্ধচিত্ত 'সন্ন্যাসী' (পৃ. ৯১) গোবিন্দলাল। অবশ্য 'সন্ন্যাসী' বলা উচিৎ নয়। কেন? কারণ 'অনুশীলন' আর 'সন্ন্যাসে' তো বনিবনা নেই। ফলে শচীকান্তর জিজ্ঞাসার উত্তরেও বাবু গোবিন্দলাল রায় জানালেন, তিনি 'কামাদি' উচ্ছেদ করে সন্ন্যাসী হননি, রিপুর 'অনুশীলন' করেছেন বারো বছরের 'অজ্ঞাতবাসে'—'কেবল অজ্ঞাতবাসের জন্য আমার এ সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ।' (পৃ. ৯২) আসলে তাঁর এই 'অনুশীলন' তাঁর 'চিত্তশুদ্ধি'ই ঘটিয়েছে।

'চিত্তশুদ্ধি' প্রবন্ধে বঙ্কিম লিখেছিলেন—'যিনি সকল শুদ্ধির স্রষ্টা, যিনি শুদ্ধিময়, যাঁহার কৃপায় শুদ্ধি, যাঁহার চিন্তায় শুদ্ধি, যাঁহার অনুকম্পা ব্যতীত শুদ্ধি নাই, তাঁহাতে গাঢ় ভক্তি চিত্তশুদ্ধির প্রধান লক্ষণ। ইন্দ্রিয়সংযম বল, আর পরার্থপরতাই বল, তাঁহার সম্পূর্ণ স্বভাবের চিন্তা এবং তৎপ্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ব্যতীত কখনই লব্ধ হইতে পারে না। এই ভক্তি চিত্তশুদ্ধির মূল এবং ধর্ম্মের মূল।' (পৃ. ১৭৩) আর ভাগনে শচীকান্তকে গোবিন্দলাল বলেন—'ভগবৎ-পাদপদ্মে মনঃস্থাপন ভিন্ন শান্তি পাইবার আর উপায় নাই।' (পৃ. ৯২) এই 'চিত্তশুদ্ধি'-র শেষ পরিণতি কেমন?—'এখন তিনিই আমার সম্পত্তি—তিনিই আমার ভ্রমর—ভ্রমরাধিক ভ্রমর।'(পৃ. ৯২) শুদ্ধচিত্ত জিতেন্দ্রিয় গোবিন্দলাল পুনঃপ্রতিষ্ঠা পেয়েছেন তাঁর 'দম্পতিপ্রীতি'তে। তাই আজ তাঁর কাছে ঈশ্বরেরও উপমান মৃতা স্ত্রীর নামাবলী। মনে পড়বে আমাদের, এই উপন্যাসেই 'দম্পতিপ্রীতি'-র গুণগানে অক্লান্ত বঙ্কিমচন্দ্রের সেই আশ্চর্য বাচনটি—'রমণী ঈশ্বরের কীর্ত্তির চরমোৎকর্ষ, দেবতার ছায়া; পুরুষ দেবতার সৃষ্টিমাত্র। স্ত্রী আলোক; পুরুষ ছায়া।'(পৃ. ৮৮)

উপেন্দ্র

'ইন্দিরা ছোট ছিল—বড় হইয়াছে।' (পৃ.।৶০) কেন বড় হল কুড়ি বছর বাদ, ১৮৭৩-এর 'ইন্দিরা', ১৮৯৩-তে? 'কামবৃত্তি'কে সংযত করে পুরুষকে 'দম্পতিপ্রীতি'-তে স্থিত করার কৃতিত্ব যে অনুশীলিতা স্ত্রীর, তা বোঝানোর জন্য 'ইন্দিরা' বড় হল। 'ইন্দিরা' বড় হল পুরুষের শুভের মূল যে তার সহধর্মিণী তা শেখানোর জন্য। লক্ষ করা যাক ১৮৯৩-এর বর্ধিত সংস্করণে 'ইন্দিরা'র গোড়ায় বঙ্কিমের জুড়ে দেওয়া P.B.Shelly-র 'Invocation' কবিতাটি ঃ

'Thou art love and life! O come!
Make once more my heart thy home!' (পৃ.॥০)

হৃদয়কে কবি 'গৃহ' করতে বলছেন যে গৃহিণীর উদ্দেশ্যে, তিনি 'Spirit of Delight'—স্বয়ং মূর্তিমতী প্রেম। লক্ষণীয়, এ'কবিতায় এক পুরুষের বাচনে, তার জীবনে সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি বয়ে আনার জন্য এক প্রেমময়ী নারীকে আহ্বান জানানো হচ্ছে। 'ইন্দিরা' উপন্যাসের গৌরচন্দ্রিকা এই কবিতা।

মধ্যবয়সে পৌঁছে ইন্দিরা তাঁর আত্মজীবনী রচনা করতে বসেছে। বঙ্কিম একদা শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে বলেছিলেন যে, তাঁর জীবনকথা লিখতে হলে নাকি তাঁর স্ত্রীর জীবনকাহিনিও লিখতে হবে। বড় 'ইন্দিরা' সেই পুরুষের জীবনের 'ভ্রম-প্রমাদ' শুধরে দেওয়া স্ত্রীর আত্মজীবনী। বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ পর্বের উপন্যাসে নারীমাত্রেই, বিশেষত গৃহিণী-মাত্রেই অনুশীলিতা। ইন্দিরাও তার ব্যতিক্রম নয়। 'ধর্মতত্ত্ব'-এর মাপে একটু মিলিয়ে নেওয়া যাক ঃ

শারীরিকী বৃত্তি	‘সৌভাগ্যক্রমে একখানা কাঠ সেখানে পড়িয়াছিল। তাহা তুলিয়া লইয়া ঘুরাইয়া সেই পাপিষ্ঠের মাথায় মারিলাম। কোথায় জোর পাইলাম জানি না, সে ব্যক্তি মাথায় হাত দিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পলাইল।’ (পৃ. ৮)
জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি	ইন্দিরা বই পড়তে ভালবাসে। তাঁর ‘আত্মজীবনী’র প্রথম সংস্করণেই সদ্য-প্রকাশিত দীনবন্ধু মিত্রের ‘জামাই বারিক’ (পৃ. ৮২) পড়ার খবর আছে। বইটি ১৮৭২-এর ২০ মার্চ প্রকাশিত হয়েছিল।
কার্য্যকারিণী বৃত্তি	রন্ধনে ইন্দিরা সাক্ষাৎ দ্রৌপদী! এমনকী রামরাম দত্তের ‘গৃহিণী’-ও তাকে শংসাপত্র দিয়েছেন—‘রাঁধ ভাল ত গা!’ (পৃ. ২৪)
চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি	গঙ্গার ঘাট দেখে ইন্দিরার ‘প্রাচীন গীত’ মনে পড়েছে—‘এক কাঁকে কুম্ভ করি, /কলসীতে জল ভরি,/জলের ভিতরে শ্যামরায়!’ (পৃ. ১১)

ইন্দিরা অনুশীলিতা। অনুশীলিতা বলেই সে ‘কামাদি’ শারীরিকী বৃত্তিকে সংযত করতে শিখেছে। তারই প্রমাণ ‘সেকালে যেমন ছিল’ পরিচ্ছেদটি। এটি বিবাহ-পরবর্তী মেয়ে-মজলিশের চিত্র। ইন্দিরার ভাষায়—‘এই সকল মজলিস্‌গুলায় অনেক নির্ল্লজ্জ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে জানিতাম।’ (পৃ. ৬৭) শুধু তাই নয়—‘ইহার সঙ্গে অশ্লীলতা, নির্ল্লজ্জতা, কদাচিৎ বা দুর্নীতি, আসিয়া মিশিত।’ (পৃ.৭১) এই পরিবেশে বড় হয়েও ইন্দিরা আত্ম-অনুশীলিতা ‘নবীনা’।

উনিশ বছর বয়সে পতিগৃহে যাত্রা করল ইন্দিরা। পথে কালাদীঘির ডাকাতি ইন্দিরার ‘ভরা যৌবনে স্বামিসন্দর্শনে’ (পৃ. ৩)-র সুখস্বপ্ন ভঙ্গ করল। ‘দম্পতিপ্রীতি’ তার মজ্জাগত বলেই দস্যুহস্তে ‘নিষ্কুণ্ডলা’ হয়েও—‘কেবল হাতের বালা খুলিয়া দিই নাই—তাহারা কাড়িয়া লইল।’ (পৃ. ৫) সর্বাগ্রে এর বিকল্প খুঁজে নিল ইন্দিরা—‘বাঁ হাতে এক টুকরা লোহা আছে—কিন্তু দাহিন হাতে কিছু নাই। কাঁদিতে কাঁদিতে একটু লতা ছিঁড়িয়া দাহিন হাতে বাঁধিলাম।’ (পৃ. ৭) ‘কার্য্যকারিণী বৃত্তি’ এবং ‘শারীরিকী বৃত্তি’ তার অনুশীলিত। তারই উপর ভর করে কলকাতা পৌঁছল ইন্দিরা। ঠাঁই পেল রামরাম দত্তের বাড়িতে ‘পাচিকা’ হিসেবে। উপরন্তু সখী-লাভ ঘটল—‘সুভাষিণী’। সখীর কাছে ‘কালাদীঘির ডাকাতি’ (পৃ. ২৭)-র গল্প চাপা রইল না। সুভাষিণী তাঁর স্বামী রমণবাবুর সহায়তায় উপেন্দ্রকে বাড়িতে আনালেন।

বিবাহের পর দ্বিতীয়বার স্বামিমুখদর্শন করল ইন্দিরা। পরিচয় জানবার আগে ‘অন্যমনস্ক’ (পৃ. ৬৪) ইন্দিরার মনে হল ‘ইঁহাকে পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছি।’ (পৃ-৩৫) আশ্চর্য ইন্দিরার চিত্তসংযমের প্রবৃত্তি ও শক্তি—‘আমি সধবা হইয়াও জন্মবিধবা। বিবাহের সময় একবার মাত্র স্বামিসন্দর্শন হইয়াছিল—সুতরাং

যৌবনের প্রবৃত্তি সকল অপরিতৃপ্ত ছিল। এমন গভীর জলে ক্ষেপনীনিক্ষেপে বুঝি তরঙ্গ উঠিল ভাবিয়া বড় অপ্রস্তুত হইলাম। মনে মনে নারীজন্মে সহস্র ধিক্কার দিলাম; মনে মনে আপনাকে সহস্র ধিক্কার দিলাম; মনের ভিতর মরিয়া গেলাম।' (পৃ. ৩৫)

স্বামীকে চিনতে পেরে 'কার্য্যকারিণী বৃত্তি' প্রবল হয়ে উঠল ইন্দিরার। যা তার, তা সে আদায় করেই ছাড়বে। কিন্তু, উপেন্দ্র তো ইন্দিরাকে চেনে না! ফলে, প্রথমে স্বামীর মন জানবার পালা। সুভাষিণীর ভাষায় 'অভিসারিকে' (পৃ. ৩৯) হল সে। চিঠি লিখে উপেন্দ্রকে 'মনঃপ্রাণ সমর্পণ' (পৃ. ৪১) করার কথা জানাল 'পাচিকা' (পৃ. ৪১) ইন্দিরা। উপেন্দ্র অভিসারে রাজিও হল। 'আহ্লাদিত' (পৃ. ৪৩) হলেও মনে মনে 'একটি দুঃখের কথা উদয়' (পৃ. ৪৩) হয়েছিল ইন্দিরার—'আমি চিনিয়াছি যে, তিনি আমার স্বামী, এই জন্য আমি যাহা করিতেছি, তাহাতে আমার বিবেচনায়, দোষ নাই।... তিনি আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন, এমন কোন লক্ষণও দেখি নাই। অতএব তিনি আমাকে পরস্ত্রী জানিয়া যে আমার প্রণয়াশায় লুব্ধ হইলেন, শুনিয়া মনে মনে বড় নিন্দা করিতেছি।' (পৃ. ৪৩) কিন্তু, শুধু মনে মনে 'নিন্দা' করলে তো হবে না। 'স্ত্রীজাতি', পুরুষের 'শুভাশুভের মূল'। পুরুষের যত 'ভ্রম প্রমাদ' সে তো স্ত্রীকেই শুধরে নিতে হবে। তাই তো 'ধর্মতত্ত্ব' মতে দাম্পত্যে স্ত্রী-ই গুরু। ফলে যখনই ইন্দিরার মনে হল—'পুরুষ মানুষের ইন্দ্রিয় দমন কি এতই শক্ত?' (পৃ. ৪৩), তখনই গুরু প্রস্তুত হলেন মনে মনে, শিষ্যটির 'কামবৃত্তি' অনুশীলিত করে তাকে 'দম্পতিপ্রীতি'-র যোগ্য করে তোলার জন্য—'মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম, যদি কখনও দিন পাই, তবে এ স্বভাব ত্যাগ করাইব।' (পৃ. ৪৩)

প্রথম আলাপেই ইন্দিরা জেনে গেল স্বামীর 'কামবৃত্তি' জায়মান রূপমুগ্ধতার পথে। রূপবহ্নি-বিবিক্ষু পতঙ্গবৃত্ত উপেন্দ্রের সেদিনকার আচরণ মনে করে 'দুঃখ' (পৃ. ৪৮) পেয়েছেন ইন্দিরা—'আমি তোমার রূপ দেখিয়া পাগল হইয়াছি। এমন রূপ আমি কখন দেখি নাই।' (পৃ. ৪৮) রূপমুগ্ধ স্বামীকে 'দম্পতিপ্রীতি'-তে স্থিত করার জন্য তার গৃহে গিয়ে 'অষ্টাহ পরীক্ষা' (পৃ. ৪৯)-র সামনে তাকে দাঁড় করালেন ইন্দিরা। 'রূপ' নয় 'গুণগ্রহণে' যে 'আসঙ্গলিপ্সা' জন্মে স্বামীকে তার আস্বাদ দিতে আরম্ভ করলেন ইন্দিরা—'আমি প্রথম দিনে আদর করিয়া কথা কহিলাম—দ্বিতীয় দিনে অনুরাগ লক্ষণ দেখাইলাম — তৃতীয় দিনে তাঁহার ঘরকরনার কাজ করিতে আরম্ভ করিলাম; যাহাতে তাঁহার আহারের পারিপাট্য, শয়নের পারিপাট্য, স্নানের পারিপাট্য হয়, সর্ব্বাংশে যাহাতে ভাল থাকেন, তাহাই করিতে আরম্ভ করিলাম—স্বহস্তে পাক করিতাম; খড়িকাঠি পর্য্যন্ত স্বয়ং প্রস্তুত করিয়া রাখিতাম। তাঁর এতটুকু অসুখ দেখিলে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া সেবা করিতাম।' (পৃ. ৫০) লক্ষ করে দেখুন, ইন্দিরা 'উত্তরচরিত'-এর মাপেই আদর্শ স্ত্রী—'গৃহে

যে দাসী, ... রোগে যে বৈদ্য, ... আশ্রমে যে আরাম,.... রোগে যে ঔষধ...।' (পৃ. ৪) ইন্দিরার এই 'গুণগ্রহণ'-এর মধ্যে দিয়ে উপেন্দ্রের যে 'আসঙ্গলিপ্সা' জন্ম নিল, তা-ই তাকে 'অনন্যকর্ম্মা' (পৃ.৪২) করে তুলল। আর কী হল? উপেন্দ্রের 'চিত্তের দুর্দ্দমনীয় বেগ'-কে ইন্দিরা 'ইঙ্গিতমাত্রে স্থির' (পৃ. ৫২) করে দেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করল। স্ত্রী হয়ে উঠল পুরুষের ইন্দ্রিয়সংযমের গুরু। ফলে 'পরিবার' (পৃ. ৬৪) কে ফিরে পাওয়া উপেন্দ্রও অনুশীলিতা সহধর্মিণীর সহায়তায় ইন্দ্রিয় জয়ের পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হল—'আমি যদি তাঁর হাসিতে, তাঁর চাহনিতে, তাঁর চুম্বনাকাঙ্ক্ষায়, এতটুকু ইন্দ্রিয়াকাঙ্ক্ষার লক্ষণ দেখিতাম, তবে আমিই জয়ী হইতাম। তাহা নহে। সে হাসি, সে চাহনি, সে অধরোষ্ঠবিস্ফুরণে, কেবল স্নেহ—অপরিমিত ভালবাসা।' (পৃ. ৫২) 'কামবৃত্তি' থেকে 'দম্পতিপ্রীতি'-র স্তরে স্বামীর উত্তরণে স্ত্রী-ই যে 'জীবনের ধ্রুবতারা', ইন্দিরার আত্মজীবনী সেই শিক্ষাই দিতে চায়।

এইসূত্রে একটিমাত্র তথ্য পরিবেশনযোগ্য। রমেশচন্দ্র দত্তের চতুর্থ কন্যা সরলা দত্তের বিয়েতে ১৮৭৮ সালের ৭ই জুন বঙ্কিমচন্দ্র স্বরচিত গ্রন্থাবলী উপহার দেন। তার মধ্যে 'ইন্দিরা'-য় তিনি স্বাক্ষর করে লিখেছিলেন একটি প্রবাদবাক্য—'A virtuous woman is a crown to her husband'.[১০] (দ্রষ্টব্য পরিশিষ্ট : এক) 'ইন্দিরা' প্রসঙ্গে এই প্রবাদের তাৎপর্য ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

চন্দ্রশেখর

'কামাদি' রিপু উচ্ছেদ করতে চাওয়া সন্ন্যাসীদের ধিক্কার জানিয়েছিলেন বঙ্কিম। তাঁর পরিকল্পিত 'দম্পতিপ্রীতি'-র মধ্যে পর্যাপ্ত 'কামবৃত্তি'-র অনুশীলনও একান্ত প্রয়োজনীয়। সচরাচর অননুশীলিত কামাবেগ কীভাবে 'সংসার'কে বিপর্যস্ত করে দেয় তা-ই দেখাতে অভ্যস্ত বঙ্কিমচন্দ্র। কিন্তু মাত্র একবারই তিনি লক্ষ করতে চেয়েছিলেন 'কামবৃত্তি'-র অভাবজনিত সমস্যাকে; উপন্যাসের নাম 'চন্দ্রশেখর'।

বেদগ্রামে 'ব্রাহ্মণ এবং পণ্ডিত' (পৃ. ২৮) চন্দ্রশেখরের গৃহ। 'বত্রিশ বৎসর অতিক্রম' (পৃ.১১) করে নিতান্ত 'বিপদগ্রস্ত' (পৃ.১১) হয়ে চন্দ্রশেখর বিবাহ করেন। কি বিপদ? বৎসরখানেক পূর্বে চন্দ্রশেখরের মা মারা গেছেন। 'দারপরিগ্রহে জ্ঞানোপার্জ্জনের বিঘ্ন ঘটে' (পৃ.১১) ভেবে, যে চন্দ্রশেখর সংসারী হতে চাননি, এখন তিনিই 'দারপরিগ্রহ না করাই জ্ঞানোপার্জ্জনের বিঘ্ন' (পৃ.১২) বুঝে বিবাহে উৎসাহী হলেন। এই বিবাহে জ্ঞানতপস্বী চন্দ্রশেখরের চাহিদা কি? একটু সাজিয়ে নেওয়া যাক বঙ্কিমের 'উত্তরচরিত' অনুসরণে ঃ

উত্তরচরিত	চন্দ্রশেখর
‘গৃহে যে দাসী’ (পৃ.৪)	‘স্বহস্তে পাক করিতে হয়’, সময় ব্যয় হয়, ফলে ‘অধ্যয়ন’ (পৃ. ১২) এর বিঘ্ন ঘটে। চন্দ্রশেখরের গৃহকর্মনিপুণা ‘দাসী’ চাই।
‘আশ্রমে যে আরাম’ (পৃ.৪)	‘দেবতার সেবার সুশৃঙ্খলা’ তথা ‘গৃহধর্ম্মের বিশৃঙ্খলা’ (পৃ ১২) ঠিক করার জন্যও বিবাহ আবশ্যক।
‘অর্জ্জনে যে লক্ষ্মী, ব্যয়ে যে যশঃ’ (পৃ.৪)	‘প্রাপ্ত অর্থ’-এর হদিশ মেলে না। ‘খরচ নাই, অথচ অর্থে কুলায় না।’ (পৃ.১২)

কিন্তু, যে স্ত্রী ‘সংসারসৌন্দর্য্যের প্রতিমা’, তার তো শুধু মন নেই, শরীরও আছে। ফলে ‘শয়নে যে অপ্সরা’ তার কথাও বঙ্কিমচন্দ্রের ‘দম্পতিপ্রীতি’র আবশ্যিক শর্ত ছিল। সঙ্গত, কেননা আদর্শ কল্পিত রাষ্ট্রের প্রজাবৃদ্ধির শর্তই যে ‘দম্পতিপ্রীতি’র অন্তর্গত পর্যাপ্ত ‘কামবৃত্তি’। শরীরের এবং রাষ্ট্রের মান্য যৌন চাহিদাটুকুকেই বলপূর্বক অস্বীকার করতে চেয়েছেন চন্দ্রশেখর—‘সংসার-বন্ধনে মুগ্ধ হওয়া হইবে না।’ (পৃ.১২) বঙ্কিমচন্দ্রের ‘ধর্মতত্ত্ব’-এর মূল কথা ছিল চারটি বৃত্তির অনুশীলন ও ‘সামঞ্জস্য’-এর মাধ্যমে পূর্ণ মনুষ্যত্বে উপনীত হওয়া। এর মধ্যে কোনো একটি ‘বৃত্তি’-ও যদি অনুচিত অনুশীলনে বাকিগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে না পারে তবেই সমস্যা তৈরি হয়। চন্দ্রশেখরের ‘জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি’র অনুচিত অনুশীলনই তাঁর জীবনকাহিনিতে জটিল গ্রন্থি বেঁধেছে। কী পড়েছেন চন্দ্রশেখর? বেদগ্রামের বাড়িতে পাঠে নিরত যে চন্দ্রশেখরকে আমরা দেখি তার পাঠ্য তালিকায় রয়েছে—‘ব্রহ্মসূত্র’ (পৃ.১৯), ‘শাঙ্কর ভাষ্য’ (পৃ.১৯), ‘প্রমা, মায়া, স্ফোট’ (পৃ.১৯) ইত্যাদি। মোদ্দা কথা শঙ্করাচার্যের আদ্যন্ত ভাববাদী বৈদান্তিক জগতের বাসিন্দা চন্দ্রশেখর। সে-জগতে ‘শরীর’ সম্পর্কে ধারণা কেমন? দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের উত্তর ঃ

> ‘অদ্বৈত-সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বিখ্যাত দার্শনিক শঙ্করাচার্য।.... তিনিই অদ্বৈতবাদের সবচেয়ে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছেন।....(তাঁর) ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যই সবচেয়ে বিখ্যাত। এই ভাষ্যর নাম শারীরক-ভাষ্য। ‘শারীরক’ শব্দের অর্থ লক্ষণীয়: ‘‘শরীর শব্দের উপর কুৎসার্থে কণ্ প্রত্যয় করিয়া শারীরক-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। শারীরক শব্দের অর্থ কুৎসিত শরীরবাসী জীবাত্মা’’।’[১১]

বুঝতে অসুবিধা হয় না এই দার্শনিক প্রজ্ঞায় ‘শরীর’ এবং ‘শারীরিকী বৃত্তি’ সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করা হতে পারে। তাই অনায়াসেই সন্ন্যাসী শঙ্করাচার্য ‘কা তে কান্তা’[১২] বলে হাঁক পাড়তেই পারেন।

'ধর্মতত্ত্ব'কার বলেছিলেন—'জ্ঞান স্বাস্থ্যকর এবং জ্ঞান পীড়াদায়ক।' (পৃ.৫১) চন্দ্রশেখরের যৌনজীবনের ক্ষেত্রে শঙ্করাচার্যের দার্শনিক প্রজ্ঞার 'জ্ঞান' যে 'পীড়াদায়ক' হয়েই দেখা দিয়েছে, তা আমরা বুঝতে পারি; বুঝতে পারেন চন্দ্রশেখরও। 'জ্ঞান স্বাস্থ্যকর' বলেই নিদ্রিতা বিংশতিবর্ষীয়া সুন্দরী শৈবলিনীকে দেখে আত্ম-পর্যালোচনায় মগ্ন হন তিনি—'আমার যে বয়স, তাহাতে আমার প্রতি শৈবলিনীর অনুরাগ অসম্ভব—অথবা আমার প্রণয়ে তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষা নিবারণের সম্ভাবনা নাই।... আমি নিতান্ত আত্মসুখপরায়ণ—সেই জন্যই ইহাকে বিবাহ করিতে প্রবৃত্তি হইয়াছিল।' (পৃ.২০) বোঝা যায়, চন্দ্রশেখরের 'কামবৃত্তি' আছে, কিন্তু অননুশীলিত। ফলে শৈবলিনীর মতো 'সুকুমার কুসুম'কে যে তিনি 'অতৃপ্ত যৌবনতাপে' (পৃ.২০) দগ্ধ করছেন, তা বুঝেও চন্দ্রশেখর 'ক্লেশসঞ্চিত পুস্তকরাশি' (পৃ.২০)-র 'পীড়াদায়ক' জ্ঞানভাণ্ডারেই আবদ্ধ রইলেন।

আবদ্ধ রইলেন ততদিন, যতদিন না শৈবলিনীর অন্তর্ধান ঘটল। শৈবলিনী যে সময় বেদগ্রামের বাড়ি থেকে অপহৃত হন, সে সময় চন্দ্রশেখর মুর্শিদাবাদে; দলনী বেগমের ভবিষ্যগণনায় রত। সেই গণনায় চন্দ্রশেখর দলনীর যে ভবিষ্য-সংবাদ জেনেছিলেন, তা অবশ্যই মৃত্যু; তাই 'রাজার অপ্রিয় সংবাদ' (পৃ.২৮) প্রকাশে তিনি নিজেকে অ-পারঙ্গম জানিয়েছিলেন। নবাবপত্নীর মৃত্যু-গণনা ভিতরে ভিতরে অস্থির করে তুলেছিল চন্দ্রশেখরকে। গৃহপ্রত্যাগত 'তত্ত্বজ্ঞ' (পৃ.২৮) চন্দ্রশেখর দূর থেকে বাড়ি দেখা মাত্রই হয়ে উঠলেন 'তত্ত্বজিজ্ঞাসু' (পৃ.২৮)। শৈবলিনীর অন্তর্ধান তথা মৃত্যুচিন্তা তাকে পীড়িত করল। সর্বজ্ঞ কথক জানিয়ে দিলেন 'জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি'র অতি-অনুশীলনকে স্তিমিত করে জেগে উঠছে 'শারীরিকী বৃত্তি'; জেগে উঠছে 'দম্পতিপ্রীতি'—'ঐ গৃহমধ্যে আমার প্রেয়সী ভার্য্যা বাস করেন, এইজন্য আমার এ আহ্লাদ? এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সকলই ব্রহ্ম। যদি তাই, তবে কাহারও প্রতি প্রেমাধিক্য—কাহারও প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে কেন? সকলই ত সেই সচ্চিদানন্দ! আমার যে তল্পী লইয়া আসিতেছে, তাহার প্রতি একবারও ফিরিয়া চাহিতে ইচ্ছা হইতেছে না কেন? আর সেই উৎফুল্লকমলাননার মুখপদ্ম দেখিবার জন্য এত কাতর হইয়াছি কেন? আমি ভগবদ্বাক্যে অশ্রদ্ধা করি না, কিন্তু আমি দারুণ মোহজালে জড়িত হইতেছি। এ মোহজাল কাটিতেও ইচ্ছা করে না—যদি অনন্তকাল বাঁচি, তবে অনন্তকাল এই মোহে আচ্ছন্ন থাকিতে বাসনা করিব।' (পৃ.২৮-২৯) 'দম্পতিপ্রীতি' জাগতেই চন্দ্রশেখরের 'প্রণয়ে আত্মবিসর্জ্জন'-এর আকাঙ্ক্ষাও জাগল। শৈবলিনীর অদর্শন-কল্পনায় তাঁর মনে হল—'আমি বাঁচিব না।' (পৃ.২৯)

বাড়ি ফিরে চন্দ্রশেখর জানলেন শৈবলিনী অপহৃতা। পত্নীবিয়োগের এই 'দুঃখভোগ' থেকেই শুরু হল তাঁর আত্ম-অনুশীলন। যে 'জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি'-র অত্যধিক অনুশীলন, চন্দ্রশেখরের 'দম্পতিপ্রীতি'-তে

আঘাত হেনেছে, সেই অনুশীলনের অতিরিক্ততাকে নিজের জীবন থেকে নিঃশেষে সমাপ্ত করে দিলেন তিনি—'অগ্নি জ্বলিল। পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ ক্রমে ক্রমে সকলই ধরিয়া উঠিল; মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর প্রভৃতি স্মৃতি; ন্যায়, বেদান্ত, সাংখ্য প্রভৃতি দর্শন; কল্পসূত্র, আরণ্যক, উপনিষদ্ একে একে সকলই অগ্নিস্পৃষ্ট হইয়া জ্বলিতে লাগিল। বহুযত্নসংগৃহীত, বহুকাল হইতে অধীত সেই অমূল্য গ্রন্থরাশি ভগ্নাবশেষ হইয়া গেল।' (পৃ.৩০) সব গ্রন্থ ভস্ম হল, শুধু রয়ে গেল 'হৃদয়-গ্রন্থ' (পৃ.৩৯)। সেই 'হৃদয়-গ্রন্থ'-এর অনুশীলনে এরপর রত হবেন চন্দ্রশেখর, শুরু হবে তাঁর 'চিত্তশুদ্ধি'।

শুদ্ধচিত্ত চন্দ্রশেখর গুরু রমানন্দ স্বামীর সহায়তায় খুঁজে পেলেন স্ত্রী শৈবলিনীকে। শৈবলিনী তখন বিকৃতমস্তিষ্ক। তাকে দেখে—'চন্দ্রশেখর রোদন করিলেন।' (পৃ.৯০) শৈবলিনীকে 'কত আদরে' (পৃ.৯০) বেদগ্রামের বাড়িতে ফিরিয়ে আনলেন। গুরু রমানন্দ স্বামীর 'যোগবল' (পৃ.১১৯) দিয়ে শৈবলিনীর চিকিৎসা শুরু করলেন চন্দ্রশেখর। 'নিদ্রাবস্থায়' (পৃ.১১৯) শৈবলিনীকে করা চন্দ্রশেখরের একটিমাত্র প্রশ্ন লক্ষণীয়—'জিজ্ঞাসা করিলেন, ''প্রতাপ কি তোমার জার?'' শৈ। ছি! ছি! চ। তবে কি? শৈ। এক বোঁটায় আমরা দুইটি ফুল, এক বনমধ্যে ফুটিয়াছিলাম—ছিঁড়িয়া পৃথক করিয়াছিলেন কেন?' (পৃ.১২০) লক্ষণীয় এরপর চন্দ্রশেখরের আচরণ—'চন্দ্রশেখর অতি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার অপরিসীম বুদ্ধিতে কিছু লুক্কায়িত রহিল না।' (পৃ.১২০) চন্দ্রশেখরের 'দম্পতিপ্রীতি' আজ পূর্ণরূপে অনুশীলিত বলেই, চন্দ্রশেখর সব বুঝতে পেরেই 'মনে মনে প্রতাপকে অনেক সাধুবাদ করিলেন' (পৃ.১২০) আর অনায়াসে শৈবলিনীকে ফিরিয়ে নিলেন নিজের জীবনে—'শৈ। এ সংসারে আমার স্থান কোথায়? চ। কেন, আমার গৃহে?' (পৃ.১২১) 'লোকরঞ্জনার্থে কোন প্রায়শ্চিত্ত' (পৃ.১২৮) করতে হলে, তাতে রাজি চন্দ্রশেখর। 'প্রতাপকে মনে মনে আত্মসমর্পণ' (পৃ.১২০) করেছিল শৈবলিনী, জেনেও তাকে 'গৃহে' (পৃ.১২৮) পুনঃপ্রতিষ্ঠায় ব্যাকুল চন্দ্রশেখর। 'দম্পতিপ্রীতি'র অন্তর্গত 'কামবৃত্তি'র সযত্ন অনুশীলন আর 'জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি'র অতি-অনুশীলনের অসারতাকে পরিত্যাগ, চন্দ্রশেখরের বৃত্তিনিচয়ের মধ্যে 'সামঞ্জস্য' বিধান করে তাঁকে করে তুলেছে 'মনুষ্যমধ্যে ধন্য' (পৃ.১২৯)।

নবকুমার

'ধর্মতত্ত্ব'-এর গুরু বলবেন—'যে ভাবের বশীভূত হইয়া অন্যের জন্য আমরা আত্মত্যাগে প্রবৃত্ত হই, তাহাই প্রীতি।' (পৃ.১০৪) 'অন্যের জন্য' কাষ্ঠাহরণে প্রবৃত্ত হয় যে নবকুমার, প্রীতিবৃত্তি তাঁর মজ্জাগত। আত্ম-অনুশীলিত সে। প্রমাণ 'ধর্মতত্ত্ব' ঃ

শারীরিকী বৃত্তি	কাপালিকের হাত ছাড়াবার জন্য নবকুমার বলপ্রয়োগ করলেন—'যে বলে তিনি হস্ত আকর্ষিত করিয়াছিলেন, তাহাতে সামান্য লোক তাঁহার হাত ধরিয়া থাকিলে হস্তরক্ষা করা দূরে থাকুক—বেগে ভূপতিত হইত।' (পৃ.২৫)
কার্য্যকারিণী বৃত্তি	'নবকুমার মেদিনীপুরে আসিয়া অধিকারীর প্রদত্ত ধনবলে কপালকুণ্ডলার জন্য একজন দাসী, একজন রক্ষক ও শিবিকাবাহক নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে শিবিকারোহনে পাঠাইলেন।' (পৃ. ৩৬)
জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি	নবকুমার পড়াশুনা ভালই জানেন। কাপালিককে সংস্কৃতে বলেন—'পানীয়ং দেহি মে।' (পৃ.৯০) কাপালিকের সংস্কৃত বুঝতেও পারেন—'মামনুসর'। (পৃ. ১৯)
চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি	কাব্যপাঠে অনুশীলিত নবকুমার। সমুদ্রদর্শনে তাঁর স্মরণে এসেছেন কালিদাস—'দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী/তমালতালীবনরাজিনীলা।/আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে—/র্দ্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা।।' (পৃ.১২)

প্রথমা পত্নীকে অকালে হারিয়ে 'বিরাগবশতঃ' (পৃ. ৩২) আর দারপরিগ্রহ করেননি যে সৌন্দর্যপ্রিয় যুবক নবকুমার, অভূতপূর্ব এক পরিস্থিতিতে তার জীবনে ত্রাণকর্ত্রীর ভূমিকায় এলেন কপালকুণ্ডলা। কেমন, তাকে 'শোনার' নবকুমারের সেই প্রথম মুহূর্ত?—'এই কণ্ঠস্বরের সঙ্গে নবকুমারের হৃদয়বীণা বাজিয়া উঠিল।' (পৃ. ২২) কেন নবকুমারের 'হৃদয়বীণা' বেজে উঠল? উত্তরে বঙ্কিম জানান, তাঁর বিকচমান দম্পতিপ্রণয়াকাঙ্ক্ষার কথা—'বিচিত্র হৃদয়যন্ত্রের তন্ত্রীচয় সময়ে সময়ে এরূপ লয়হীন হইয়া থাকে যে, কত যত্ন করা যায়, কিছুতেই পরস্পর মিলিত হয় না। কিন্তু একটি শব্দে, একটি রমণীকণ্ঠসম্ভূত স্বরে সংশোধিত হইয়া যায়। সকলই লয়বিশিষ্ট হয়। সংসারযাত্রা সেই অবধি সুখময় সঙ্গীতপ্রবাহ বলিয়া বোধ হয়।' (পৃ. ২২) কমলাকান্ত তাঁর 'একা—কে গায় ওই' রচনায় একেই বলবেন 'সংসারসংগীত' (পৃ. ২)। 'দম্পতিপ্রীতি' নবকুমারের মজ্জাগত বলেই কপালকুণ্ডলাকে প্রথম দেখাতেই তাঁর 'হৃদয়বীণা'য় 'সুখময় সঙ্গীতপ্রবাহ' বয়ে গেছে।

'বিষবৃক্ষ'-এ হরদেব ঘোষাল লিখবেন—'প্রথমে বুদ্ধিদ্বারা গুণগ্রহণ, গুণগ্রহণের পর আসঙ্গলিপ্সা; আসঙ্গলিপ্সা সফল হইলে সংসর্গ, সংসর্গফলে প্রণয়, প্রণয়ে আত্মবিসর্জ্জন।' (পৃ. ৯০) অর্থাৎ, 'দম্পতিপ্রীতি'-র প্রথম সোপানে রয়েছে 'গুণগ্রহণ' আর অন্তিমে 'প্রণয়ে আত্মবিসর্জ্জন'। লক্ষ করে দেখুন দু'টিই নবকুমারের ক্ষেত্রে ঘটেছে। প্রথমে গুণগ্রহণ। নবকুমারকে বধার্থী কাপালিকের হাত থেকে রক্ষা করেছেন কপালকুণ্ডলা। সঙ্গতভাবেই রূপমুগ্ধতাকে পেরিয়ে তার 'গুণগ্রহণ' করতে পেরেছেন বলেই, নবকুমার তাকে বিশেষিত করেছেন 'প্রাণরক্ষয়িত্রী' (পৃ. ৩৩) বিশেষণে। আর 'গুণগ্রহণে' তাঁর 'দম্পতিপ্রীতি' ক্রমজায়মান বলেই

এরপর নবকুমারের মধ্যে জেগেছে 'প্রণয়ে আত্মবিসর্জ্জন'-এর ইচ্ছা—'আমার প্রাণদান করিলে যদি কোন প্রত্যুপকার হয়—তবে তাহাতেও প্রস্তুত আছি। আমি এমন সঙ্কল্প করিতেছি যে, আমি সেই নরঘাতকের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া আত্মসমর্পণ করি। তাহা হইলে ইহার রক্ষা হইবে।' (পৃ. ৩২) লক্ষণীয়, বিবাহের পূর্বেই নবকুমারের কপালকুণ্ডলাকে বাঁচানোর আকুল প্রয়াসটি। আর অনিদ্র এক রাত্রির ভাবনাশেষে নবকুমারের উচ্চকণ্ঠ ঘোষণা—'আজি হইতে কপালকুণ্ডলা আমার ধর্মপত্নী। ইহার জন্য সংসার ত্যাগ করিতে হয়, তাহাও করিব।' (পৃ. ৩৪) 'প্রণয়ে আত্মবিসর্জ্জন'-এর আকাঙ্ক্ষা নবকুমারের মধ্যে পূর্বাপর বজায় থেকেছে।

নবকুমারের এই একপাক্ষিক 'দম্পতিপ্রীতি'র পূর্ণ-প্রস্ফুটিত রূপ আমরা দেখব তাদের সপ্তগ্রামের সংসারজীবনেই। কপালকুণ্ডলা নবকুমারের সংসারে 'সাদরে গৃহীতা' হলেন। এরপরই তাঁর 'প্রণয়সিন্ধু উছলিয়া উঠিল।' (পৃ. ৪৫) নবকুমারের সেই একমুখী দাম্পত্যের দীর্ঘ বিশ্লেষণাত্মক বর্ণনা দিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র—'এই প্রেমাবির্ভাব সর্ব্বদা কথায় ব্যক্ত হইত না, কিন্তু নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে দেখিলেই যেরূপ সজললোচনে তাঁহার প্রতি অনিমিষ চাহিয়া থাকিতেন, তাহাতেই প্রকাশ পাইত; যেরূপ নিষ্প্রয়োজনে, প্রয়োজন কল্পনা করিয়া কপালকুণ্ডলার কাছে আসিতেন, তাহাতে প্রকাশ পাইত; যেরূপ বিনাপ্রসঙ্গে কপালকুণ্ডলার প্রসঙ্গ উত্থাপনের চেষ্টা পাইতেন, তাহাতে প্রকাশ পাইত; যেরূপ দিবানিশি কপালকুণ্ডলার সুখস্বচ্ছন্দতার অন্বেষণ করিতেন, তাহাতে প্রকাশ পাইত; সর্ব্বদা অন্যমনস্কতাসূচক পদবিক্ষেপেও প্রকাশ পাইত।' (পৃ. ৪৫) 'গুণগ্রহণ' আগেই ঘটেছে, এখন নবকুমারের মনে জাগছে 'আসঙ্গলিপ্সা', 'সংসর্গ' ইচ্ছা ও 'প্রণয়'। নবকুমারের আচরণ তাকেই প্রকাশ করছে।

এর এক বৎসর পর এই কাহিনির যবনিকা পতন। মাত্র তিনটি রাত্রি, সে নাটকের তিন অঙ্কঃ

প্রথম রাত্রি
মৃন্ময়ী শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে বনে গিয়েছিল। বাড়ির লোক জানতে পেরে তিরস্কার করেছে। সম্ভবতঃ শাশুড়ি। শ্যামা মৃন্ময়ীকে বলেছে—'কিন্তু দাদাকে কেন অসুখী করিবে?' (পৃ. ৭১)
দ্বিতীয় রাত্রি
কপালকুণ্ডলা আবার বনে যেতে উদ্যোগী হয়। নবকুমার জানতে পেরে সঙ্গে যেতে চায়। এক বছরেও যে স্ত্রী 'পরশপাথর' (পৃ. ৪৮)-এর ছোঁয়ায় বদলালো না, তার প্রতি দাম্পত্যপ্রণয়ে সামান্য চিড় ধরেছে কি নবকুমারের? শ্যামাসুন্দরীর ইঙ্গিত স্মরণে ছিল কপালকুণ্ডলার। সে নবকুমারের সেই ক্ষতস্থানকেই সজোরে মর্দিত করল—'আইস, আমি অবিশ্বাসিনী কি না, স্বচক্ষে দেখিয়া যাও।' (পৃ. ৭২)

'ব্রাহ্মণবেশী' (পৃ. ৭৫) লুৎফ-উন্নিসার চিঠি আর কাপালিকের মিথ্যাচার নবকুমারের 'দম্পতিপ্রীতি'-কে কিয়ৎক্ষণের জন্য সন্দেহ-ধূমে আচ্ছন্ন করে দিল। নবকুমারের মনোজগতের সেই বিপর্যাসকে বোঝানোর জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের অবলম্বিত উপমাটি অত্যাশ্চর্য! উপমেয় নবকুমারের হৃদয়; উপমান সতীদাহের চিত্র—'পতিব্রতা, স্বামীর সহগমনকালে, অথবা অন্য কারণে, যখন কেহ জীবিতে চিতারোহন করিয়া চিতায় অগ্নিসংলগ্ন করে, তখন প্রথমে ধূমরাশি আসিয়া চতুর্দ্দিক বেষ্টন করে; দৃষ্টিলোপ করে; ... পরে সশব্দে অগ্নিজ্বালা চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া বেষ্টন করিয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ব্যাপিতে থাকে; ... নবকুমারকে প্রথমে ধূমরাশি বেষ্টন করিল; পরে বহ্নিশিখা হৃদয় তাপিত করিতে লাগিল; শেষে বহ্নিরাশিতে হৃদয় ভস্মীভূত হইতে লাগিল।' (পৃ. ৮০-৮১) নবকুমার আদ্যন্ত 'দম্পতিপ্রীতি'-তে মগ্ন। তাই সে কপালকুণ্ডলাকে হত্যার কথা ভাবে না, আত্মপ্রাণ বিসর্জনের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে—'কপালকুণ্ডলাকে কিছু বলিবেন না, আপনার প্রাণসংহার করিবেন।' (পৃ. ৮১) অচিরেই এই সিদ্ধান্তের অবশ্য পরিবর্তন ঘটল। যে নবকুমার অন্যের প্রাণ রক্ষার্থে একদা 'কাষ্ঠাহরণে' (পৃ. ১৫) বাঘের মুখে যেতে পেরেছিলেন, আজ সেই তিনিই পত্নীর প্রাণবধার্থে কাপালিকের সঙ্গদানে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। তা শুধুমাত্রই 'দম্পতিপ্রীতি'-র বিশ্বাসভঙ্গজনিত ক্রোধে-দুঃখে-হতাশায় আর কতকটা কাপালিকের প্রদত্ত মদ্যের প্রভাবে। মদিরার প্রভাব কেটে যেতেই পুনর্বার উদ্‌ভাসিত 'দম্পতিপ্রীতি'-র আদর্শ নবকুমার; অন্যের শংসাপত্র নয়, তার যাচ্ঞা, মাত্র একবারের জন্য কপালকুণ্ডলার নিজমুখে তার সতীত্বের স্বীকারোক্তি— 'মৃন্ময়ি!—কপালকুণ্ডলে! আমায় রক্ষা কর। এই তোমার পায়ে লুটাইতেছি—একবার বল যে, তুমি অবিশ্বাসিনী নও—একবার বল, আমি তোমায় হৃদয়ে তুলিয়া গৃহে লইয়া যাই।' (পৃ. ৯৩) কপালকুণ্ডলা জানাল, সে 'অবিশ্বাসিনী' নয়। এই স্বীকারোক্তির পরমুহূর্তে প্রকৃতিদেবী নিজের কোলে গ্রহণ করিলেন প্রিয় সন্তানকে। কিন্তু, 'দম্পতিপ্রীতি'ই যার জীবন-পণ, সেই নবকুমার কী করবেন এবার?—'নবকুমার তীরভঙ্গের শব্দ শুনিলেন, কপালকুণ্ডলা অন্তর্হিত হইল দেখিলেন। অমনি তৎপশ্চাৎ লম্ফ দিয়া জলে পড়িলেন। নবকুমার সন্তরণে নিতান্ত অক্ষম ছিলেন না। কিছুক্ষণ সাঁতার দিয়া কপালকুণ্ডলার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে পাইলেন না, তিনিও উঠিলেন না।' (পৃ. ৯৩)

'উত্তরচরিত'-এই বঙ্কিম লিখেছিলেন—'যে ভালবাসে, পত্নীবিসর্জ্জন তাহার পক্ষে কি ভয়ানক দুর্ঘটনা!' (পৃ. ৪) আর 'যে ভালবাসে', কোনও 'ভয়ানক দুর্ঘটনা'-তেই যদি 'পত্নী বিসর্জ্জন' ঘটে তার, তখন কী করবে সে? নবকুমার বঙ্কিম-উপন্যাসের সেই আশ্চর্য প্রণয়মগ্ন 'অনুশীলিত' পুরুষ, যে 'দম্পতিপ্রীতি'-র মর্যাদা রক্ষায় 'প্রণয়ে আত্মবিসর্জ্জন'কেই নিজের জীবনে সত্য করে তুলল।

পরিবার ও প্রীতি ঃ

খুব কাছের মানুষ নবীনচন্দ্র সেন বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে একটি গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন; অবশ্য স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের নিকটেই ঃ

> 'আমি [নবীনচন্দ্র] বলিলাম—'আমি ত বরাবর আপনাকে [বঙ্কিমচন্দ্র] বলিয়াছি, আপনার বিলাতি পিরীতের পিণ্ড পিণ্ডান্ত আর আমার ভাল লাগে না। কেবল একঘেয়ে সেই ইংরাজী 'নভেলে'র পতি পত্নীর ও উপপত্নীর পীরিত! আপনাকে এত করিয়া বলিলাম যে, যে সকল প্রেম লইয়া আমাদের জাতীয় জীবন ও জাতীয় সাহিত্য রামায়ণ ও মহাভারত,—পিতৃপ্রেম, ভ্রাতৃপ্রেম, বাৎসল্য, প্রজাপ্রেম, সর্ব্বশেষ ঈশ্বরপ্রেম,—এই সকল প্রেমের আদর্শ আঁকিয়া আমাদের মনুষ্যত্বের পথে লইয়া যান। আপনি ত তাহা শুনিলেন না।'[১৩]

নবীনচন্দ্রের রচনার সাক্ষ্য থেকে অনুমান করা চলে এই সাক্ষাৎ আনুমানিক ১৮৯২-এর আশেপাশে ঘটেছিল। এর আগেই ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে 'ধর্মতত্ত্ব'। নবীনচন্দ্র নিশ্চয়ই তা মন দিয়ে পড়েননি। পড়লে জানতেন 'ধর্মতত্ত্ব'-মতে—'পরিবারই প্রীতির প্রথম শিক্ষাস্থল।' (পৃ. ১০৪) 'পরিবার'-এর ভিতরে অনুশীলিত হয় 'দম্পতিপ্রীতি' ও 'অপত্যপ্রীতি'। তারপর? —'পারিবারিক অনুশীলনে প্রীতিবৃত্তি কিয়ৎ পরিমাণে স্ফুরিত হইলে পরিবারের বাহিরেও বিস্তার কামনা করে।' (পৃ. ১০৪) তার ফলে তা 'স্বজনপ্রীতি'তে পর্যবসিত হয়। কারা এই 'স্বজন'? বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তর—'যাহারা অপত্যস্থানীয়, ... যাহারা শোণিত-সম্বন্ধে আমাদের সহিত সম্বন্ধ, ... কুটুম্বাদি ও প্রতিবাসিগণ' (পৃ. ১২৩) এবং 'বন্ধু' (পৃ. ১২৩)। আর সবশেষে এই প্রীতিবৃত্তি 'জাগতিক প্রীতি' (পৃ. ১২৩) তে পরিণত হয়। অর্থাৎ নবীন সেন বোঝেননি যে, যাকে 'পতি-পত্নীর' পীরিত বলে মনে করছিলেন তিনি, বঙ্কিম-কল্পনায় সেই 'দম্পতিপ্রীতি'-ই নবীন সেনের বলা—'পিতৃপ্রেম, ভ্রাতৃপ্রেম, বাৎসল্য, প্রজাপ্রেম' ইত্যাদি, এককথায় 'জাগতিক প্রীতি'-র প্রথম সোপান। বঙ্কিম-উপন্যাসে সংখ্যায় অল্প হলেও বিরল নয় সেই সব 'দম্পতিপ্রীতি', সেইসব পরিবার যা 'জাগতিক প্রীতি'-তে কোন না কোনভাবে পৌঁছতে পেরেছে। 'দুর্গেশনন্দিনী', 'বিষবৃক্ষ', 'ইন্দিরা' আর 'দেবী চৌধুরাণী'—এই চারটি উপন্যাসকে আমাদের বক্তব্যের সূত্রে বিচার করা যাক।

<u>বিমলা-বীরেন্দ্রসিংহ</u>

শশিশেখর ভট্টাচার্যের প্রথমা কন্যার স্বামী বীরেন্দ্রসিংহের সঙ্গে, তাঁরই দ্বিতীয়া কন্যা বিমলার সাক্ষাৎ কাশীতে। প্রথম দর্শনেই প্রণয়—'যে অবধি তাঁহাকে দেখিলাম, সেই অবধি আপন চিত্ত পরের হইল।' (পৃ. ৮৫) ঘটনার উত্থান-পতনে পরস্পরের থেকে স্থানিক দূরত্বে অপসারিত হলেন তারা, তবু—'যখন

তিন বৎসরের বিচ্ছেদেও পরস্পর বিস্মৃত হইলাম না, তখন উভয়েই বুঝিলাম যে, এ প্রণয় শৈবালপুষ্পের ন্যায় কেবল উপরে ভাসমান নহে, পদ্মের ন্যায় ভিতরে বদ্ধমূল।' (পৃ. ৮৭) ঘটনা-তরঙ্গের মধ্যে দিয়ে বিবাহ হল তাদের, কিন্তু জনসমক্ষে অপ্রকাশিত রইল সে কথা। বীরেন্দ্রসিংহের অননুশীলন তাকে দিয়ে বিমলার জাত-বিচার করিয়ে নিয়েছে। 'শূদ্রীকন্যা' বলে বিমলাকে ধিক্কার জানিয়েছে বীরেন্দ্রসিংহ। কপটাচারী এই পুরুষটির তরফে ফাঁক রয়ে গেছে 'দম্পতিপ্রীতি'-তে, কিন্তু বিমলা অনুশীলিতা। তাই জগৎসিংহকে লেখা চিঠিতে বিমলা সগর্বে জানান—'যখন লোকে বলিবে—বিমলা কুলটা ছিল, দাসী-বেশে গণিকা ছিল, তখন কহিবেন, বিমলা নীচ-জাতি-সম্ভবা, বিমলা মন্দভাগিনী, বিমলা দুঃশাসিত রসনা দোষে শত অপরাধে অপরাধিনী; কিন্তু বিমলা গণিকা নহে। যিনি এখন স্বর্গে গমন করিয়াছেন, তিনি বিমলার অদৃষ্ট-প্রসাদে যথাশাস্ত্র তাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।' (পৃ. ৮১)

উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের দশম পরিচ্ছেদে বীরেন্দ্রসিংহের সঙ্গে বিমলার কথোপকথন প্রকাশ করে সেই দাম্পত্যের অন্যোন্যনির্ভরতাকেই—'বি।...''তবে শুনুন, আমি এখন অভিসারে গমন করিব।" বী। ''যমের সঙ্গে না কি?" বি। ''কেন, মানুষের সঙ্গে কি হইতে নাই?" বী। ''সে মানুষ আজিও জন্মে নাই।" বি। ''এক জন ছাড়া।" (পৃ. ২৭) সেই 'একজন' মানুষের সঙ্গে বিমলার পুনর্বার সাক্ষাৎ বধ্যভূমিতে। শেষ-সাক্ষাতে বীরেন্দ্রসিংহ 'গদগদ' স্বরে বিমলার নাম ধরে ডাকতেই, তাঁর অন্তিম স্বামী-সম্ভাষণ—'স্বামী! প্রভু! প্রাণেশ্বর'! (পৃ. ৭৬) আয়েষার পূর্বেই উপন্যাসে সমজাতীয় মুক্তকণ্ঠ ঘোষণা বিমলার—'আজ আমি জগৎসমীপে বলিব, কে নিবারণ করিবে? স্বামী! কণ্ঠরত্ন!' (পৃ. ৭৬) স্বামী-সাক্ষাতে তাঁর প্রতিজ্ঞা, সে স্বামী-হত্যার 'প্রতিশোধ' নেবে—'বীরেন্দ্র হৃষ্টচিত্তে কহিলেন, ''তুমি পারিবে, জগদীশ্বর তোমার মনস্কামনা সফল করুন।" (পৃ. ৭৭) 'দম্পতিপ্রীতি'র গুণগানে আত্মনিরত বঙ্কিম 'উত্তরচরিত'-এ লেখেন—'গৃহে যে দাসী... বিপদে যে বন্ধু... কার্য্যে যে মন্ত্রী' (পৃ. ৪)। বিমলা এর সবকটি ভূমিকাতেই চূড়ান্ত সফল। 'বীরেন্দ্রসিংহের বিধবা স্ত্রী'-র হাতেই কতলু খাঁ-র মৃত্যু তার চরম প্রমাণ।

'দম্পতিপ্রীতি'-র সারভূত সুখ 'অপত্যপ্রীতি'তে। 'ধর্মতত্ত্ব'-এর গুরুর ভাষায়—'সুখকারিতায় অপত্যপ্রীতি ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন সকল বৃত্তির অপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ।' (পৃ. ২১৯) 'বিমাতা' রূপে বিমলা যেভাবে আগাগোড়া তিলোত্তমাকে অপত্যস্নেহে আগলে রেখেছে তাই তার দাম্পত্য প্রণয়ের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। 'ধর্মতত্ত্ব' মতে 'অপত্যাদির রক্ষার্থ আপনার প্রাণ বিসর্জ্জন করা ধর্মসঙ্গত।' (পৃ. ১১৭) ওস্মানের দেওয়া 'অঙ্গুরীয়' তিলোত্তমার হাতে তুলে দিয়ে কতলু খাঁর অবরোধ থেকে তার মুক্তির ব্যবস্থা করে দেন বিমলা—'কিন্তু তিনি যে তিলোত্তমার জন্য নিজ মুক্তি পথ রোধ করিলেন, তাহা তিলোত্তমা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।' (পৃ. ১০৭) 'নিজ মুক্তি পথ রোধ' করে তিলোত্তমার জন্য সুখী ভবিষ্য-রচনাই বিমলার 'অপত্যপ্রীতি' তথা 'দম্পতিপ্রীতি'-র পরাকাষ্ঠা।

শ্রীশচন্দ্র-কমলমণি

উনিশ শতকের নবজায়মান মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক' শ্রেণিকে চিহ্নিত করে নরহরি কবিরাজ তাঁর 'বাংলার জাগরণ ও 'ভদ্রলোক'', নামক প্রবন্ধে লেখেন ঃ

> '... ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অনুরক্ত হল আর এক ধরনের লোকেরা, যারা মোটামুটি স্বল্পবিত্ত ও মধ্যবিত্ত ঘরের লোক। এরা 'হিন্দু কলেজে' ছাত্র হিসাবে নাম লেখান। কলেজ থেকে বেরিয়ে এসে তারা জীবিকার জন্যে বিভিন্ন পেশা, যেমন সরকারি চাকরি, ইস্কুল মাস্টারি, ওকালতি প্রভৃতির আশ্রয় নিল। তারা প্রচলিত সামন্ততান্ত্রিক জীবনদর্শনের প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করল এবং পাশ্চাত্য বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক জীবন দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হল।'[১৪]

বলাই বাহুল্য, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র সেদিন এই শ্রেণিরই মানুষ। প্রথম অধ্যায়েই আমরা দেখেছি এঁদের মধ্যেই উনিশ শতকে জেগে উঠছিল নব্য দাম্পত্য-ভাবনা। বঙ্কিম-উপন্যাসের জগতেও নতুন যুগের সেই 'দম্পতিপ্রীতি'-র পূর্ণ আস্বাদন আমরা পাবো 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের শ্রীশচন্দ্র-কমলমণি আর 'ইন্দিরা' উপন্যাসের সুভাষিণী-রমণবাবুর মধ্যেই। প্রথমে 'বিষবৃক্ষ'-এর কথা।

শ্রীশচন্দ্র মিত্র 'প্লণ্ডর ফেয়ারলি' (পৃ. ১১) কোম্পানির মুৎসুদ্ধি। 'হৌস বড় ভারি—শ্রীশচন্দ্র বড় ধনবান্।' (পৃ. ১১) বাড়িতে 'ইংরেজি সংবাদপত্র' (পৃ. ৩৬) পড়েন তিনি; তাঁর স্নানের ঘরে ঢুকেছে 'টব' আর 'স্নিগ্ধ সৌরভযুক্ত সোপ্' (পৃ. ১১)। এহেন মিত্রজার স্ত্রী, নগেন্দ্রের বোন কমলমণি। 'মিস্ টেম্পল্ নাম্নী একজন শিক্ষাদাত্রী' (পৃ. ১১)-র কাছে বিদ্যাশিক্ষাও করেছেন কমলমণি। ফলে রূপে-গুণে শ্রীশচন্দ্র-কমলমণি রাজযোটক।

শ্রীশচন্দ্র-কমলমণির দাম্পত্য 'অনন্যব্রত'। ফলে সূর্য্যমুখী যে চিঠিতে কমলকে লেখে—'আমার মাথার দিব্য, জামাইবাবুকেও এ পত্র দেখাইও না।' (পৃ. ৩২) সেই চিঠিও কমল তার স্বামীকে না দেখিয়ে পারে না—'সূর্য্যমুখী তোমাকে এ সকল কথা বলিতে মানা করিয়াছে—কিন্তু যতক্ষণ তোমাকে সব না বলিতেছি, ততক্ষণ আমার প্রাণ খাবি খেতেছে।' (পৃ. ৩৭) নব্য-রোমান্টিক এই দাম্পত্য 'অত্যাগসহনোঃ'—'তা সত্য সত্যই কি তোমার গোবিন্দপুর যেতে হবে? আমি একা থাকিব কি প্রকারে?' (পৃ. ৩৮) উত্তরে কমলমণি—'তুমি যদি গেলে না, তবে আমি কয় দিন থাকিতে পারিব?' (পৃ. ৩৯) 'উত্তরচরিত'-এ বঙ্কিমচন্দ্র স্ত্রীকে স্বামীর 'মন্ত্রী' বলেছিলেন। 'অনন্যব্রত' দাম্পত্যে শ্রীশচন্দ্রই কমলের 'মন্ত্রিবর' (পৃ. ৭৫)।

'ধর্মতত্ত্ব'কারের মতে 'দম্পতিপ্রীতি'-র মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে 'কামবৃত্তি' থাকা আবশ্যক। লক্ষ করা যাক কমলমণি-শ্রীশচন্দ্রের প্রাত্যহিক নিভৃতযাপন —'রাগে শ্রীশচন্দ্র দ্রুতগতি ধাবমান হইয়া কমলমণির মুখ চুম্বন করিলেন। রাগে কমলমণিও অধীরা হইয়া শ্রীশচন্দ্রের মুখচুম্বন করিল।' (পৃ. ৩৭) আর এই

পর্যাপ্ত 'কামবৃত্তি'র অনুশীলনের ফলই হল এক বৎসর বয়স্ক পুত্রসন্তান সতীশচন্দ্র। শ্রীশচন্দ্র কমলমণির এই 'কামবৃত্তি' অনুশীলিত বলেই তা কখনো তাদের দাম্পত্যে আঘাত হানতে পারে না। তাই যে সপ্তদশবর্ষীয়া উদ্ভিন্নযৌবনা বিধবাকে সূর্য্যমুখী নিজের সংসার থেকে বিদায় করতে চায়, তাকেই অনায়াসে বরণ করে নেয় কমলমণি—'যদি আমি তোমায় ভালবাসি—আর তুমি আমায় ভালবাস, তবে কেন আমার সঙ্গে চল না?' (পৃ. ৪১) বহিরাগত 'কামবৃত্তি'র প্রকোপ থেকে সুরক্ষিত অনুশীলিত এই দাম্পত্যে তাই স্বামী-স্ত্রী উভয়ের ঠাট্টার মধ্যেই চকিতে দেখা দেয় আশ্চর্য সব যৌন ইঙ্গিত। কুন্দকে শ্রীশচন্দ্রের কাছে পাঠানোর সময় কমলমণি বলে—'দেখিস্—যেন এ বাড়ীর বাবুকে প্রণাম করে ফেলিস্ না—এ বাড়ীর বাবু দেখিলেই বিয়ে করে ফেলিবে।' (পৃ. ১২) শ্রীশচন্দ্রর রসিকতাও সমগোত্রীয়—'শুধু গাড়ু গামছা বহিবার জন্য যদি ঠাকুরজামাইকে দরকার হয়, তবে আমি দুদিনের জন্য একটা ঠাকুরজামাই দেখিয়ে দিতে পারি।' (পৃ. ৩৭) মদন-জয়ী এই দাম্পত্যে স্বততই 'কামবৃত্তি' ঠাট্টার বিষয়—'কমল বলিলেন, ''আচ্ছা, মিথ্যা বলি ত কমলমণির সতীনের মাথা খাই।" শ্রীশ। তা হলে কেবল উপবাস করিতে হইবে।' (পৃ. ৭৬)

আদর্শ 'দম্পতিপ্রীতি' ক্রমে ক্রমে 'অপত্যপ্রীতি' বা 'স্বজনপ্রীতি'-র সোপান পেরিয়ে শেষে 'জাগতিক প্রীতি'-তে পর্যবসিত হয়। 'ধর্মতত্ত্ব'-এর ভাষায়—'পারিবারিক প্রীতি জাগতিক প্রীতিতে আরোহণ করিবার প্রথম সোপান।' (পৃ. ১২৩) শ্রীশচন্দ্র-কমলমণির দম্পতিপ্রণয়ও 'স্বজনপ্রীতি' হয়ে 'জাগতিক প্রীতি'-তেই রূপান্তরিত হয়েছে। তাই নগেন্দ্রের শোকের সান্ত্বনা যেমন হয়ে উঠতে পারেন শ্রীশচন্দ্রই—'নগেন্দ্র শ্রীশচন্দ্রের স্কন্ধে মুখ রাখিয়া বালকের মত বহুক্ষণ রোদন করিলেন।' (পৃ. ১১২) তেমনই কমলমণির গুণে মুগ্ধ কুন্দনন্দিনীও তাঁকে বলতে পারে—'তুমিই আমায় ভালবাস' (পৃ. ৪০)।

তবু স্বীকার্য, 'অনুশীলনে'র যান্ত্রিক মূর্তি নির্মাণে নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের আগ্রহ ছিল রক্ত মাংসের মানবিক সজীবতায়। তাই সূর্য্যমুখীর প্রিয় সখী কমলমণি শেষ ইস্তক কুন্দর প্রতি প্রসন্নতা বজায় রাখতে পারেনি। তাঁর নির্বিশেষ 'জাগতিক প্রীতি' পিছু হটেছে বিশেষ 'স্বজনপ্রীতি'-র কাছে।

সুভাষিণী-রমণবাবু

দেশমাতৃকাকে বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষিত করেছিলেন—'সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীং' (পৃ. ২১) বলে। আর এই দুই বিশেষণকে কর্মে ও কথায় যিনি সত্য করে তুললেন, তিনি 'ইন্দিরা' উপন্যাসের সুভাষিণী। সুভাষিণী—'দেখিবার মত সামগ্রী' (পৃ. ১৪)। ইন্দিরার বর্ণনায়—'এমন মুখ দেখি নাই। যেন পদ্মটি ফুটিয়া আছে।' (পৃ. ১৪) তার স্বভাবও তেমনি। সুভাষিণীর পরিপূর্ণ 'দম্পতিপ্রীতি' দুকূল ছাপিয়ে উপচে পড়ছে 'জাগতিক প্রীতি'তে। প্রথম দর্শনেই তাই ইন্দিরাকে সে সম্বোধন করে 'ভাই।' (পৃ. ১৫) ইন্দিরার 'হাতে গলায়, গহনার কালি' (পৃ. ১৬) দেখে সুভাষিণী বুঝে নেয়, সে 'বড় মানুষের মেয়ে', ফলে 'দাসীপনা'

নয়, ইন্দিরাকে সে নিযুক্ত করে 'পাচিকা' বৃত্তিতে; আশ্বস্ত করে—'তোমাকে রাঁধুনীর মত রাঁধিতে হইবে না। আমরা সকলেই রাঁধিব, তারই সঙ্গে তুমি দুই এক দিন রাঁধিবে।' (পৃ. ১৬)

ইন্দিরা 'সমত্ত' মেয়ে (পৃ. ১৮), তাই সুভাষিণীর শাশুড়ি তাকে কাজে রাখতে নারাজ। এইসূত্রেই সুভাষিণী-রমণবাবুর 'দম্পতিপ্রীতি'র অন্তর্গত 'কামবৃত্তি' যে পর্যাপ্তরূপে অনুশীলিত, ফলে বাহ্য আঘাত থেকে নিরুদ্বিগ্ন, তা বুঝে ফেলে ইন্দিরা। কেমন করে? সুভাষিণী স্বামীকে অন্দরে ডেকে পাঠালেন। স্বামীও হাজির। রমণবাবু 'সুন্দর পুরুষ' (পৃ. ১৯), তবু ইন্দিরাকে উঠে যেতে বলে না সুভাষিণী। আর তারপরই ইন্দিরার চোখে ধরা পড়ে অনন্যব্রত এই দাম্পত্যের আশ্চর্য এক খণ্ডচিত্র! ইন্দিরাকে কেন কৌশল করে কাজে বহাল করতে হবে, রমণবাবু তা জানতে চাইলে—'সুভাষিণী, তাঁহার নিকট গিয়া, আমি না শুনিতে পাই, এমন স্বরে বলিলেন, 'আমার হুকুম।' কিন্তু আমি শুনিতে পাইলাম। তাঁর স্বামীও তেমনই স্বরে বলিলেন, 'যে আজ্ঞা!' (পৃ. ২০) 'হুকুম' অচিরেই তামিল হল। খাওয়া ত্যাগ করে বউয়ের 'আজ্ঞা' পালন করলেন রমণবাবু। চাকরিতে বহাল হল ইন্দিরা।

ইন্দিরা বুঝল সুভাষিণী তাঁর 'হিতৈষিণী সখী' (পৃ. ২৫); একটি 'অমূল্য রত্ন' (পৃ. ১৫)। তাঁর 'বুদ্ধি যেমন প্রখরা, স্বভাবও তেমনই সুন্দর।' (পৃ. ২৬) বাড়ির যে ডাক্‌সাইটে গিন্নি, সে-ও এমনকী সুভাষিণীর 'হাতে কলের পুতুল' (পৃ. ২৬)। বুঝতে পারি আমরা অনুশীলিতা সুভাষিণী 'দম্পতিপ্রীতি'র সোপানে পা রেখে 'স্বজনপ্রীতি' ও 'জাগতিক প্রীতি'-র স্তরে পৌঁছে গেছে। ফলে শেষতক্ 'কালাদীঘির ডাকাতি'-র (পৃ. ২৭) কথাও চাপা রইল না তাঁর কাছে। স্বামীর সঙ্গে নিভৃতে আলোচনা করল সে। 'কার্য্যে' তারা একে অপরের 'মন্ত্রী'। ইন্দিরাকে সুভাষিণী বললে—'তুমি গেলে আমি বড় কাঁদিব—কিন্তু আমার সুখের জন্য তোমার সুখের ক্ষতি করি, এমন পাপিষ্ঠা আমি নই।' (পৃ. ৩২) রমণবাবুর সহায়তায় ইন্দিরার স্বামীর সন্ধান চালাতে লাগল সুভাষিণী।

অনায়াসে খোঁজ মিলল ইন্দিরার স্বামীর। 'রমণবাবু উকীল' (পৃ. ৩৩)। উপেন্দ্র তাঁর 'মোয়াক্কেল' (পৃ. ৩৩)। শুরু হল ইন্দিরাকে দাম্পত্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠ করার জন্য আদর্শ দম্পতি সুভাষিণী-রমণবাবুর চক্রান্ত—'তুমি, তোমার স্বামী-শ্বশুরের আর তাঁদের গায়ের নাম বলিয়া দিয়াছিলে, মনে আছে? তাই শুনিয়াই র-বাবু চিনিতে পারিলেন। তোমার উ-বাবুর একটা বড় মোকদ্দমা তাঁর হাতে ছিল—তারই ছল করিয়া তোমার উ-বাবুকে কলিকাতায় আসিতে লিখিলেন। তারপর নিমন্ত্রণ।' (পৃ. ৩৯) শেষ নয় এখানেই। ইন্দিরা স্বামী-সকাশে 'অভিসারিকে' (পৃ. ৩৯) হবে, তার জন্যে উপেন্দ্রকে 'রাত্রে আটকাইতে হয়' (পৃ. ৩৯)। সে-নাটকেরও কুশীলব র-বাবু; নির্দেশক সুভাষিণী—'র-বাবু যাহা পারেন, তাহা এই—তিনি এখন

মোকদ্দমার কাগজপত্র দেখিবেন না—একটা ওজর করিয়া রাখিবেন। কাগজ দেখিবার জন্য সন্ধ্যার পর সময় অবধারণ করিবেন। সন্ধ্যার পর তোমার স্বামী আসিলে কাগজপত্র দেখিবেন। কাগজপত্র দেখিতে দেখিতে একটু রাত্র করিবেন। রাত্র হইলে আহারের জন্য অনুরোধ করিবেন। কিন্তু তারপর তোমার বিদ্যায় যা থাকে, তা করিও।' (পৃ.৪০)

রমণবাবুর ভূমিকা শেষ, এবার সুভাষিণীর পালা। যুদ্ধযাত্রার আগে রণজয়ের জন্য তাকে 'ব্রহ্মাস্ত্র' (পৃ.৪৪) শিখিয়ে দেয় সুভাষিণী। 'উনিশ' (পৃ.১) বছরের মেয়ে ইন্দিরা সখী সুভাষিণীর কাছ থেকে দাম্পত্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় 'কামবৃত্তি'-র সহজপাঠটুকুও শিখে নেয়—'যা শিখাইয়াছিল—তার মধ্যে একটা বড় মিষ্ট লাগিয়াছিল। সেই মুখচুম্বনটি।' (পৃ.৪৫) দাম্পত্যের আশ্চর্য এই উপন্যাস তাই ইন্দিরার সেই 'অমূল্য রত্ন'-এর কথাতেই শেষ হয়—'আমি সুভাষিণীকে ভুলি নাই। ইহজন্মে ভুলিব না। সুভাষিণীর মত এ সংসারে আর কিছু দেখিলাম না।' (পৃ.৭৪)

<u>প্রফুল্ল-ব্রজেশ্বর</u>

'অনুশীলন ধর্ম' লিঙ্গ-নিরপেক্ষভাবে গ্রহণযোগ্য হলেও বঙ্কিমী-মননে অনুশীলনের ফলপ্রাপ্তি লিঙ্গ-সাপেক্ষ। গীতা-অনুবাদে বঙ্কিম লেখেন— 'আমেরিকায় স্ত্রীজাতির আধুনিক স্বধর্ম্মত্যাগে ও পৌরুষ কর্ম্মে প্রবৃত্তি। ইহাতে ঘটিতেছে স্ত্রীজাতির বৈষয়িক ভিন্ন প্রকার অবনতি, গৃহে উচ্ছৃঙ্খলতা এবং জাতীয় সুখহানি।' (পৃ.৩২) 'স্ত্রী' আর 'পুরুষে'র 'স্বধর্ম' পৃথক। স্ত্রী জাতি যদি তার স্বধর্ম ত্যাগ করে, তার ফলে 'গৃহে উচ্ছৃঙ্খলতা' ও 'জাতীয় সুখহানি' দেখা দেয়, এমনটাই বঙ্কিমের বক্তব্য। অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিকোণ চিরাচরিত হিন্দুত্ববাদী বা বৃহত্তর অর্থে পুরুষতান্ত্রিক। নারীর 'স্বধর্ম' গৃহধর্ম। গৃহের শৃঙ্খলা বজায় রাখবে গৃহিণী। আর যেহেতু 'গৃহ' বা 'পরিবার' নামক অণু-একক জুড়েই জাতি-রাষ্ট্রের সৃষ্টি, তাই এতে করে 'জাতীয় সুখহানি'-র সম্ভাবনাও থাকবে না। মোদ্দা কথা, নারীকে অনুশীলিত হতে হবে গৃহধর্ম রক্ষার্থে। বঙ্কিম-কল্পিত আদর্শ রাষ্ট্রের আদর্শ পরিবারের অনুশীলিত গৃহিণী হয়ে ওঠার আখ্যানই 'দেবী চৌধুরাণী'। অনুশীলন বঙ্কিম-উপন্যাসে পুরুষকে মুখ্যত 'কামবৃত্তি'-র চোরাবালি থেকে উত্তরণে সাহায্য করেছে, আর নারীকে করে তুলেছে 'সংসারসৌন্দর্য্যের প্রতিমা।' (পৃ.৪)

'ধর্মতত্ত্ব' মতে আমাদের চারটি 'বৃত্তি'-ই অনুশীলনযোগ্য। প্রফুল্লর সেই চতুর্বিধ 'বৃত্তি' অনুশীলিত হয়েছে ভবানী পাঠকের নির্দেশে। কেমন সে অনুশীলন?

শারীরিকী বৃত্তি	ভবানী পাঠক প্রফুল্লকে মল্লযুদ্ধ শিখতে বলেন। কেন? —'ইন্দ্রিয়জয়ের জন্য। দুর্বল শরীর ইন্দ্রিয়জয় করিতে পারে না। ব্যায়াম ভিন্ন ইন্দ্রিয়জয় নাই।' (পৃ.৫১)
কার্য্যকারিণী বৃত্তি	'ধর্মতত্ত্ব'-এ বঙ্কিম-উবাচ—'গার্হস্থ্যে কার্য্যকারিণী বৃত্তির অনুশীলন।' (পৃ.২১) আর প্রফুল্লর এই বৃত্তির অনুশীলন চলে প্রথম পাঁচ বছরে—'গোব্‌রার মা কিছু কাজ করে না, কেবল হাট করে— ...নিশিও বড় সাহায্য করে না, কাজেই প্রফুল্লকে সকল কাজ করিতে হয়।' (পৃ.৪৯)
জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি	ভবানী পাঠকের কাছে প্রফুল্ল পড়েছে 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদগীতা' (পৃ.৪৯)। তার থেকে শিখেছে—'কর্ম্ম, অসক্ত হইয়া করিতে হইবে।' (পৃ.৫২)
চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি	দেবী চৌধুরাণী নিশির কাছে বীণাবাদন শিখেছে—'ছাদের উপর গালিচা পাতিয়া সেই বহুরত্নমণ্ডিতা রূপবতী মূর্ত্তিমতী সরস্বতীর ন্যায় বীণাবাদনে নিযুক্তা।' (পৃ.৬১)

এতো না হয় সেই 'অনুশীলন' যা ভবানী পাঠকের 'শিষ্যা' প্রফুল্ল শিখেছে। কিন্তু, এই সমস্ত 'অনুশীলন'কে প্রফুল্ল চালিত করেছে গৃহকর্মের দিকে, তাঁর 'দম্পতিপ্রীতি'-র দিকে, 'পরিবার'-এর সেবার্থে। এই 'দম্পতিপ্রীতি'-র 'অনুশীলন' তো ব্রহ্মচারী ভবানী পাঠকের পক্ষে শেখানো সম্ভব না। তবে কে শেখাল? 'ধর্মতত্ত্ব'-কারের মতে—'স্বামী সকল বিষয়েই স্ত্রীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তিনি ভক্তির পাত্র।' (পৃ.৫৩) আর 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ ভ্রমর স্বামীকে সম্বোধন করে বলে—'হে গুরো! শিক্ষক, ধর্মজ্ঞ, আমার একমাত্র সত্যস্বরূপ!' (পৃ.৪১) প্রফুল্লর 'দম্পতিপ্রীতি'-র গুরু ব্রজেশ্বর।

সমাপ্তি অংশ বাদ দিলে, উপন্যাসে প্রফুল্ল-ব্রজেশ্বরের নিভৃত সাক্ষাৎ ঠিক দুইবার—দশ বছরের ব্যবধানে। এই দুটি সাক্ষাৎ-ই আসলে প্রফুল্লর জীবনের নির্ণায়ক। কীভাবে?

<u>প্রথম আলাপ</u>

'আঠার বৎসর' (পৃ.৮)-এর প্রফুল্লর সঙ্গে প্রথম আলাপ তাঁর স্বামী 'একুশ বাইশ' বছরের 'অনিন্দ্য সুন্দর' (পৃ.১৭) ব্রজেশ্বরের, তাদের বাড়িতেই, সতীনের ঘরে, রাত্রে—'দুইজনে সম্বন্ধ বড় নিকট—স্ত্রী পুরুষ—পরস্পরের অর্দ্ধাঙ্গ, পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।' (পৃ.২০) প্রথম দর্শনে কেমন দেখল ব্রজেশ্বর?—'প্রফুল্লের রূপ অতুলনীয়' (পৃ.৪৭)। তার উপর 'প্রফুল্ল কাঁদিতেছে।' (পৃ.২১) 'রূপ' আর 'দয়া' মিলিয়ে ব্রজেশ্বরের মনের মধ্যে গোলযোগ পাকিয়ে দিল—'ব্রজেশ্বর না বুঝিয়া সুঝিয়া, না ভাবিয়া চিন্তিয়া, যেখানে বড় ডব্‌ডবে চোকের নীচে দিয়া এক ফোঁটা জল গড়াইয়া আসিতেছিল—সেই স্থানে—

আ! ছি! ছি!—ব্রজেশ্বর হঠাৎ চুম্বন করিলেন।' (পৃ.২১) 'দম্পতিপ্রীতি'-র অন্তর্গত যে 'কামবৃত্তি', এই প্রথম তার আস্বাদ পেল প্রফুল্ল; যে-আস্বাদ তার 'আঠার বৎসর'-এর জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি—'নির্ব্বোধ প্রফুল্ল মনে মনে ভাবিতেছিল যে, বুঝি এই মুখচুম্বনের মত পবিত্র পুণ্যময় কর্ম্ম ইহজগতে কখনও কেহ করে নাই।' (পৃ.২২) এরপর ব্রজেশ্বরের সঙ্গে এক শয্যায় রাত্রিযাপন এবং 'ব্রজেশ্বরের আদর' (পৃ.২৩) প্রাপ্তি। একরাত্রির এই অভিজ্ঞতাই অনুশীলিত প্রফুল্লকে দিয়েছিল স্বামী-সঙ্গতা হওয়ার সুখ। 'দম্পতিপ্রীতি'র প্রথম পাঠ। ফলে নিশির সঙ্গে প্রথম কথোপকথনেই প্রফুল্লর মুখে শুনি—'কখন স্বামী দেখ নাই, তাই বলিতেছ—স্বামী দেখিলে কখন শ্রীকৃষ্ণে মন উঠিত না।' (পৃ.৪৪) তখনো প্রফুল্লর 'জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি' অনুশীলিত হয়নি। তাই তাঁর হয়ে আসরে নামেন স্বয়ং 'ধর্মতত্ত্ব'কার। বুঝিয়ে বলেন—'অনন্ত জগদীশ্বর, হিন্দুর হৃৎপিঞ্জরে সান্ত শ্রীকৃষ্ণ! স্বামী আরও পরিষ্কাররূপে সান্ত। এইজন্য প্রেম পবিত্র হইলে, স্বামী ঈশ্বরে আরোহণের প্রথম সোপান। তাই হিন্দুর মেয়ের পতিই দেবতা।' (পৃ.৪৫) আলোচনার সিদ্ধান্ত-বাক্য? —'ঈশ্বর-ভক্তির প্রথম সোপান পতি-ভক্তি।' (পৃ.৪৫) এরপর দশ বছর ধরে ভবানী পাঠক প্রফুল্লকে যা কিছু 'অনুশীলন' করাবেন, শেষতক্ তার সবই ঐ 'পতি-ভক্তি'-কে স্পর্শ করে ধাবিত হবে 'ঈশ্বর-ভক্তি'র দিকে।

দ্বিতীয় আলাপ

দশ বছর বাদ সাগরের প্রতিজ্ঞাকে উপলক্ষ করে ব্রজেশ্বর-প্রফুল্লর দ্বিতীয় আলাপ ঘটল। এবার দেবীর বজরায়। পরস্পরকে দেখে তাদের একই অবস্থা—'দুইখানা মেঘেই বৈদ্যুতি ভরা।' (পৃ.৭৯) প্রফুল্লকে দেখে 'মানুষে মানুষে কখন কখন এমন সাদৃশ্য থাকে' (পৃ.৭৯) মনে হল ব্রজেশ্বরের, মনে পড়ল এ'রাত্রের মত সে-রাত্রেও 'এমনই অশ্রুধারা বহিয়াছিল' (পৃ.৮১), ফলে 'মানসিক গোলযোগ' (পৃ.৮১) বেঁধে গেল। দশ বছর আগের সেই রাত্রের পুনরাভিনয় করল স্বভাবত 'জিতেন্দ্রিয়' (পৃ.৮১) ব্রজেশ্বর—'ব্রজেশ্বর কিছু না বুঝিয়া—কেন জানি না—দেবীর কাঁধে হাত রাখিল, অপর হাতে ধরিয়া মুখখানি তুলিয়া ধরিল—বুঝি মুখখানা প্রফুল্লর মত দেখিল। বিবশ বিহ্বল হইয়া সেই অশ্রুনিষিক্ত বিম্বাধরে—আ ছি ছি! ব্রজেশ্বর! আবার!' (পৃ.৮১) এই 'অমৃতস্রোত' (পৃ.৮১)-এ স্নাত হয়েই ঠিক এরপরই নিশির কাছে কবুল করলেন প্রফুল্ল, 'সন্ন্যাস' তার অপছন্দের—'পথ খোলা থাকিলে আমি এ পথে আসিতাম না।' (পৃ.৮২) ফলে এর একবছর পরে সত্য সত্যই 'রাণীগিরি'-র নকল সন্ন্যাস ছেড়ে গার্হস্থ্যের নিষ্কাম সন্ন্যাসে প্রত্যাবর্তন ঘটল প্রফুল্লর—'এই ধর্ম্মই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম; রাজত্ব স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম নয়। কঠিন ধর্ম্মও এই সংসারধর্ম; ইহার অপেক্ষা কোন যোগই কঠিন নয়।... আমি এই সন্ন্যাস করিব।' (পৃ.১৩৪) মনে পড়বে আমাদের

'অনাসক্ত' হয়ে 'নিষ্কাম কর্ম্ম' করাকেই 'সন্ন্যাস' বলেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র— 'প্রফুল্ল নিষ্কাম অথচ কর্ম্মপরায়ণ, তাই প্রফুল্ল যথার্থ সন্ন্যাসিনী।' (পৃ.১৩৫)

কীভাবে কাজে লাগল সংসারে, প্রফুল্লর অনুশীলন ধর্ম? 'ভবানী ঠাকুরের শাণিত অস্ত্র' (পৃ.১৩৫) কেমন করে গার্হস্থ্যের 'দেবী' হয়ে উঠলেন? আগেই দেখেছি আমরা 'ধর্মতত্ত্ব' মতে আদর্শ 'দম্পতিপ্রীতি' যথাক্রমে 'অপত্যপ্রীতি', 'স্বজনপ্রীতি' হয়ে 'জাগতিক প্রতি'-র দিকে ধাবিত হয়। প্রফুল্ল-ব্রজেশ্বরের সংসারে লক্ষ করা যাক এই সোপানত্রয়ী ঃ

অপত্যপ্রীতি
'নয়নতারার ছেলেগুলিকে প্রফুল্ল যেমন যত্ন করে, নয়নতারা তেমন পারে না। নয়নতারা প্রফুল্লের হাতে ছেলেগুলি সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইল।' (পৃ.১৩৫)
স্বজনপ্রীতি
'শাশুড়ী প্রফুল্ল হইতে এত সুখী যে, প্রফুল্লের হাতে সমস্ত সংসারের ভার দিয়া, তিনি কেবল সাগরের ছেলে কোলে করিয়া বেড়াইতেন। ক্রমে শ্বশুরও প্রফুল্লের গুণ বুঝিলেন।... যাহার ভোজনের কাছে প্রফুল্ল না দাঁড়াইত, সে মনে করিত, আধপেটা খাইলাম।' (পৃ.১৩৪-১৩৫)
জাগতিক প্রীতি
ব্রজেশ্বরের থেকে 'পঞ্চাশ হাজার টাকা কর্জ্জ শোধ' (পৃ.১৩৬) নিলেন প্রফুল্ল। সেই টাকায় এক অতিথিশালা হল—'অতিথিশালা মধ্যে এক অন্নপূর্ণা-মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া, অতিথিশালার নাম দিল, ''দেবীনিবাস।" (পৃ.১৩৬) এই 'দেবীনিবাস' 'কাঙ্গাল গরিবের' (পৃ.১৩৬) জন্য।

অনুশীলনের গুণে 'দম্পতিপ্রীতি' কীভাবে 'জাগতিক প্রীতি'তে ব্যাপ্ত হয়, মুখ্যত 'পরিবার'কে কেন্দ্র করে, বঙ্কিম-মনন এবং বঙ্কিম-উপন্যাসের তা অন্যতম কেন্দ্রীয় বিষয়। এইটুকু নবীনচন্দ্রের চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল বলেই শুরুর ওই অন্যায় অভিযোগটুকু বরদাস্ত করতে হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রকে।

রাষ্ট্র বনাম 'কামবৃত্তি' ঃ

'ধর্মতত্ত্ব'-এই আমরা দেখেছি বঙ্কিমচন্দ্রের মতে 'কামবৃত্তি' বলবতী 'শারীরিকী বৃত্তি'। তাই এর অনুশীলনের অর্থ 'ইন্দ্রিয়সংযম'। অননুশীলিত কামবাসনা সর্বাগ্রে 'পরিবার'কে আক্রমণ করে। আর 'পরিবার' যেহেতু 'রাষ্ট্র'-এর অণু-একক তাই অতঃপর তাকেও। 'পরিবার'কে ভেঙে তছ্‌নছ্ করে দেওয়া 'কামবৃত্তি'র স্বরূপ আমরা আগেই দেখেছি। এবার দেখে নেব বঙ্কিম-সাহিত্যে কামনার সেইসব বিধ্বংসী রূপ যা সরাসরি 'রাষ্ট্র'কেই আঘাত করতে চায়। লক্ষণীয় এক্ষেত্রেও 'কামবৃত্তি'-র আলম্বন তিনজন পুরুষই : গঙ্গারাম, পশুপতি ও সীতারাম।

গঙ্গারাম

সীতারাম রায়ের প্রথমা স্ত্রী শ্রী। গঙ্গারাম শ্রী-র ভাই। প্রথম পক্ষের এই শ্যালককে বাঁচাবার সূত্রেই সীতারামের জীবন-নাট্যে নতুন অঙ্কের সূত্রপাত। মহম্মদপুরে সীতারাম তাঁর রাজ্যস্থাপনে মনোযোগী হয়ে এই গঙ্গারামকেই বরণ করলেন সেনাপতি পদে—'গঙ্গারাম সীতারামের একান্ত অনুগত ও কার্য্যকরী হইয়া মহম্মদপুরে বাস করিতেছিলেন।' (পৃ.৫২)

এদিকে রাজা সীতারামের কনিষ্ঠা পত্নী রমা—'বিবাদে রমার বড় ভয়।' (পৃ.৫২) ফলে মুসলমানদের সঙ্গে যাতে সীতারামের সম্মুখ সমর না হয় তার ব্যবস্থা করতেই রমা 'নগর রক্ষক' গঙ্গারামের সাক্ষাৎপ্রার্থিনী হয় গোপনে, সীতারামের অনুপস্থিতিতে। রমার 'মনে কিছু মলা নাই।' (পৃ.৭৭) সে গঙ্গারামকে বলে—'আপনি আমার দাদা হন—জ্যেষ্ঠ ভাই, আপনার পক্ষে শ্রীও যেমন, আমিও তাই।' (পৃ.৭৫) কিন্তু গঙ্গারামের মনে 'মলা' থাকতে পারে তো! গঙ্গারাম বিবাহিত—'আমার নিজের পরিবার আছে—' (পৃ.১০৮)। তবু প্রথম দর্শনেই সে 'রূপ-বহ্নি'-বিবিক্ষু পতঙ্গপ্রায়—'গঙ্গারাম মনে করিলেন, এমন সুন্দরী পৃথিবীতে আর জন্মে নাই। সে রমা।' (পৃ. ৭৫) রূপের আগুনে পুড়তে থাকা গঙ্গারাম ভাবলেন—'মানুষ যে এমন সুন্দর হয়, তা জান্‌তেম না! একবার যে দেখিলাম, আমার যেন জন্ম সার্থক হইল। আমি তাই ভাবিয়া যে কয় বৎসর বাঁচিব, সুখে কাটাইতে পারিব।' (পৃ. ৭৭) বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্টাক্ষরে বলে দেন, এ সবই সেই 'ধনুর্দ্ধর ঠাকুর'-এর 'ফুলের বাণ' (পৃ. ৭৮)-এর কারসাজি। অচিরেই 'কাম' পর্যবসিত হল অ-নৈতিক 'লোভ'-এ—'পৃথিবীতে যত পাপ থাকে, সব আমি করিব, তবু আমি রমাকে ছাড়ব না।' (পৃ. ৮৩) এই ভেবে সরাসরি স্বদেশবৈরিতার পথে হাঁটলেন গঙ্গারাম। তোরাব্ খাঁকে সীতারামের অনুপস্থিতিতে মহম্মদপুর দিয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার করে দিলেন 'নগর রক্ষক' গঙ্গারাম। বিনিময়ে পুরস্কার স্বরূপ চাইলেন—'মহারাজের কনিষ্ঠা মহিষী।' (পৃ. ১০৭)

শ্রী-সীতারাম-জয়ন্তীর এ্যহস্পর্শে গঙ্গারামের বিশ্বাসঘাতকতা ধরা পড়ে গেল। ঘটল না তার রমা-প্রাপ্তি। 'সীতারাম' উপন্যাসের ভূমিকায় গীতার শ্লোক (২/৬২) উদ্ধার করেছিলেন বঙ্কিম— 'ইন্দ্রিয়ের বিষয় ধ্যান করিতে করিতে তাহাতে আসক্তি জন্মে। আসক্তি হইতে কামনা জন্মে, কামনা হইতে ক্রোধ জন্মে।' (পৃ. ১০১) গঙ্গারামের ব্যাহত কামবাসনাও এবার বিধ্বংসী 'ক্রোধ'-এ পরিণত হল—'গঙ্গারাম, আর রমার প্রতি আসক্ত নহে, এখন রমার তেমন আন্তরিক শত্রু আর কেহ নহে।' (পৃ. ১১৬) ফলে 'বিশ্বাসঘাতক' গঙ্গারাম উপন্যাসের শেষ-পর্বে নিছক দেশদ্রোহী কৃতঘ্ন ছাড়া আর কিছুই নন—'রমার মৃত্যু হইয়াছে, তাহা জানে না, ছদ্মবেশে ছলনা দ্বারা তাহাকে লাভ করিবার জন্যই মুসলমান সেনার গোলন্দাজ হইয়া আসিয়াছিল।' (পৃ. ১৬৫) 'কামবৃত্তি'র অননুশীলন এক দক্ষ সেনাপতিকে পরিণত করেছে রাষ্ট্রদ্রোহীতে।

পশুপতি

গঙ্গারাম যেমন সীতারাম রায়ের সেনাপতি ছিলেন, তেমনই পশুপতি ছিলেন বঙ্গাধিপতি লক্ষ্মণসেনের প্রধান অমাত্য 'ধর্ম্মাধিকার' (পৃ. ৪৩)। পদাধিকারবলে তিনি 'দ্বিতীয় গৌড়েশ্বর' (পৃ. ৪৩)। পশুপতির পূর্ব-ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। কাশীতে পিতার নিকটে থাকার সময় হৈমবতী নামে এক 'অষ্টমবর্ষীয়া' কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। বিবাহের রাত্রেই হৈমবতী তার পিতার সঙ্গে 'অদৃশ্য' হন। ফল? পশুপতি 'পত্নী সহবাসে বঞ্চিত'। 'বামানয়ননিঃসৃত জ্যোতির অভাবে' শুধু তাঁর অট্টালিকা নয়, তাঁর জীবনই 'অন্ধকারময়' (পৃ. ৪৩)।

এরপর পশুপতির জীবনে নতুন জটিলতা তৈরি করে নবদ্বীপে বিধবা মনোরমার প্রতি তাঁর অ-প্রতিহত 'কামবৃত্তি'-র ধাবমানতা। পশুপতি জানেন 'স্বদেশবৈরিতা মহাপাপ'। (পৃ. ৪৪) তবু তিনি 'যবনহস্তে' নিজের রাজ্য সমর্পণে ইচ্ছুক। কেন? পশুপতির উত্তর—'আমি স্বনামে রাজা হইতে বাসনা করি।' (পৃ. ৪৫) কী হবে তাতে? মনোরমাকে পশুপতি ব্যক্ত করেন তাঁর 'মন্ত্রণা'—'তোমার জন্যই আমি এ মন্ত্রণা করিয়াছি। আমি এক্ষণে রাজভৃত্য, ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারি না। এখন বিধবাবিবাহ করিলে জনসমাজে পরিত্যক্ত হইব; কিন্তু যখন আমি স্বয়ং রাজা হইব, তখন কে আমায় ত্যাগ করিবে? যেমন বল্লালসেন কৌলীন্যের নূতন পদ্ধতি প্রচলিত করিয়াছিলেন, আমি সেইরূপ বিধবা-পরিণয়ের নূতন পদ্ধতি প্রচলিত করিব।' (পৃ. ৫২) আমরা আগেই বলেছি, বঙ্কিম-উপন্যাসে 'স্ত্রী'রা স্বভাবতই অনুশীলিতা। তাঁরা পুরুষের জীবনে 'কল্যাণস্বরূপা'। বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্বাস অনুযায়ী, পুরুষের জীবনে সমস্ত 'ভ্রম-প্রমাদ' শুধরে দেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র তাদেরই। বঙ্কিমের জীবন-নিষ্ণাত এই ধারণারই মূর্ত রূপ হৈমবতী ওরফে মনোরমা। মনোরমা যেদিন পশুপতিকে তার পূর্বেতিহাস বলবে, জানাবে যে সে-ই কেশবের কন্যা হৈমবতী, গ্রহের ফেরে তাদের সম্পর্কের এই অবস্থা, তখনও 'দম্পতিপ্রীতি'-র খাতিরেই পশুপতির 'ভ্রম-প্রমাদ' সংশোধনের আপ্রাণ চেষ্টা করবে সে; আরোপ করবে এক কঠিন মর্মঘাতী শর্ত—'তোমার রাজ্যলাভের দুরাশা ছাড়। প্রভুর অহিত চেষ্টা ছাড়।... যদি ইহা স্বীকার কর—আমার ভক্তি অচলা থাকিবে। ... নহিলে, দেবীসমক্ষে শপথ করিতেছি, তোমায় আমায় এই সাক্ষাৎ, এ জন্মে আর সাক্ষাৎ হইবে না।' (পৃ. ৯১-৯২) 'স্বদেশপ্রীতি'-তে একাকার হয়ে-যাওয়া মনোরমার 'দম্পতিপ্রীতি'-ই তাকে দিয়ে উচ্চারণ করিয়ে নেয় অমোঘ সেই বাণী—'যে প্রভুর নিকট বিশ্বাস নষ্ট করিল, সে স্ত্রীর নিকট অবিশ্বাসী না হইবে কেন?' (পৃ. ৫৩)

স্বতঃঅনুশীলিতা মনোরমা যা বোঝেন, অনুশীলনের অভাবে তা বুঝতে পারেন না 'ধর্ম্মাধিকার' পশুপতি। অ-নিয়ন্ত্রিত 'কামবৃত্তি'র বশবর্তী হয়ে তিনি রাষ্ট্রের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলেন। 'দারুণ

লোভের' বশে তিনি স্বদেশকে 'শ্মশানভূমি' (পৃ. ১১৪)-তে রূপান্তরিত করলেন। 'কামবৃত্তি'-আশ্লিষ্ট এই মানুষটির অন্তিম পরিণতিও তাই 'মরণোন্মুখ পতঙ্গবৎ' (পৃ. ১১৪) 'অনলমণ্ডলমধ্যে' (পৃ. ১১৫) প্রবেশ মাত্র।

সীতারাম

ইন্দ্রিয়ের অসংযম কত ভয়ংকর রূপ ধারণ করে একটি 'রাষ্ট্র'কে তাঁর মূল থেকে উৎপাটিত করতে পারে, তারই করুণ আখ্যান 'সীতারাম'। ইতিহাসকে অনুসরণ করেই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে রাজা সীতারাম রায়ের দুই স্ত্রী। নন্দা ও রমা। 'তপ্তকাঞ্চনশ্যামাঙ্গী' (পৃ. ৪৮) নন্দা আর 'হিমরাশিপ্রতিফলিতকৌমুদীরূপিনী' (পৃ. ৪৮) রমা। বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন—'স্ত্রীপুরুষে পরস্পর ভালবাসাই দাম্পত্য সুখ নহে, একাভিসন্ধি—সহৃদয়তা—ইহাই দাম্পত্য সুখ।' (পৃ. ৫৫) এই 'দাম্পত্য সুখ'-এ সুখী তো মহারাজা সীতারাম রায়? একটু লক্ষ করা যাক। প্রথমে রমার কথা—'রমা বড় ছোট মেয়েটি, জলে ধোয়া যুঁইফুলের মত বড় কোমলপ্রকৃতি।... বিবাদে রমার বড় ভয়।... বিশেষ মুসলমান রাজা, তাহাদের সঙ্গে বিবাদে রমার বড় ভয়।... রমা ইষ্টদেবের নিকট যুক্ত করে প্রার্থনা করিত—''হে ঠাকুর। মহম্মদপুর ছারেখারে যাক্—আমরা আবার মুসলমানের অনুগত হইয়া নির্বিঘ্নে দিনপাত করি।' (পৃ. ৫২-৫৩) 'উত্তরচরিত'-এ বঙ্কিম আদর্শ স্ত্রীর গুণাবলী বলেছিলেন—'বিপদে যে বন্ধু' 'কার্য্যে যে মন্ত্রী' 'বিপদে যে বুদ্ধি' (পৃ. ৪)। এর একটিও কি রমার পক্ষে হওয়া সম্ভব? তুলনায় নন্দা সুগৃহিণী। 'মাতার মত স্নেহ, কন্যার মত ভক্তি, দাসীর মত সেবা, সীতারাম সকলই নন্দার কাছে পাইতেছিলেন।' (পৃ. ৫৪) কিন্তু—'কঠিন কার্য্যের সহায়, সঙ্কটে মন্ত্রী, বিপদে সাহসদায়িনী' (পৃ. ৫৪) তো নন্দা হতে পারবে না। সে শুধুই 'গৃহিণী', রাজা সীতারাম রায়ের 'মহিষী' হওয়ার উপযুক্ত নয়।

এই অতৃপ্তির ছিদ্রপথেই সীতারামের জীবনে 'কলি' হয়ে প্রবেশ করল প্রথমা এবং পরিত্যক্তা স্ত্রী শ্রী, তাঁর অপূর্ব রূপ-লাবণ্যসহ। 'শ্রী'-র কোষ্ঠীবিচারে সীতারামের পিতা জেনেছিলেন, সে 'প্রিয়প্রাণহন্ত্রী' (পৃ. ৪৬)। 'স্ত্রীজাতির সাধারণতঃ পতিই প্রিয়' (পৃ. ৪৭) এই ভেবে শ্রীকে গ্রহণ করলেন না সীতারামের পিতা। সেই পূর্ণযৌবনা শ্রী, ভাই গঙ্গারামের প্রাণভিক্ষা চাইতে দ্বারস্থ হলেন সীতারামের। প্রথম দর্শনেই সীতারাম রূপ-বহ্নি-বিবিক্ষুঃ পতঙ্গবৃত্ত হয়ে উঠলেন—'তখন শ্রী মুখের ঘোম্‌টা তুলিল। সীতারাম দেখিলেন, অশ্রুপূর্ণ, বর্ষাবারি-নিষিক্ত পদ্মের ন্যায়, অনিন্দ্যসুন্দরমুখী। বলিলেন, ''তুমি শ্রী! এত সুন্দরী!'' ' (পৃ. ৩৩) সীতারামের মন 'রূপের পাথারে' ডুবে গেল—'মনে মনে একবার আবার ভাবিলেন, ''শ্রী

এমন শ্রী? তা ত জানি না। আগে শ্রীর কাজ করিব, তারপর অন্য কথা।" ' (পৃ. ৩৪) শুধু 'রূপ' নয়, গঙ্গারামের উদ্ধারকার্যে শ্রীর 'গুণ'ও বুঝতে পারলেন সীতারাম। ফলে 'শ্রীর অনুপম রূপমাধুরী' আর 'শ্রীর গুণ' (পৃ. ৪৯) দু'য়ে মিলেই সীতারামের জীবনে 'উচ্ছ্বসিত অনুরাগের তরঙ্গ' (পৃ. ৪৯) তুলে দিল। স্বয়ং কথকের ব্যাখ্যা—'নূতনের গুণ অনেক সময়ে অসীম বলিয়া বোধ হয়। তাই সে নূতনের জন্য বাসনা দুর্দ্দমনীয় হইয়া পড়ে। ... সে প্রেম বড় উন্মাদকর বটে। নূতনেরই তাহা প্রাপ্য।... শ্রী সীতারামের পক্ষে নূতন। শ্রীর প্রতি সেই উন্মাদকর প্রেম সীতারামের চিত্ত অধিকৃত করিল।' (পৃ. ৫৫) বলাই বাহুল্য, এই 'উন্মাদকর প্রেম' 'প্রকৃত ভালবাসা' নয়, তা 'বুদ্ধিবৃত্তিমূলক' নয়, তা শুধুই 'স্মরজ' 'কামবৃত্তি'। এক বৎসরের উড়িষ্যাবাস শেষে জয়ন্তীর শিষ্যা শ্রী যখন সীতারামের কাছে ফিরে এলেন, তখনও 'মূঢ় সীতারাম' 'মহিষী' খুঁজে ফিরছিলেন, পেলেন 'দেবী' (পৃ. ১১৯)! শ্রী তাঁর 'স্বধর্ম্ম' ত্যাগ করেছে—'স্বামিসহবাস স্ত্রীজাতির পক্ষে ধর্ম্মভ্রংশ' (পৃ. ১২০)। শ্রী কাছে এলেন, পাশে এলেন না। ফলে—'শ্রী হইতে সীতারামের সর্ব্বনাশ হইল।' (পৃ. ১২৩)

'ধর্মতত্ত্ব'-এ বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন—'অনেক সময়ে এই কামবৃত্তি আসিয়া দম্পতিপ্রীতিস্থান অধিকার করে। অনেক সময়ে তাহার স্থান অধিকার না করুক, দম্পতিপ্রীতির সঙ্গে সংযুক্ত হয়। সে অবস্থায় যে পরিমাণে ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি, বাসনার প্রবলতা, সেই পরিমাণে দম্পতিপ্রীতিও পাশবতা প্রাপ্ত হয়।' (পৃ. ১২৩) সীতারামের জীবনে এমনটাই ঘটতে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাখ্যা—'তা শ্রী, যদি রাজপুরীতে মহিষী না থাকিয়া, চিত্তবিশ্রামে আসিয়া উপপত্নীর মত রহিল, তবে সন্ন্যাসীর মত না থাকিয়া, সেই মত থাকিলেই এতটা প্রমাদ ঘটিত না। আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইলে তাহার মোহিনী শক্তির অনেক লাঘব হইত।' (পৃ. ১৩৭) সীতারামের 'ভোগলালসা' (পৃ. ১২৭) ব্যাহত হয়ে 'প্রবলা' (পৃ. ১২৭) হয়ে উঠল। এমতাবস্থায় জয়ন্তীর পরামর্শে শ্রী অন্তর্হিত হল। সীতারাম—'ক্রোধে অত্যন্ত বিকৃতচিত্ত হইয়া উঠিলেন।' (পৃ. ১৩৫) উপন্যাসের গোড়ায় গীতার শ্লোক উদ্ধার করে এই কথাই বলেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র—'সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে।' (পৃ. ২৯) সীতারামের চিত্ত এখন ব্যাহত-কাম ক্রোধে অগ্নিগর্ভ—'যে ক্রোধ সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বগ্রাসক।' (পৃ. ১৫১) ফলে 'উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত' সীতারাম আদেশ দিলেন—'রাজ্যে যেখানে যেখানে যে সুন্দরী স্ত্রী আছে, আমার জন্য চিত্তবিশ্রামে লইয়া আইস।' (পৃ. ১৫১) সম্পূর্ণ হল সীতারামের নৈতিক এবং চারিত্রিক অধঃপতন।

আর রাজার চরিত্রই যখন ধ্বংসের মুখে, তখন 'রাষ্ট্র'-ই বা থাকে কই? 'রঘুবংশ'-এর ঊনবিংশ সর্গে 'কামুক' রাজা অগ্নিবর্ণের কথা আছে, যাঁর ইন্দ্রিয়বশ্যতাই মহান রঘুবংশের ধ্বংসের কারণ হয়েছিল। এইসূত্রে সঙ্গতভাবেই সে-কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন বঙ্কিম। লক্ষণীয় আরেকটি প্রসঙ্গও। সীতারামের

ব্যাহতকাম চিত্তের অত্যাচার লিঙ্গভিত্তিক, ধর্মভিত্তিক নয়। তাই চাঁদশাহ ফকির যখন চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কারের সঙ্গে কথোপকথনে বলেন—'যে দেশে হিন্দু আছে, সে দেশে আর থাকিব না। এই কথা সীতারাম শিখাইয়াছে।' (পৃ. ১৫১)—তখন তাঁর ইঙ্গিত অবশ্যই রাজার ইন্দ্রিয়পারবশ্যতার দিকেই। 'দম্পতিপ্রীতি'র অন্তর্গত অননুশীলিত 'কামবৃত্তি' কীভাবে পরিবার তথা রাষ্ট্রকে সমূলে ধ্বংস করে দিতে পারে, 'সীতারাম' তারই আখ্যান।

দেশ ও দম্পতি ঃ

বঙ্কিম-উপন্যাসের জগতে চারবার রাজ্যস্থাপন ঘটেছে। প্রথম 'মৃণালিনী'তে বাংলাদেশের 'দক্ষিণে' 'সমুদ্রের উপকূলে' (পৃ. ১১৯) হিন্দু-রাষ্ট্র স্থাপন করেছেন হেমচন্দ্র। দ্বিতীয়বার 'আনন্দমঠ'-এ সত্যানন্দ 'হিন্দুরাজ্য' (পৃ. ১১৬) স্থাপন করতে চেয়েছেন। কিন্তু পারেননি। তৃতীয়বার, রাজা সীতারাম রায়ের প্রচেষ্টা আংশিক সাফল্য পেয়েছে। তাঁর রাজধানীর নাম 'মহম্মদপুর' যেখানে 'হিন্দু ও মুসলমান প্রজার প্রতি তুল্য ব্যবহার' (পৃ. ৫১) করা হয়। কিন্তু, নিজদোষে রাজা 'মজিলা আপনি, মজাইলা' সবকিছু। অবশেষে রাজসিংহ, যিনি রাজ্যস্থাপন করলেন বটে, কিন্তু অন্য ধর্মের প্রজাদের পীড়নে তাঁর সায় না-থাকায় সে সাম্রাজ্য 'হিন্দুসাম্রাজ্য' (পৃ. ১৯১) হল না।

'ধর্মতত্ত্ব' মতে 'মনুষ্যত্ব' অর্জনের সাধনাই আসলে 'অনুশীলন'। আদর্শ রাষ্ট্রের সংগঠক বা পরিচালককে তো অবশ্যই অনুশীলিত হতে হবে। তাই বঙ্কিম-উপন্যাসে যেখানে যেখানে রাজ্যস্থাপন হয়েছে আমরা দেখবো, সেখানেই আমরা খুঁজে পাব এক বা একাধিক দম্পতি, যাদের 'দম্পতিপ্রীতি'ই ক্রমে ক্রমে বিস্তৃত হয়ে 'স্বদেশপ্রীতি'-র রূপ ধারণ করে, রাজ্যপ্রতিষ্ঠা বা রক্ষায় সহায়তা করেছে। স্বদেশ-রক্ষা বা গঠনে নিয়োজিতপ্রাণ এই রকমই চার দম্পতিযুগল : মহেন্দ্র-কল্যাণী, হেমচন্দ্র-মৃণালিনী, মাণিকলাল-নির্মলকুমারী আর রাজসিংহ-চঞ্চলকুমারী।

মহেন্দ্র-কল্যাণী

পদচিহ্ন গ্রামের 'ধনবান' ব্যক্তি মহেন্দ্র সিংহ ও তাঁর স্ত্রী কল্যাণী ১১৭৬ সালের মন্বন্তরের দিনে ঘর ছাড়লেন; সঙ্গে শিশুকন্যা সুকুমারী। ঘটনাচক্রে স্বামী-স্ত্রী ঠাঁই পেলেন 'আনন্দমঠ'-এ। মহেন্দ্রকে ভবানন্দ 'সন্তানধর্ম'-এর শর্তাবলী বুঝিয়ে দিলেন—'এ ব্রত যে গ্রহণ করে, সে স্ত্রী কন্যা পরিত্যাগ করে। তুমি যদি এ ব্রত গ্রহণ কর, তবে স্ত্রী কন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা হইবে না।' (পৃ. ২৫) 'দম্পতিপ্রীতি' ও 'অপত্যপ্রীতি'-তে স্থিত মহেন্দ্র 'সন্তানধর্ম' গ্রহণে অরাজি—'আমি, ব্রত গ্রহণ করিব না।' (পৃ. ২৫) কিন্তু,

কল্যাণী 'বাল্যকালাবধি পুরাণ' (পৃ. ১২) শ্রবণে অভ্যস্ত। ফলে, 'আনন্দমঠ'-এর অর্চা মূর্তি তাঁর অবচেতনে এতই প্রভাব বিস্তার করল যে, সে স্বপ্নে দেখল 'মেঘমণ্ডিতা শীর্ণা স্ত্রী' আর এক 'চতুর্ভুজ' পুরুষ তাকে বলছে—'তুমি স্বামীকে ছাড়িয়া আমার কাছে এস। এই তোমাদের মা, তোমার স্বামী এঁর সেবা করিবে।' (পৃ. ৩১) অনুশীলন ধর্মে 'স্বজনপ্রীতি'-র সঙ্গে 'দম্পতিপ্রীতি'-র বিরোধ নেই; আর 'সন্তানধর্ম'-এ মাতৃসেবা করতে গেলে দাম্পত্যভঙ্গ করতে হয়! কল্যাণীকে সাময়িকভাবে 'সন্তানধর্ম' আচ্ছন্ন করে দিল।

বিষপানে আত্মহত্যা করল কল্যাণী। মৃত্যুমুহূর্তে স্বামীকে বললে—'ছার স্ত্রীলোকের জন্য পাছে তুমি দেবতার কাজে অযত্ন কর।' (পৃ. ৩৩) কল্যাণীর বিশ্বাস স্ত্রী 'সহধর্মিণী' বটে, কিন্তু—'ছোট ছোট ধর্মে। বড় বড় ধর্মে কন্টক।' (পৃ. ৭৯) বোঝা যায়, কল্যাণীর 'দম্পতিপ্রীতি'-র অনুশীলনে খাদ আছে। কিন্তু, মহেন্দ্রের নেই। তাই মৃত্যুপথযাত্রিনী স্ত্রীকে সে বলে—'কল্যাণী, আমার সব! কেন তুমি এমন কাজ করিলে! যে হাতের জোরে আমি তরবারি ধরিতাম, সেই হাতই ত কাটিলে! তুমি ছাড়া আমি কি!' (পৃ. ৩৩) মহেন্দ্রের প্রীতিবৃত্তি অনুশীলিত বলেই, সত্যানন্দ যখন দীক্ষার আগে মহেন্দ্রকে বলেন—'পুত্র কলত্রের মুখ দেখিলেই আমরা দেবতার কাজ ভুলিয়া যাই।' (পৃ. ৫৯) তখন মহেন্দ্রের উল্টো-চালের অব্যর্থ প্রশ্ন—'তাহা না দেখিলেই কি কন্যাকে ভুলিব?' (পৃ. ৫৯)—'সন্তানধর্ম'-এর 'অভ্যাস'-এর প্রায়োগিক ব্যর্থতাকেই ধরিয়ে দেয়।

মহেন্দ্রের মন থেকে 'সন্তানধর্ম'-এর 'অভ্যাস' কোনোদিনই মুছে দিতে পারেনি 'দম্পতিপ্রীতি'-র অনুশীলন-কে। কল্যাণীর ক্ষেত্রে 'সন্তানধর্ম' সামান্য সময়ের জন্য তার দাম্পত্যে রাহুচ্ছায়া ফেললেও, অচিরেই গ্রাস-মুক্তি ঘটেছে তাঁরও। প্রাণ ফিরিয়ে দিয়ে চার বছর ব্যাপী তাঁকে প্রেম নিবেদন করেছে ভবানন্দ। আর সেই 'কামবৃত্তি'কে অ-করুণ দৃঢ়তায় প্রতিহত করে গেছে কল্যাণী—'আমি তাঁর পক্ষে মৃত, তিনি আমার পক্ষে নন।... মরিলে কি সম্বন্ধ যায়?' (পৃ. ৭৮) ফলে, যুদ্ধান্তে পুনর্মিলন ঘটে মহেন্দ্র-কল্যাণীর। 'সন্তানের দেশ' (পৃ. ১১৫)-কে 'বাহুবলে' 'রাখিবার' (পৃ. ১১৫) ভার পড়ে মহেন্দ্রের উপরেই। 'সন্তানধর্ম' নয়, দেশরক্ষার জন্য শেষ পর্যন্ত 'অনুশীলন ধর্ম'-এই আস্থা রাখতে হয় সত্যানন্দকে।

মৃণালিনী-হেমচন্দ্র

মগধের রাজপুত্র হেমচন্দ্র আর বৌদ্ধ শ্রেষ্ঠীকন্যা মৃণালিনীর বিবাহ হয় লোকচক্ষুর অন্তরালে—'আমি, হেমচন্দ্র, দিগ্বিজয়, কুলপুরোহিত আর অরুন্ধতী মাসী ভিন্ন এ বিবাহ আর কেহ জানিত না।' (পৃ. ১০৮) রূপমুগ্ধতাকে পেরিয়ে যাওয়া 'দম্পতিপ্রীতি'-ই হেমচন্দ্র-মৃণালিনীর যুগল-যাপনের সারসত্য। হেমচন্দ্রের অতীত স্মৃতিতেও তাই ধরা পড়ে, শুধুমাত্রই মৃণালিনীর 'গুণ'-এর কথা, 'রূপ'-এর মোহ নয় ঃ

ঘটনা ঃ এক
হেমচন্দ্র মৃণালিনীকে 'আম্রফলে' লিপি লিখে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। তা মৃণালিনীর কানে লেগে, রক্তপাত হয়েছিল। মৃণালিনী ভ্রূক্ষেপ না করে, আম্রলিপি পড়ে, তার উত্তর লিখে, হেমচন্দ্রকে পাঠিয়েছিল।
ঘটনা ঃ দুই
মৃণালিনীকে বিছে কামড়েছিল। দাসী ওষুধের খোঁজে গেছে, ইত্যবসরে উপবনে হেমচন্দ্র হাজির। মৃণালিনী সেই যন্ত্রণা নিয়েই হেমচন্দ্রের সাক্ষাতে এসেছিল।
ঘটনা ঃ তিন
হেমচন্দ্র 'গুরু' দর্শনে যাওয়ার পথে অসুস্থ হয়ে এক পান্থনিবাসে আশ্রয় নেন। মৃণালিনী জানতে পেরে 'ধাত্রী'কে নিয়ে 'এক যোজন' পথ হেঁটে এসে হেমচন্দ্রের সেবা করে বাড়ি ফিরে গিয়েছিল। তাঁর 'চরণ ক্ষতবিক্ষত' হয়েছিল, সে বাড়ি ফিরে স্বয়ং অসুস্থ হয়ে পড়ে।

'বিষবৃক্ষ'-এ হরদেব ঘোষাল বলবেন—'গুণজনিত প্রণয় চিরস্থায়ী' (পৃ. ৯০)। ফলে রূপমুগ্ধতায় পদস্খলন হেমচন্দ্রের বিধিলিপি নয়। মনোরমাকে দেখে মৃণালিনীর প্রথমবার মনে হয়েছে—'আমার প্রভু যদি রূপে বশীভূত হয়েন, তবে আমার সুখের নিশি প্রভাত হইয়াছে।' (পৃ. ৬১) এক মুহূর্তের জন্য শঙ্কাও হয়েছে—'একি হেমচন্দ্রের মনোরমা?' (পৃ. ৬২) কিন্তু, 'দম্পতিপ্রীতি' যাঁর মজ্জাগত, তাঁর ভ্রান্তি-অপনোদনেও সময় লাগেনি বেশি—'মনোরমা যেই হউক, হেমচন্দ্র আমারই।' (পৃ. ৬২) লক্ষণীয় বাচনভঙ্গিটি : 'আমি' হেমচন্দ্রের না, 'হেমচন্দ্র আমারই'! 'দম্পতিপ্রীতি'-র অধিকারবোধ।

কিন্তু, হেমচন্দ্রের তরফে এই 'দম্পতিপ্রীতি'তে কিছু সমস্যা আছে। কেমন তা? 'দম্পতিপ্রীতি'-র অন্তর্গত যে 'কামবৃত্তি', হেমচন্দ্রের ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ অনুশীলিত নয়। ফলে হেমচন্দ্র একটু বেশিই মৃণালিনী-লুব্ধ। মাধবাচার্য্যের অভিযোগ এই বিষয়েই—'যবন-নিপাত তোমার একমাত্র ধ্যানস্বরূপ হওয়া উচিত। এখন মৃণালিনী তোমার মন অধিকার করিবে কেন? একবার তুমি মৃণালিনীর আশায় মথুরায় বসিয়া ছিলে বলিয়া তোমার বাপের রাজ্য হারাইয়াছ; যবনাগমনকালে হেমচন্দ্র যদি মথুরায় না থাকিয়া মগধে থাকিত, তবে মগধজয় কেন হইবে'? (পৃ. ৫) হেমচন্দ্রের মৃণালিনী-লাভে উদ্বেল 'কামবৃত্তি' অসংযত বলেই, যে গুরু 'দ্বাদশ বর্ষ দেবারাধনা' ত্যাগ করে তাকে 'সকল বিদ্যা' দান করেছেন, তাকে মৃণালিনীর হত্যাকারী মনে করে এক লহমায় হেমচন্দ্রের 'দুষ্ক্রিয়া' সাধনের প্রবৃত্তি জেগে ওঠে—'যে মৃণালিনীর বধকর্ত্তা, সে আমার বধ্য। এই শরে গুরুহত্যা ব্রহ্মহত্যা উভয় দুষ্ক্রিয়া সাধন করিব।' (পৃ. ৬) 'দম্পতিপ্রীতি'-র অন্তর্গত এই অননুশীলিত 'কামবৃত্তি'র পিছুটানেই আসে সংশয় ও ভ্রান্তি।

প্রথমে গিরিজায়ার থেকে মৃণালিনীর মিথ্যা বিবাহ-সমাচার, পরে মাধবাচার্য্যের থেকে মৃণালিনীর কলঙ্ক-সংবাদ শোনার পর হেমচন্দ্রের প্রতিক্রিয়া—'মৃণালিনীকে এই শূলে বিদ্ধ করিব।' (পৃ.৬৯) কিন্তু 'দম্পতিপ্রীতি'-তে 'মেঘোদয়' ঘটতে পারে, চিরবিচ্ছেদ নয়। তাই মৃণালিনীকে 'কুলটা' ভেবেও— 'হেমচন্দ্র রোদন করিতেছিলেন,—যাহাকে পাপিষ্ঠা, মনে স্থান দিবার অযোগ্যা বলিয়া জানিয়াছিলেন, তাহার জন্য রোদন করিতেছিলেন।' (পৃ.৭৯) 'যবনবিপ্লব' ও 'গৌড়জয়'-এর রাত্রেই মুমূর্ষু ব্যোমকেশের থেকে মৃণালিনীর চরিত্রশুদ্ধির শংসাপত্র পেলেন হেমচন্দ্র। 'দম্পতিপ্রীতি'-র উপর থেকে 'মেঘ' কেটে গিয়ে 'রৌদ্র' ঝলমল করে উঠল; দাম্পত্যে পুনর্স্থিত হল পুরুষটি—'আর একবার ক্ষমা কর—আর কখনও তোমায় ত্যাগ করিব না।' (পৃ.১০৫) এরপর মাধবাচার্য্যের কাছে অনন্যব্রত দাম্পত্যের গুণগানে 'মুক্তকণ্ঠ' হবেন হেমচন্দ্র—'মৃণালিনী অত্যাজ্যা। তিনি আমার পরিণীতা স্ত্রী।' (পৃ. ১১১) লক্ষণীয় 'অত্যাজ্যা' শব্দটি। কোনভাবেই যাকে ত্যাগ করা সম্ভব না। 'দম্পতিপ্রীতি'-র সারশব্দ। মনে করা যাক 'উত্তরচরিত'-এর বঙ্কিম-ভাষ্য—'ভাল বাসুক বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে সহজে বিসর্জ্জন করিতে পারে?' (পৃ.৪)

হেমচন্দ্রের অননুশীলিত 'দম্পতিপ্রীতি' একদা তাঁর 'স্বদেশপ্রীতি'র অন্তরায় হয়েছিল। সে পিতৃরাজ্য রক্ষায় বিফল হয়েছিল। কিন্তু আজ তাঁর 'দম্পতিপ্রীতি' অনুশীলিত। 'কল্যাণস্বরূপা' স্ত্রী মৃণালিনী শুধরে দিয়েছে তার সব 'ভ্রম-প্রমাদ'। আর 'কুললক্ষ্মী' যাঁর অঙ্কগত হয়েছে, 'রাজ্যলক্ষ্মী' কি কৃপা করবে না তাঁকে? ফলে, হেমচন্দ্রও 'দক্ষিণে সমুদ্রের উপকূলে' 'রাজ্যসংস্থাপন' (পৃ.১১৯) করেন, যে রাজ্যে 'মহিষী' (পৃ. ১১৯) মৃণালিনীই। হেমচন্দ্রের 'দম্পতিপ্রীতি'-ই 'স্বজনপ্রীতি'-র সোপান বেয়ে উত্তরিত হয় 'স্বদেশপ্রীতি'-তে। দু'টি মাত্র উদাহরণই যথেষ্ট ঃ

স্বজনপ্রীতি
'রত্নময়ী এক সম্পন্ন পাটনীকে বিবাহ করিয়া হেমচন্দ্রের নূতন রাজ্যে গিয়া বাস করিল। তথায় মৃণালিনীর অনুগ্রহে তাহার স্বামীর বিশেষ সৌষ্ঠব হইল।... মৃণালিনী... মণিমালিনীকে আপন রাজধানীতে আনাইলেন।... তাঁহার স্বামী রাজবাটীর পৌরোহিত্যে নিযুক্ত হইলেন।' (পৃ.১২০)
স্বদেশপ্রীতি
'অতি শীঘ্র ক্ষুদ্র রাজ্যটি সৌষ্ঠবান্বিত হইয়া উঠিল। ক্রমে ক্রমে সেনা সংগ্রহ হইতে লাগিল।.... হেমচন্দ্র দক্ষিণ হইতে মুসলমানের প্রতিকূলতা করিতে লাগিলেন।' (পৃ.১১৯-১২০)

মাণিকলাল-নির্মলকুমারী

'রাজসিংহ' উপন্যাসের 'উপসংহার'-এ বঙ্কিম লেখেন—'রাজা যেরূপ হয়েন, রাজানুচর এবং রাজপৌরজন প্রভৃতিও সেইরূপ হয়।' (পৃ. ১৯২) 'রাজা'র কথা পরে হবে, আপাতত 'রাজানুচর'-এর কথা। 'রাণা'

রাজসিংহের অনুগত অনুচর মাণিকলাল সিংহ। আর রূপনগরের রাজকুমারী চঞ্চলকুমারীর 'সহোদরাধিকা' (পৃ.৬২) সখী নির্মলকুমারী। চঞ্চলকুমারীর স্বজাতিপ্রিয়তা দিয়েই উপন্যাস শুরু। ঔরঙ্গজেবের 'চিত্রদলন' তারই প্রমাণ। এমন রাজকুমারীর সখী কেমন? নির্মলের কাউকে বিয়ে করতে ইচ্ছা হয় কি না, চঞ্চলের এই প্রশ্নের উত্তরে, সে বলে—'ঔরঙ্গজেবকে' (পৃ.৩৬)। কেন? নির্মলের জবাব—'বদ্‌জাতকে বশ করিতেই আমার আনন্দ। তোমার মনে নাই, আমি বাঘ পুষিতাম? আমি একদিন না একদিন ঔরঙ্গজেবকে বিবাহ করিব ইচ্ছা আছে।' (পৃ.৩৪) তবে কি নির্মলের 'দম্পতিপ্রীতি'-র আলম্বন ঔরঙ্গজেব? না, তা কখনোই নয়। 'স্বদেশপ্রীতি' যার মজ্জাগত, সেই নির্মলের ঔরঙ্গজেবের প্রতি মনোভাবকে আর যাই হোক 'দম্পতিপ্রীতি' বলা সম্ভব নয়—'আমি ঔরঙ্গজেবকে ভজিয়াছি, যেমন বেড়াল ইন্দুর ভজে।' (পৃ.৩৫) অর্থ স্পষ্ট। এহেন নির্মলের সঙ্গে আলাপ হয় রাণার 'ভৃত্য' মাণিকলালের।

মাণিকলাল বিপত্নীক। একটি কন্যাসন্তানের পিতা। রাণার কাজে, যাত্রা-পথে মাণিকলাল 'একটি ছোট রকম লাভ করিল।' (পৃ.১০২) কী সেই লাভ? 'অতিশয় সুন্দরী' (পৃ.১০২) নির্মলকে পথের পাশে দেখতে পেল সে। প্রথম আলাপেই মাণিকলালের সপাট প্রশ্ন—'হ্যাঁ গা! তোমার বিবাহ হইয়াছে?' (পৃ.১০৩) নঞর্থক উত্তর শুনে, অতঃপর জাতি-কুল জেনেই মাণিকলালের প্রস্তাব—'আমিও রাজপুতের ছেলে। আমারও স্ত্রী নাই। আমার একটি ছোট মেয়ে আছে, তার একটি মা খুঁজি। তুমি তার মা হইবে? আমায় বিবাহ করিবে?' (পৃ.১০৩) মাণিকলাল 'অনুশীলিত'। তাই 'কামবৃত্তি' নয়, তাঁর যাচ্‌ঞা একেবারে 'দম্পতিপ্রীতি'। অবস্থা উভয়পক্ষেই এক। সত্বর নির্মলকুমারীও তাই রাজি।

অচিরেই রাণা ও রাজকুমারীর সেবায় মনোনিবেশ করে এই নববিবাহিত দম্পতি। কেমন তাদের দাম্পত্য?—'নূতন প্রণয়, নূতন সুখ' (পৃ.১১৫)। মাণিকলালের 'সংসারসৌন্দর্য্যের প্রতিমা' নির্মলকুমারী—'ইঃ! আমি যাই মেয়ে, তাই তার সংসার চলে।' (পৃ.১২১) 'অনন্যব্রত' এই 'দম্পতিপ্রীতি'। একে অপরের কাছে, কোন কথাই লুকায় না তারা। ফলে ঔরঙ্গজেব-নির্মলকুমারী-সংবাদ-এর সবটাই জানে মাণিকলাল—'নি। কাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিব? তুমি কি আমার যুদ্ধের যোগ্য? মাণিক। তা ত নই। কিন্তু আলম্‌গীর বাদশাহ? নি। আমি তাঁর ইম্‌লি বেগম—তাঁর সঙ্গে কি যুদ্ধের সম্বন্ধ?' (পৃ.১৭৫) এই 'দম্পতিপ্রীতি' এরপর হয়ে ওঠে উপন্যাসের চালিকাশক্তি। রাজসিংহের রাজ্য-সংস্থাপনের রাজসূয় যজ্ঞের অগ্নি-প্রজ্জ্বলনের প্রাথমিক অত্যাবশ্যকীয় উপাদান যে 'অরণিকাষ্ঠ', তা তাই মাণিকলাল-নির্মলকুমারীই। মাণিকলাল—'অরণিকাষ্ঠ-পুরুরবা' (পৃ.১২১) আর নির্মলকুমারী 'অরণিকাষ্ঠ- উর্ব্বশী' (পৃ.১২০)।

শেষ নয় এখানেই। 'ধর্মতত্ত্ব' মতে 'দম্পতিপ্রীতি' উপযুক্ত রূপে অনুশীলিত হলে, ক্রমে ক্রমে 'স্বজনপ্রীতি' এবং 'স্বদেশপ্রীতি'-র সোপান পেরিয়ে সর্বোচ্চ 'জাগতিক প্রীতি'-তে পর্যবসিত হতে পারে। মাণিকলাল-নির্মলকুমারীর ক্ষেত্রে অনায়াসলব্ধ এই ত্রিস্তরীয় উর্দ্ধায়ন ঃ

স্বজনপ্রীতি
নির্মল অবরুদ্ধ বাদশাহের পত্র পেয়ে বলে—'আর কিছু না পারি, বাদশাহের জন্য আর যোধপুরী বেগমের জন্য কিছু খাদ্য পাঠাইয়া দিব।' (পৃ.১৭৫) 'যোধপুরী বেগম' তো 'স্বজন' বটেই, এমনকী একবার 'পোড়া পাহাড়ের মত হৃদয়' সামনে খুলে ধরেছিল যে 'বাদশাহ' আলমগীর, তিনিও 'ইমলি বেগমে'র 'স্বজন' বৈকি।
স্বদেশপ্রীতি
ঔরঙ্গজেব 'অবধ্য' দূতকেও বধ করেন। তবে দেশের জন্য প্রাণ দিতে কে যাবে তাঁর সামনে?—'তখন মাণিকলাল আসিয়া, প্রার্থনা করিল যে, আমাকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করা হউক।' (পৃ.১২০) আর নির্মলকুমারী? চঞ্চলকুমারীর তামাক সাজার নিমন্ত্রণ উদিপুরীকে পৌঁছে দেবে কে?—'হাসিতে হাসিতে নির্মলও পত্র লইয়া চলিয়া গেল।' (পৃ.১২১) আক্ষরিক অর্থেই 'স্বদেশব্রত'-এ দীক্ষিত এই দম্পতি 'নিবেদিতপ্রাণ'।
জাগতিক প্রীতি
'যুদ্ধে লক্ষ জনকে মারিলেও দেখিয়া দুঃখ হয় না। বসিয়া বসিয়া অনাহারে একজন লোকও মরিলে দুঃখ হয়।' (পৃ.১৭৬) একথা মাণিকলালের। কাদের সম্পর্কে? শত্রুপক্ষের মোগলসৈন্য সম্পর্কে। 'ধর্মতত্ত্ব' পড়েছিলেন কি মাণিকলাল?' —'যে আক্রমণকারী, তাহা হইতে আত্মরক্ষা করিব, কিন্তু তাহার প্রতি প্রীতিশূন্য কেন হইব?' (পৃ.১২৫) 'জাগতিক প্রীতি' সম্পর্কে এই মত 'ধর্মতত্ত্ব'কারের।

রাজসিংহ ও চঞ্চলকুমারী

'রাজানুচর'-এর পরে এবার স্বয়ং রাজার কথা। বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনায় 'মনুষ্যত্ব' অর্জনের সাধনাই 'অনুশীলন'। আদর্শ রাষ্ট্রের পরিচালককে তো অবশ্যই অনুশীলিত হতে হবে। রাজসিংহ-চঞ্চলকুমারী কি অনুশীলিত? একটু মেপে নেওয়া যাক 'ধর্মতত্ত্ব'-এর গজকাঠি দিয়ে। প্রথমে রাজসিংহ ঃ

কার্য্যকারিণী বৃত্তি	‘রাজসিংহ রাজনীতিতে ও যুদ্ধনীতিতে অদ্বিতীয় পন্ডিত। মোগল যতক্ষণ না সমস্ত সৈন্য লইয়া রাণার রাজ্য ছাড়িয়া অধিক দূর যায়, ততক্ষণ শিবির ভঙ্গ করেন নাই....।’ (পৃ.১৮৭)
জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি	রাজসিংহ চঞ্চলকে বলেন—‘শাস্ত্রে বলে, ‘বৃদ্ধস্য তরুণী বিষম্।’ (পৃ.১১২) আরো বলেন—‘শুনিয়াছি যে, শাস্ত্রে আছে,...—‘ঋণকারী পিতা শত্রুর্মাতা চ ব্যাভিচারিণী।” (পৃ.১১১) এ’সবই তাঁর ‘জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি’র প্রমাণ।
চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি	‘ধর্মতত্ত্ব’ মতে ‘কাব্যই চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলনের শ্রেষ্ঠ উপায়।’ (পৃ. ১৩৪) চঞ্চলকুমারীর সঙ্গে আলাপে ‘অভিজ্ঞানশকুন্তলম্’-এর ইঙ্গিত এসেছে। কাব্যপাঠে ‘চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি’ অনুশীলিত না হলে, রাজসিংহ কি এর অর্থোদ্ধার করতে পারতেন?

এবার চঞ্চলকুমারীর পালা। দেখা যাক কতখানি অনুশীলিত রূপনগরের রাজকুমারী ঃ

কার্য্যকারিণী বৃত্তি	‘অগত্যা উদিপুরী স্বীকৃত হইল। বাঁদীরা দেখাইয়া দিল। উদিপুরী চঞ্চলকুমারীর জন্য তামাকু সাজিল।’ (পৃ.১৮১) —এ’সবই চঞ্চলকুমারীর কৌশলে।
জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি	‘মেবারের ঘরানা’-র ইতিহাস থেকে ‘মহারানী পদ্মিনীর কথা’ (পৃ.১১১) অবধি রাজপুতানার ইতিহাস সম্পর্কে ভালোই জ্ঞান আছে চঞ্চলকুমারীর।
চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি	‘গৌরী সম্‌ঝে ভসমভার,/পিয়ারী সম্‌ঝে কালা।’ (পৃ.৩৫) চঞ্চলকুমারীর গলাতেই আমরা এই গান শুনেছি। আর যদি এটি তার স্বরচিত হয়, তবে সে কবিও বটে।

‘কার্য্যকারিণী’, ‘জ্ঞানার্জ্জনী’ আর ‘চিত্তরঞ্জিনী’ মিলেই তো নিয়ন্ত্রণ করে, ‘শারীরিকী’ বৃত্তিগুলিকে। সেই শারীরিকী বৃত্তিনিচয়ের অন্যতম ‘কামাদি রিপু’। রাজসিংহ-চঞ্চলকুমারীর এই ‘বৃত্তি’টিও অনুশীলিত তো?

হরদেব ঘোষাল ‘বিষবৃক্ষ’-এ বলেছিলেন, ‘রূপ’ নয়, ‘প্রকৃত ভালোবাসা’ ‘গুণ’ গ্রহণের মাধ্যমে জন্মে থাকে। উপন্যাসের শুরুতেই আমরা দেখব চঞ্চলকুমারীর পূর্বরাগ; চিত্রদর্শনে—‘চিত্র হাতে লইয়া রাজকুমারী অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; দেখিতে দেখিতে তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইল; লোচন বিস্ফারিত হইল।’ (পৃ.৩২) কী দেখলেন চঞ্চলকুমারী? রাজসিংহের রূপ? কিন্তু রাজসিংহ তো ‘যুবা পুরুষ’ (পৃ.৩২) নন, এমনকী ‘খুব সুপুরুষ, তাও নয়।’ (পৃ.৩৫) মোদ্দা কথা, রূপে রাজসিংহ চঞ্চলকে ভোলাননি। তবে? চঞ্চল দেখেছে গুণ। রাজসিংহের গুণ, মেবারের ঘরানার গুণ—‘আমি এ বিপদে সেই সংগ্রাম, প্রতাপের বংশতিলকেরই শরণ লইব—তিনি কি আমায় রক্ষা করিবেন না? দেখ সখি, এ রাজকান্তি

দেখিয়া তোমার কি বিশ্বাস হয় না যে, ইনি অগতির গতি, অনাথার রক্ষক?' (পৃ.৬২) চঞ্চল যে রাজসিংহের রূপে নয়, গুণে মুগ্ধ, সেই বার্তা তাঁর গানেও ভেসে আসে ঃ

'গঙ্গাগর্জ্জন শম্ভুজটপর,
ধরণী বৈঠত বাসুকীফণ্মে।
পবন হোয়ত অগুন-সখা,
বীর ভজত যুবতী মন্মে।।' (পৃ.৩৫)

সে 'বীরবালা' (পৃ.৩৫)। ফলে 'বীর'-ই তাঁর কাম্য; রূপবান নয়। চঞ্চলকুমারীর 'শারীরিকী বৃত্তি' অনুশীলিত।

জিতেন্দ্রিয় রাজসিংহও। চঞ্চলকুমারীর 'লোকমনোমোহিনী মূর্ত্তি' (পৃ.১০৯) দেখে এক মুহূর্তের জন্য 'মুগ্ধ' হলেও, তৎক্ষণাৎ 'মোহ পরিত্যাগ' (পৃ.১০৯) করেন। 'রূপ-বহ্নি' তাকে স্পর্শ করতে পারে না। এইসূত্রে ফিরিয়ে পড়া যাক চঞ্চলকুমারী-রাজসিংহের প্রথম নিভৃত আলাপটিকে। সেই আলাপে রাজসিংহ খাড়া করেন এক শাস্ত্রীয় আপত্তি—'তুমি এমন অদ্বিতীয়া রূপবতী বলিয়াই তোমাকে মহিষী করিতে আমি সঙ্কুচিত হইতেছি। শুনিয়াছি যে, শাস্ত্রে আছে, রূপবতী ভার্য্যা শত্রুস্বরূপ—' (পৃ.১১১)। এই আলোচনার সূত্রেই 'রূপ' প্রসঙ্গে তিনদফা আপত্তি তোলেন রাজসিংহ। তিনটিরই অবশ্য যথাযোগ্য জবাব দেয় চঞ্চলকুমারী ঃ

	রাজসিংহের আপত্তি	**চঞ্চলকুমারীর খণ্ডন**
এক.	'ভার্য্যা রূপবতী হইলে, তাহার জন্য বিবাদ বিসংবাদ উপস্থিত হয়।' (পৃ.১১১)	'সুন্দরী মহিষী না থাকিলে রাজারা কি বিবাদ হইতে মুক্তি পান? (পৃ.১১১)
দুই.	'রূপবতী ভার্য্যাতে পুরুষ অত্যন্ত আসক্ত হয়।' (পৃ.১১১)	'রাজারা বহুশত মহিষী কর্ত্তৃক পরিবৃত থাকিয়াও রাজকার্য্যে অমনোযোগী হয়েন না।' (পৃ.১১১)
তিন.	'শাস্ত্রে বলে ''বৃদ্ধস্য তরুণী বিষম্।'' (পৃ.১১১)	'যাহার বাহুতে বল আছে, রাজপুতকন্যার কাছে সেই যুবা।' (পৃ.১১২)

পরীক্ষাশেষে পরীক্ষক রাজসিংহই হার মানেন। মনে করিয়ে দেন এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য—'তুমিই আমার উপযুক্ত মহিষী। তবে তুমি কেবল বিপদে পড়িয়া আমাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলে; এক্ষণে আমার হাত হইতে উদ্ধারের ইচ্ছা রাখ কি না, আমার এই বয়সে তুমি আমাতে অনুরাগিনী হইতে পারিবে কি না, আমার মনে এই সকল সংশয় ছিল। সে সকল সংশয় আজিকার কথাবার্তায় দূর হইয়াছে।' (পৃ.১১২) 'সংশয়' দূরীভূত হয়ে স্বমহিমায় আত্মপ্রকাশ করে আদর্শ এই 'দম্পতিপ্রীতি'।

'ধর্মতত্ত্ব' কারের বক্তব্য একাধিকবার উদ্ধার করেছি আমরা। আদর্শ 'দম্পতিপ্রীতি'-র সোপানে পা রেখে মানুষ ক্রমে ক্রমে 'স্বজনপ্রীতি' 'স্বদেশপ্রীতি' হয়ে শেষতক্ 'জাগতিক প্রীতি'-র সর্বোচ্চ মহিমায় উত্তীর্ণ হতে পারে বলেই বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাস করতেন। রাজসিংহ-চঞ্চলকুমারীর 'দম্পতিপ্রীতি' ক্রমে ক্রমে আরোহণ করেছে এই সোপানগুলিতে ঃ

স্বজনপ্রীতি
রাজপুত সৈন্যরা মোগলদের হাতে নিঃশেষিত হয় দেখে চঞ্চলকুমারী নিজে এগিয়ে এসে দিল্লিতে যেতে চান। মোবারক বোঝে—'নিজের সুখ ত্যাগ করিয়া আপনি রাজপুতের প্রাণরক্ষা করিতে চাহেন।' (পৃ.৯৮) আর যুদ্ধক্ষেত্রে যখন কেবলমাত্র 'যমমন্দিরের পথ খোলা' (পৃ.৯৫) তখন 'পদব্রজে দুইয়ে দুইয়ে রাজপুত চলিল—রাণা সর্ব্বাগ্রে চলিলেন।' (পৃ.৯৬)
স্বদেশপ্রীতি
রাজসিংহ মেবারের রাণা। 'মাড়বারের ঘরানা' (পৃ.৬২) তাঁর শত্রু। কিন্তু, স্বদেশরক্ষার্থে 'রাজসিংহ বিখ্যাত মাড়বারী দুর্গাদাসের সঙ্গে মিলিত হইয়া ঔরঙ্গজেবকে আক্রমণ করিলেন।' (পৃ.১৯১) আর 'মাড়বারের ঘরানা' (পৃ.৬২) হওয়া সত্ত্বেও চঞ্চলকুমারী মেবারের রাণারই 'শরণ' (পৃ.৬২) নেন।
জাগতিক প্রীতি
উদিপুরীকে 'পীড়ন' (পৃ.১৬৯) করতে মন চায়নি চঞ্চলকুমারীর। কেন? কারণ 'বেগম বড় কাতর' (পৃ.১৬৯) অবস্থায় ছিলেন। 'ধর্মতত্ত্ব' স্মরণীয়—'আর্ত্তের প্রতি যে বিশেষ প্রীতিভাব, তাহাই দয়া।' (পৃ.১২৯) আর, রাজসিংহ? তিনি কি করলেন? —'অনেক স্থান অধিকার করিয়া সৌরাষ্ট্র পর্য্যন্ত রাজসিংহের অধিকার স্থাপন করিতেছিলেন, কিন্তু পীড়িত প্রজারা আসিয়া রাজসিংহকে জানাইল। করুণহৃদয় রাজসিংহ তাহাদিগের দুঃখে দুঃখিত হইয়া ভীমসিংহকে ফিরাইয়া আনিলেন। দয়ার অনুরোধে হিন্দুসাম্রাজ্য পুনঃস্থাপিত করিলেন না।' (পৃ.১৯১)

উল্লেখপঞ্জি ঃ

১. মৃদুলকান্তি বসু, বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, এপ্রিল ২০০৩, পৃ.১৫৬।

২. সুকুমার সিকদার, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, অনুষ্টুপ, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ১৭২, ১৭৫।

৩. বিনয় ঘোষ, বাদশাহী আমল, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, শ্রাবণ ১৪০৬, পৃ. ২২।

৪. সুকুমারী ভট্টাচার্য, ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, অনুবাদ নীলাঞ্জনা দত্ত (সিকদার), ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ.১০২।

৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৮-৯৯।

৬. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, শ্রাবণ ১৪০৭, পৃ. ২১৯।

৭. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলার ব্রত, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, ফাল্গুন ১৪০৭, পৃ. ৪৬।

৮. গোপাল হালদার সম্পাদিত, বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড।। সমাজ, বিদ্যাসাগর স্মারক জাতীয় সমিতি, কলিকাতা, ২০শে অগস্ট ১৯৭২, পৃ. ১৫৩।

৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৭।

১০. জয়ন্তী সাহা, বঙ্কিম বীক্ষা, সংবাদ, কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪, পৃ. ৭।

১১. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ভারতীয় দর্শন, প্রথম খণ্ড, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০০৩, পৃ. ৭-৮।

১২. সারদাপ্রসাদ বিদ্যাভূষণ সংকলিত, অনূদিত ও প্রকাশিত, স্তোত্র-রত্নমালা, মনমোহন লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৩৩২ সন, পৃ. ১০৪।

১৩. সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, নবীনচন্দ্র রচনাবলী, আমার জীবন (৩য় খণ্ড), বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা, ২৫ বৈশাখ ১৩৬৬, পৃ. ৬৮।

১৪. নরহরি কবিরাজ সম্পাদিত, উনিশ শতকের বাংলার জাগরণ তর্ক ও বিতর্ক, কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ১৯০।

চতুর্থ অধ্যায়

বঙ্কিমী বহুস্বর

গুরু-শিষ্য সংবাদ ঃ

উনিশ শতকের ছয়ের দশকে বাংলাদেশে মদ্যপান-বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। প্যারীচরণ সরকারের নেতৃত্বে ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বেঙ্গল টেম্পারেন্স সোসাইটি'। ১৮৭০-এ কেশবচন্দ্র সেন যে 'ভারত সংস্কারক সভা' গঠন করেন, তারও অন্যতম কাজ ছিল মদ্যপানের বিরোধিতা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু, সাংবাদিক গিরিশচন্দ্র ঘোষ, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ বহু বিখ্যাত ব্যক্তি মদ্যপানবিরোধী আন্দোলনে নানাভাবে সামিল হন।[১] এই পরিবেশের বাইরে সেদিন বঙ্কিমচন্দ্রও ছিলেন না।

'ধর্মতত্ত্ব'-এ গুরু আর শিষ্যের মধ্যে কথা চলছে 'সামঞ্জস্য ও সুখ' বিষয়ে। 'ইন্দ্রিয়বিশেষ চরিতার্থ' করছে, অথচ তাতে 'বিরাগ' নেই, এমন মানুষের উদাহরণ হিসেবেই শিষ্য টেনে আনেন মদ্যপদের। গুরুর পাল্টা জবাব—'পৃথিবীতে যত দুঃখ আছে, মদ্যপানের অপেক্ষা বড় দুঃখ বুঝি আর নাই।' (পৃ. ৩০) 'শারীরিকী বৃত্তি'-র অনুশীলন বোঝাতে গিয়েও তাই পুনর্বার শিষ্যকে স্মরণ করিয়ে দেন গুরু—'মদ্য নিষেধ করিয়া হিন্দুশাস্ত্রকারেরা ভালই করিয়াছেন।' (পৃ. ৪৫) শিষ্যটি নাছোড়বান্দা। ফিরিয়ে গুরুর কাছে জানতে চায়—'কোন অবস্থাতেই কি মদ্য ব্যবহার্য্য নহে?' (পৃ. ৪৫) 'কম্‌লি' ছাড়ছে না দেখে সবিস্তারে জবাব দিতে বসেন গুরু—'যে পীড়িত ব্যক্তির পীড়া মদ্য ভিন্ন উপশমিত হয় না, তাহার পক্ষে ব্যবহার্য্য হইতে পারে। শীতপ্রধান দেশে বা অন্য দেশে শৈত্যাধিক্য নিবারণ জন্য ব্যবহার্য্য হইলে হইতে পারে। অত্যন্ত শারীরিক ও মানসিক অবসাদকালে ব্যবহার্য্য হইলে হইতে পারে। কিন্তু এ বিধিও চিকিৎসকের নিকট লইতে হইবে... যুদ্ধকালে মদ্য সেবন করা ধর্ম্মানুমত বটে।... মার্কণ্ডেয় পুরাণে পড়া যায় যে, স্বয়ং কালিকা অসুর বধকালে সুরাপান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।... যাই হৌক, মদ্য সেবন সম্বন্ধে আমার মত এই যে, (১) যুদ্ধকালে পরিমিত মদ্য সেবন করিতে পার, (২) পীড়াদিতে সুচিকিৎসকের ব্যবস্থানুসারে সেবন করিতে পার, (৩) অন্য কোন সময় সেবন করা অবিধেয়।' (পৃ. ৪৫-৪৬) সমকালের প্রেক্ষিতে গুরুর মদ্যপান-বিরোধিতা না হয় বুঝলাম। জানতে ইচ্ছা করে, 'ধর্মতত্ত্ব'কার ব্যক্তিগত জীবনে কতটা পালন করতেন ওপরের কথাগুলো? এ-বিষয়ে দু'জন প্রত্যক্ষদর্শীকে তলব করা যাক। তারকনাথ বিশ্বাস এবং নবীনচন্দ্র সেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে দু'জনের সাক্ষ্যই 'ধর্মতত্ত্ব'-এর মদ্যপান-বিরোধী 'গুরু'-র বিপক্ষেঃ

(ক) 'তখন তাঁহার চিত্ত অবিচলিত, স্থির, গম্ভীর। তাহারই কিছুক্ষণ পরে তিনি পার্শ্বস্থ কক্ষে ঢুকিয়া কি একটা বস্তু পান করিয়া আসিলেন। উপস্থিত ছিলাম আমি ও কাঁটালপাড়ার পণ্ডিত রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।'[২]

(খ) 'সন্ধ্যা হইল, ভৃত্য আসিয়া বঙ্কিমবাবুর সম্মুখে দুটি মোমবাতির শেজ রাখিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সুরাদেবী অধিষ্ঠিতা হইলেন, এবং অক্ষয়বাবু ছাড়া আমরা তিন জন তাঁহার সেবা আরম্ভ করিলাম।'[৩]

না-তো বঙ্কিমচন্দ্র শারীরিকভাবে অসুস্থ ছিলেন, না-তো তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে হচ্ছিল, তবু প্রায় নিয়মিতভাবে পরিমিত মদ্যপানের অভ্যাস বঙ্কিম ত্যাগ করতে পারেননি। বোঝা যায়, 'ধর্মতত্ত্ব'-এর 'গুরু' বঙ্কিমচন্দ্র সমাজকে যা-কিছু নৈতিক পাঠ পড়াতে চান, তার সবটা মনে-প্রাণে তিনি নিজেই হয়তো বা মেনে নিতে পারেন না। ফলে বঙ্কিম-মনন যেখানে 'ধর্মতত্ত্ব'-এর নিশ্ছিদ্র কাঠামো গড়ে তোলায় মনোযোগী, বঙ্কিম-মানস সেখানেই ঘটিয়ে দিতে চায় অন্তর্ঘাত। বিশেষত এমনটা ঘটে যৌনতার 'বজ্র আঁটুনি'র ক্ষেত্রেই। রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত হিতকামী যৌনতার যে তত্ত্বকাঠামো 'ধর্মতত্ত্ব' 'কৃষ্ণচরিত্র' 'ভগবদ্গীতা' জুড়ে তৈরি হয়, যে কাঠামোর প্রয়োগ বঙ্কিম একস্বরিকভাবে লাগাতার তাঁর উপন্যাসে করে চলেন, তাকেই ভিতর থেকে আঘাত করে, ভেঙে তছ্নছ্ করে দিয়ে, অন্য এক বঙ্কিম বারবার তাঁর উপন্যাসে তুলে আনেন ভিন্ন সব স্বর, অন্য সব সুর। 'গুরু' বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে আ-জীবন বিশ্বাসঘাতকতা করে চলেন 'শিল্পী' বঙ্কিমচন্দ্র। সেই বহুস্বরিক, উদার, কিছুটা বা ব্যক্তিগত বঙ্কিমচন্দ্রের সন্ধানেই আমাদের বর্তমান আলোচনা।

অনুশীলন ও 'গৃহিণী' ঃ

'পারিবারিক প্রবন্ধ'-এর প্রাপ্তি-সংবাদ জানিয়ে ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে ১৮৮২ সালের ১৩ নভেম্বর যে চিঠিটি লেখেন বঙ্কিমচন্দ্র, তার একটি বাক্য এইরূপ— 'the true greatness of our women preserve our domestic life from disintegration.' (Pg. 185) আমরা আগেই লক্ষ করেছি সমকালীন জাতীয়তাবাদী চিন্তার ধারায় কীভাবে 'গৃহ' হয়ে উঠছিল 'জাতি' তথা 'রাষ্ট্র'-এর একক, এবং 'গৃহিণী' বা 'গৃহলক্ষ্মী'-ই সমস্ত 'শুভাশুভের মূল'। 'ধর্মতত্ত্ব'-এ 'দম্পতিপ্রীতি'র ব্যাখ্যায় বঙ্কিমও 'গৃহিণী'র মর্যাদা সেভাবেই ধার্য করেন—'স্বামীর সেবা, সুখসাধন ও ধর্ম্মের সহায়তা, ইহাই স্ত্রীর ধর্ম্ম।' (পৃ. ১১৯) আর এই মতের শ্রেষ্ঠ শৈল্পিক প্রকাশ, অবশ্যই 'দেবী চৌধুরাণী'—'এই ধর্ম্মই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম; রাজত্ব স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম নয়। কঠিন ধর্ম্মও এই সংসারধর্ম্ম; ইহার অপেক্ষা কোন যোগই কঠিন নয়।' (পৃ. ১৩৪)

অর্থাৎ, বঙ্কিমচন্দ্রের পরিবার-কল্পনায় মেয়েদের এক এবং একমাত্র স্থান পরিবারের কেন্দ্রীয় চরিত্র রূপে—'সংসারসৌন্দর্য্যের প্রতিমা' (পৃ. ৪)।

বঙ্কিম-উপন্যাসের অধিকাংশ 'গৃহিণী'-ই তাই, তা আমরা আগের অধ্যায়ে লক্ষ করেছি। কিন্তু, সকলেই তো সমান অনুশীলিতা নয়। 'প্রাচীনা এবং নবীনা' প্রবন্ধে বঙ্কিম নিজেও লক্ষ করেছেন তা—'স্ত্রীলোকের প্রথম ধর্ম্ম পাতিব্রত্য। অদ্যাপি বঙ্গ মহিলাগণ পৃথিবীতলে পাতিব্রত্য-ধর্ম্মে তুলনারহিতা। কিন্তু যাহা ছিল তাহা কি আর আছে?' (পৃ. ১৫৭) প্রবন্ধে যেমন, তেমনই এই সংশয় তিনি প্রকাশ করেছেন উপন্যাসের চরিত্রদের মাধ্যমে। সৃষ্টি করেছেন এমন সব 'নবীনা' যাদের 'পাতিব্রত্য' নিয়ে সন্দেহের অবকাশ তৈরি হয়েছে উপন্যাসের পরিসরে। 'অনুশীলন'-এর পরিসর তাদের সামনেও তৈরি করেছেন 'ধর্মতত্ত্ব'কার বঙ্কিমচন্দ্র। সফল হয়েছেন কী শৈবলিনী-ভ্রমর-লবঙ্গলতাদের ক্ষেত্রে?

শৈবলিনী

'ধর্মতত্ত্ব'কার বলেছিলেন—'প্রীতিবৃত্তি পরানুরাগিনী। কেবল আত্মানুরাগিনী প্রীতি প্রীতি নহে।' (পৃ. ১১৫) 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের 'উপক্রমণিকা'তেই আমরা দেখি 'সাত আট বৎসরের' নায়িকা শৈবলিনীকে। বয়স বাড়ার সঙ্গে, শৈবলিনী বুঝল—'প্রতাপ ভিন্ন পৃথিবীতে সুখ নাই।' (পৃ. ১৩) ফলে প্রতাপের সঙ্গে মরণোত্তর মিলনের পরিকল্পনা ও তার রূপায়ণের চেষ্টা। কিন্তু, শেষ মুহূর্তে শৈবলিনী 'ডুবিল না' (পৃ. ১১)। কেন? সে মনে ভাবল—'কেন মরিব? প্রতাপ আমার কে?' (পৃ. ১১) শৈবলিনীর চরিত্রে 'আত্মানুরাগিনী প্রীতি'-ই সর্বব্যাপ্ত; তা-ই তাঁর অননুশীলিত 'কামবৃত্তি।

ঘটনাচক্রে চন্দ্রশেখরের 'গৃহিণী' হলেন শৈবলিনী। জ্ঞানতাপস চন্দ্রশেখরের পক্ষে 'কামবৃত্তি' পরায়ণা শৈবলিনীকে 'সুখ' দেওয়া সম্ভব হয়নি 'আট বৎসর' (পৃ. ১৩)-এ; চন্দ্রশেখর তা বোঝেনও—'এই সুকুমার কুসুমকে কি অতৃপ্ত যৌবনতাপে দগ্ধ করিবার জন্যই বৃন্তচ্যুত করিয়াছিলাম?' (পৃ. ২০) শৈবলিনীও বোঝে তা, সুন্দরীর কাছে নিশ্চয়ই আক্ষেপও করেছে সে-নিয়ে। নচেৎ সুন্দরী এ'সব কথা জানল কেমন করে—'যে স্বামীর মত স্বামী জগতে দুর্লভ, তাঁহার স্নেহে তোমার মন ওঠে না। কি না, বালকে যেমন খেলাঘরের পুতুলকে আদর করে, তিনি স্ত্রীকে সেরূপ আদর করিতে জানেন না।' (পৃ. ২৭) 'অতৃপ্ত যৌবনতাপে' দগ্ধ, অননুশীলিতা শৈবলিনীর 'কামবৃত্তি' এরপর প্রবলভাবে অ-সংযত হয়ে উঠবে, প্রতাপকে কেন্দ্র করেই। কেন? শৈবলিনীর 'প্রতিবাসি-কন্যা' (পৃ. ৪০) সুন্দরীর বোন রূপসীর সঙ্গেই প্রতাপের বিয়ে হয়েছে। ফলে শ্বশুরবাড়িতে আসা-যাওয়ার সুবাদে প্রতাপ শৈবলিনীর দৃষ্টিগোচর হয়েছে। প্রতাপের রূপ 'ধ্যান' করেই 'গৃহ' 'অরণ্য' (পৃ. ৫০) হয়ে উঠেছিল শৈবলিনীর। তাঁর প্রতাপের উদ্দেশ্যে স্পষ্ট অভিযোগ—'কেন

তুমি, তোমার ঐ অতুল্য দেবমূর্ত্তি লইয়া আবার আমায় দেখা দিয়াছিলে? আমার স্ফুটনোন্মুখ যৌবনকালে, ও রূপের জ্যোতি কেন আমার সম্মুখে জ্বালিয়াছিলে?' (পৃ. ৪৯) স্বামী তাঁর কামবাসনার পরিপূর্ত্তি ঘটান না, আর যাঁকে ঘিরে তাঁর 'কামবৃত্তি' একদা উত্তেজিত হয়েছিল, আজ সে-ই রূপবান পূর্ণযুবক রূপে সম্মুখে আগত অথচ অপ্রাপ্য।

শৈবলিনীর 'আত্মানুরাগিনী প্রীতি'-ই তাকে পরিচালিত করল প্রতাপকে পাওয়ার জন্য এক দুঃসাহসিক পদক্ষেপ গ্রহণে। লরেন্স ফষ্টর তাকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে অপহরণ করল। শৈবলিনী ফষ্টরের সঙ্গে গেল, কারণ সে ভেবেছিল ফষ্টরের 'পুরন্দরপুরের কুঠি' (পৃ. ৫৫) আর 'প্রতাপের গৃহ' (পৃ. ৫৫) কাছাকাছি—'কুঠির বাতায়নে বসিয়া কটাক্ষ-জাল পাতিয়া প্রতাপ-পক্ষীকে ধরিব।' (পৃ. ৫৫) 'কামবৃত্তি'র আশ্চর্য প্রকাশ এই বৈতংসী-রূপকে।

শৈবলিনীর এই 'কামবৃত্তি'কে অনুশীলিত করার জন্য আসরে নামলেন দু'জন পুরুষ। প্রথমে, প্রতাপ ও দ্বিতীয়ে রমানন্দ স্বামী। প্রতাপ শৈবলিনীকে 'অগাধ জলে সাঁতার' (পৃ. ৬৯) দিতে দিতে শপথ করালেন—'শুন, তোমার শপথ। আজি হইতে তোমাকে ভুলিব। আজি হইতে আমার সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলি। আজি হইতে আমি মনকে দমন করিব।' (পৃ. ৭২) প্রথম সংস্করণে আরো স্পষ্ট ছিল 'শপথ'-এর অন্তর্নিহিত অ-যৌনীকরণের ভাবনা—'শপথ কর, যে এ জন্মে আমি তোমার ভ্রাতা—তুমি আমার ভগিনী। তুমি আমার কন্যাতুল্যা—আমি তোমার পিতৃতুল্য—তোমার সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধ নাই।' (পৃ. ১৩৭) এর পরেই পর্বতে শৈবলিনীর সাক্ষাৎ রমানন্দ স্বামীর সঙ্গে। 'ধর্মতত্ত্ব'-এর গুরুর ইনি দোসর। 'পরোপকার'-এর মাহাত্ম্য যেভাবে ইনি চন্দ্রশেখরকে বোঝান, তা একেবারেই 'ধর্মতত্ত্ব' অনুমোদিত। এ হেন রমানন্দ স্বামীর উপদেশ অনুসারে শৈবলিনী 'অনন্যেন্দ্রিয়বৃত্তি হইয়া' (পৃ. ৮৩) স্বামীর চিন্তা করতে লাগল। কেমন সেই সাধনা?—'মনুষ্যের ইন্দ্রিয়ের পথ রোধ কর—ইন্দ্রিয় বিলুপ্ত কর—মনকে বাঁধ, —বাঁধিয়া একটি পথে ছাড়িয়া দাও—অন্য পথ বন্ধ কর—মনের শক্তি অপহৃত কর—মন কি করিবে? সেই এক পথে যাইবে—তাহাতে স্থির হইবে—তাহাতে মজিবে।' (পৃ. ৮৫) 'ধর্মতত্ত্ব'কার বলেছিলেন—'পাশব বৃত্তিসকল স্বতঃস্ফূর্ত্ত। যাহা স্বতঃস্ফূর্ত, তাহার দমনই অনুশীলন।' (পৃ. ১১৮) অনুশীলনের এই সমাজহিতকামী 'দমন' আদতেই মনের পক্ষে ভালো তো? ভালো যে নয়, তারই প্রমাণ শৈবলিনী। 'কামবৃত্তি'র 'দমন' তাই বিকৃতবুদ্ধি করে তুলল শৈবলিনীকে।

রমানন্দ স্বামীর 'যোগবল' (পৃ. ১১৮) তাকে সুস্থ করে তুলল। 'ধর্মতত্ত্ব'-এর অনুশীলনকে মিথ্যা প্রমাণ করেই সুস্থ শৈবলিনী প্রতাপকে বলে—'যত দিন তুমি এ পৃথিবীতে থাকিবে, আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করিও

না। স্ত্রীলোকের চিত্ত অতি অসার; কত দিন বশে থাকিবে জানি না। এ জন্মে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না।' (পৃ. ১২৮) শৈবলিনী সেই 'পতঙ্গবৃত্ত' নারী, প্রতাপ যার 'রূপ-বহ্নি'। আগুন যতক্ষণ জ্বলবে, পতঙ্গও ততক্ষণ 'বহ্নিমুখবিবিক্ষুঃ' থাকবে। 'অনুশীলন তত্ত্ব'-কে নির্জিত করে জেগে থাকে শৈবলিনীর 'কামবৃত্তি'; তাঁর 'রূপ-ভোগলালসা' প্রমাণ করে দেয় 'ধর্মতত্ত্ব'-এর জবরদস্তির অসারতাকে।

এখান থেকেই একটি সঙ্গত প্রশ্নের খসড়া তৈরি করে নেওয়া যাক বঙ্কিমচন্দ্রের কখনো না দিতে-পারা উত্তরের অপেক্ষায়। শৈবলিনীর পক্ষে প্রতাপকে ভুলতে পারা সম্ভব নয়। তার মানে, এরপর সে চন্দ্রশেখরের 'গৃহিণী' হবে প্রতাপকে মনে নিয়েই? এই মানসিক দ্বিচারিতার কোনো প্রতিষেধক কি আছে 'ধর্মতত্ত্ব'-এর ঝুলিতে?

ভ্রমর

দাম্পত্য বঙ্কিমচন্দ্রের বাচনে সবসময়ই 'দম্পতিপ্রীতি'। আর 'প্রীতি = সখ্য' (পৃ. ৫৩) এমন একটা সহজ সমীকরণও তিনিই তৈরি করেন 'ধর্মতত্ত্ব'-এ। অর্থাৎ 'দম্পতিপ্রীতি'-তে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ 'সখ্য'-এর সমানাধিকারে বিন্যস্ত। 'ধর্মতত্ত্ব'-এ তাই বঙ্কিম জানাবেন যে স্বামী-স্ত্রী একে-অপরকে 'ভক্তি' করবে—'স্বামী সকল বিষয়েই স্ত্রীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তিনি ভক্তির পাত্র। হিন্দুধর্ম্মে ইহাও বলে যে, স্ত্রীরও স্বামীর ভক্তির পাত্র হওয়া উচিত... যেখানে স্ত্রী স্নেহে, ধর্ম্মে বা পবিত্রতায় শ্রেষ্ঠ, সেখানে তাঁহারও স্বামীর ভক্তির পাত্র হওয়া উচিত বটে।' (পৃ. ৫৩-৫৪) 'ভক্তি'-র নিরিখে স্বামী-স্ত্রীর এই আপাত-সাম্য রচনার তলে-তলেই বঙ্কিম কিন্তু জিইয়ে রাখলেন সনাতন সেই পুরুষতান্ত্রিক অ-সাম্য— 'স্বামী সকল বিষয়েই স্ত্রীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তিনি ভক্তির পাত্র।' (পৃ. ৫৩) এ'কথাটি যে কতদূর মিথ্যা, তা তো বঙ্কিম জানতেন। 'Rajmohan's wife' উপন্যাসে সকল কুকীর্তির নায়ক মথুর ঘোষ যে তাঁর স্ত্রী তারার প্রণয়ের যোগ্য ছিল না, এ'কথা তো স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রই লিখেছেন—'Tara mourned in solitude the terrrible end of a husband who had proved himself so little worthy of her love.' (Pg. 88) তার মানে স্বামীকেও স্ত্রীর যোগ্য হয়ে উঠতে হয়; 'সকল বিষয়েই' তিনি 'শ্রেষ্ঠ', তাই তিনি 'ভক্তির পাত্র'—এমনটা না-ও হতে পারেন স্বামী-মহাশয়। আর ঠিক এই কথাটাই যদি স্বামীর মুখের উপর ছুঁড়ে দেন, স্বয়ং তাঁর স্ত্রী? কেমন হবে তবে সেই নারীর 'অনুশীলন'? তার জন্য কী দাওয়াই বাত্‌লাবে 'ধর্মতত্ত্ব'? 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর ভ্রমর দাসী 'ধর্মতত্ত্ব'-এর একস্বরিক কাঠামোর মূর্তিমতী প্রতিবাদ।

বাবু গোবিন্দলাল রায়ের স্ত্রী ভ্রমর। বাবা-মায়ের দেওয়া নাম হয়তো-বা 'কৃষ্ণমোহিনী, কি

কৃষ্ণকামিনী, কি অনঙ্গমঞ্জরী' (পৃ. ২১)। তার যে রূপের কিঞ্চিৎ অভাব আছে, তা শুরুতেই বোঝা যায়—'ভোমরা কালো।' (পৃ. ২১) সেই 'ক্ষুদ্রশরীরা বালিকা' (পৃ. ২১)-র সঙ্গে গোবিন্দলালের দাম্পত্য কেমন? তাদের 'দম্পতিপ্রীতি'-র ভিত্তি বিশ্বাস—'গোবিন্দলালের বিশ্বাসেই ভ্রমরের বিশ্বাস। গোবিন্দলাল তাহা বুঝিয়াছিলেন। ভ্রমরকে চিনিতেন। তাই সে কালো এত ভালোবাসিতেন।' (পৃ. ২৩) ভ্রমরের রূপের অভাব পূরণ করেছিল তার গুণ—অনন্যব্রত সে, স্বামীর প্রতি তার অখণ্ড বিশ্বাস। এই বিশ্বাসটুকু আছে বলেই যখন গোবিন্দলাল রোহিণীকে জেরা করার কথায় বলে—'আমাকে উহার কাছে একা রাখিয়া যাইতে যদি তোমার ভয় হয়, তবে না হয়, আড়াল হইতে শুনিও।' (পৃ. ২৬) তখন, তা শুনে—'ভোমরা বড় অপ্রতিভ হইল। লজ্জায় অধোমুখী হইয়া, ছুটিয়া সে অঞ্চল হইতে পলাইল।' (পৃ. ২৬)

এ'হেন দাম্পত্যে কালো মেঘ ঘনিয়ে এল; রোহিণী। গোবিন্দলাল জেরা করতে গিয়ে রোহিণীর মন বুঝলেন। তখনও 'দম্পতিপ্রীতি'-র দৃঢ় ভিত্তি বিশ্বাস। তাই ঘরে ফিরে স্ত্রীকে অনায়াসে গোবিন্দলাল বললেন—'রোহিণী আমায় ভালবাসে।' (পৃ. ৩৩) আর অটুট বিশ্বাসের জোরেই ভ্রমরের দাবি—'দূর, তা কেন—তা কি পারে' (পৃ. ৩৩)। এরপরই গোবিন্দলাল বারুণীর জল থেকে উদ্ধার করে আনলেন রোহিণীকে; জলাঞ্জলি দিয়ে এলেন দাম্পত্যের 'বিশ্বাস'-এ। রোহিণী তাঁকে ভালবাসে, একথা অনায়াসে স্ত্রীর কাছে কবুল করেছিলেন গোবিন্দলাল। কিন্তু রোহিণীকে প্রাণদান করতে গিয়ে প্রকারান্তরে তাকে চুম্বন করতে হয়েছে, যার আস্বাদ মোহময়, সে কথা কিছুতেই স্ত্রীকে বলে উঠতে পারলেন না বাবু গোবিন্দলাল রায়—'আর একদিন বলিব ভ্রমর—আজ নহে।... তুমি এখন বালিকা, সে কথা বালিকার শুনিয়া কাজ নাই।' (পৃ. ৩৮) ভ্রমরের বুকের ভেতর একখানা 'কালো মেঘ' (পৃ. ৩৮) ঘনিয়ে উঠল; বিশ্বাসহীনতার মেঘ। তবুও বিশ্বস্ত ভ্রমর। গোবিন্দলালের অনুপস্থিতির অবকাশে সেই সন্ধ্যার কথা পাঁচকান হয়ে পৌঁছল ভ্রমরের কাছেও। এত ঠুন্‌কো নয় ভ্রমরের 'দম্পতিপ্রীতি', যে লোকের কানাকানিতে ভেঙে যাবে তা — 'তার মনের ভিতর যে মন, হৃদয়ের যে লুক্কায়িত স্থান কেহ কখনও দেখিত পায় না—যেখানে আত্মপ্রতারণা নাই, সেখান পর্য্যন্ত ভ্রমর দেখিলেন, স্বামীর প্রতি অবিশ্বাস নাই। অবিশ্বাস হয় না।' (পৃ. ৪১)

সেই 'অবিশ্বাস' তার মনে জন্মিয়ে দিল রোহিণী। তাঁর ব্যাপিকা-বৃত্তি ভ্রমরের বিশ্বাসকে গোড়া থেকে উন্মূলিত করল। এরপরই ভ্রমরের সেই বিখ্যাত চিঠির বহুপঠিত পংক্তিগুলির জন্ম হল—'তুমি মনে জান বোধ হয় যে, তোমার প্রতি আমার ভক্তি অচলা—তোমার উপর আমার বিশ্বাস অনন্ত। আমিও তাহা জানিতাম। কিন্তু এখন বুঝিলাম যে, তাহা নহে। যত দিন তুমি ভক্তির যোগ্য, তত দিন আমারও

ভক্তি; যত দিন তুমি বিশ্বাসী, তত দিন আমারও বিশ্বাস। এখন তোমার উপর আমার ভক্তি নাই, বিশ্বাসও নাই।' (পৃ. ৪৫) 'ধর্মতত্ত্ব'-কার বলেছিলেন—'স্বামী সকল বিষয়েই স্ত্রীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তিনি ভক্তির পাত্র।' (পৃ. ৫৩) ভ্রমর দাসী 'ধর্মতত্ত্ব' মানলেন কই?

'বঙ্গদর্শন'-এ ১২৮২ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যা থেকে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ছাপা শুরু হয়। অব্যবহিত পূর্বে ১২৮২-র ভাদ্র সংখ্যায় বঙ্কিম লেখেন 'দ্রৌপদী' নামের এক প্রবন্ধ। সামান্য উদ্ধার করা যাক বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্লেষণ—'দ্রৌপদীর চরিত্রে দুইটি লক্ষণ বিশেষ সুস্পষ্ট—এক ধর্ম্মাচরণ, দ্বিতীয় দর্প। দর্প, ধর্ম্মের কিছু বিরোধী কিন্তু এই দুটি লক্ষণের একাধারে সমাবেশ অপ্রকৃত নহে।... দর্প শব্দে এখানে আত্মশ্লাঘাপ্রিয়তা নির্দ্দেশ করিতেছি না, মানসিক তেজস্বিতাই আমাদের নির্দ্দেশ্য। ... দ্রৌপদীতে ইহা ধর্ম্মবৃদ্ধির কারণ হইয়াছে।' (পৃ. ৬০) এই দ্রৌপদীই এরপর রূপান্তরিত হয়েছেন ভ্রমরে। ফলে স্বামীর প্রতি 'ভক্তি' নেই এ'কথা জানাবার পরই প্রকাশ পায় ভ্রমরের 'দর্প', তাঁর 'মানসিক তেজস্বিতা', যা তাঁর সতীত্ব নামক 'ধর্ম্মবৃদ্ধির কারণ'—'বিনাপরাধে আমাকে ত্যাগ করিতে চাও, কর।—কিন্তু মনে রাখিও, উপরে দেবতা আছেন। মনে রাখিও—এক দিন আমার জন্য তোমাকে কাঁদিতে হইবে। মনে রাখিও—এক দিন তুমি খুঁজিবে, এ পৃথিবীতে অকৃত্রিম আন্তরিক স্নেহ কোথায়?— দেবতা সাক্ষী! যদি আমি সতী হই, কায়মনোবাক্যে তোমার পায়ে আমার ভক্তি থাকে, তবে তোমায় আমায় আবার সাক্ষাৎ হইবে।.... তুমি আমারই—রোহিণীর নও।' (পৃ.৫৮) লক্ষণীয় বিশেষ একটি পংক্তি—'যদি আমি সতী হই, কায়মনোবাক্যে তোমার পায়ে আমার ভক্তি থাকে' (পৃ.৫৮)। যদি ইতঃপূর্বে ভ্রমর স্বামীকে জানিয়েই থাকে যে 'এখন তোমার উপর আমার ভক্তি নাই' (পৃ.৫৩), তাহলে এখন আবার 'ভক্তি' থাকার প্রসঙ্গটি কীভাবে আসে?

এইসূত্রেই একটু আলাদা করে লক্ষ করা যাক বঙ্কিম-কল্পনায়, 'ভক্তি'র অবস্থানকে। 'ধর্মতত্ত্ব'-এ ভক্তি একমাত্রিক। 'যিনিই আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং যাঁহার শ্রেষ্ঠতা হইতে আমরা উপকৃত হই, তিনিই ভক্তির পাত্র।' (পৃ.৫৩) সেই হিসাবে পিতামাতা-গুরু-পুরোহিত-রাজা-রাজপুরুষ আর 'সমাজের শিক্ষক' (পৃ.৫৫) এঁরা সবাই 'ভক্তির পাত্র'। এক্ষেত্রে স্পষ্টতই 'ভক্তি'র মধ্যে কোনো খাদ নেই, তা আন্তরিক। কিন্তু 'সাধারণী' পত্রিকার কার্তিক ১২৮০ সংখ্যায় 'জাতিবৈর' নামের যে প্রবন্ধ লেখেন বঙ্কিমচন্দ্র তাতে তাঁর সুর ভিন্ন। বিজয়ী ইংরেজের প্রতি বিজিত ভারতবাসী 'নম্র আজ্ঞাকারী এবং ভক্তিমান্' (পৃ.৩২৯) বটে, কিন্তু—'আজ্ঞাকারী আমরা বটে, কিন্তু বিনীত নহি এবং হইতেও পারিব না। কেননা, আমরা প্রাচীন জাতি; ....যত দিন এ সকল বিস্মৃত হইতে না পারি, তত দিন বিনীত হইতে পারিব না, মুখে বিনয় করিব, অন্তরে নহে।' (পৃ.৩২৯) অর্থাৎ সোজা কথায় প্রভুর প্রতি মুখে 'ভক্তি' দেখালেও আন্তরিকভাবে

এ সম্পর্ক ভক্তিশূন্য। অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণায় 'ভক্তি'র দুই রূপ : আন্তরিক অর্থাৎ প্রীতিযুক্ত আর সামাজিক অর্থাৎ প্রীতিশূন্য। আশা করি বোঝা যাচ্ছে, ভ্রমর যখন স্বামীকে বলে, 'তোমার উপর আমার ভক্তি নাই'—তখন ভ্রমর 'দম্পতিপ্রীতি'-র অন্তর্গত যে আন্তরিক 'ভক্তি' তার ক্রমবিলীয়মানতার কথা বোঝাতে চায়। আর, যখন ভ্রমর গোবিন্দলালকে বলে, 'যদি আমি সতী হই, কায়মনোবাক্যে তোমার পায়ে আমার ভক্তি থাকে'—তখন সে 'ভক্তি' সামাজিক ভক্তি; নারীর সতীত্বসূচক অহমিকা।

এরপর ভ্রমরের জীবনে এই দুই প্রকার 'ভক্তি'র টানাপোড়েনই চলতে থাকে। আর শেষতক্ জিত হয় ওই আন্তরিকতাহীন 'দম্পতিপ্রীতি'-লেশশূন্য সামাজিক ভক্তির। একটু লক্ষ করা যাক ভ্রমর-গোবিন্দলালের সম্পর্কের শেষ গ্রন্থিটুকু ঃ

তৃতীয় বৎসর ঃ
দিদি যামিনীকে ভ্রমর বলে গোবিন্দলাল ফিরে এলেই তার 'বিপদ' (পৃ.৭৯)। 'বিপদ' কেন?—'যামিনী বুঝিল না যে, গোবিন্দলাল হত্যাকারী, ভ্রমর তাহা ভুলিতে পারিতেছে না।' (পৃ.৭৯) 'রক্ষিতা'কে হত্যা করে ফেরার আসামী বাবু গোবিন্দলাল রায়কে স্বামীরূপে আন্তরিক 'ভক্তি' করা ভ্রমরের পক্ষে সম্ভবপর নয়।
ষষ্ঠ বৎসর ঃ
গোবিন্দলালের চিঠি এল। ভ্রমর 'সহস্র সহস্র বার' (পৃ.৮৪) ভেবে চিঠির 'পাঠ' স্থির করলেন। ' ''সেবিকা'' পাঠ লিখিলেন না।' (পৃ.৮৪) আন্তরিক ভক্তি যখন ছিল তখন ভ্রমর নিজেকে গোবিন্দলালের 'শিষ্যা, আশ্রিতা, প্রতিপালিতা—তোমার দাসানুদাসী' (পৃ.৫৭) ইস্তক বলেছিল। আজ আর ভক্তি নেই, ফলে ভ্রমরও গোবিন্দলালের 'সেবিকা' নন। 'আন্তরিক' ভক্তি গেল, 'সামাজিক' ভক্তি তো রইল। তাই—'স্বামী সকল অবস্থাতেই প্রণম্য; অতএব লিখিলেন, ''প্রণামা শতসহস্র নিবেদনঞ্চ বিশেষ।'' ' (পৃ.৮৪) 'দম্পতিপ্রীতি'-র অন্তর্গত আন্তরিক ভক্তিটুকু পুরোপুরি মুছে গেছে ভ্রমরের মন থেকে। সঙ্গতভাবেই এই চিঠি পড়ে গোবিন্দলালের মনে হওয়া স্বাভাবিক—'কি ভয়ানক পত্র! এতটুকু কোমলতাও নাই।' (পৃ.৮৪)
সপ্তম বৎসর ঃ
মৃত্যুর প্রাক্কালে যামিনীকে ভ্রমরের অনুরোধ—'ইহজন্মে আর একবার দেখি!' (পৃ.৮৬) এ'দেখা 'দম্পতিপ্রীতি'র দেখা নয়। যে ভ্রমর দাবি করেছিলেন 'যদি আমি সতী হই, কায়মনোবাক্যে তোমার পায়ে আমার ভক্তি থাকে, তবে তোমায় আমায় আবার সাক্ষাৎ হইবে' (পৃ.৫৮)—এ'সেই ভ্রমর;

এই শেষ সাক্ষাতের যাচ্ঞা আসলে ভ্রমরের সতীত্বের দাবি পূরণের প্রমাণ মাত্র। আর তাই গোবিন্দলাল দেখা দিলে, ভ্রমর তার চরণস্পর্শ করে বলে—''আজ আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া, আশীর্ব্বাদ করিও, জন্মান্তরে যেন সুখী হই।" (পৃ.৮৭) স্বামীর প্রতি অনন্যব্রত যে স্ত্রীরা, বঙ্কিম-উপন্যাসে তাদের মৃত্যু-মুহূর্তের যাচ্ঞা কেমন? দুটি উদাহরণ লক্ষ করা যাক। প্রথমে আনন্দমঠের কল্যাণী। 'স্বামীর পদরেণু' গ্রহণ করে মৃত্যুর পূর্বে তাঁর কাতরোক্তি—'আমায় আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমি সেই—সেই আলোকময় লোকে গিয়া আবার তোমার দেখা পাই।" (পৃ.৩৩) আর দ্বিতীয় উদাহরণ রমার। সীতারামের 'পায়ের ধূলা' মাথায় নিয়ে রমার শেষ দাবি 'আশীর্ব্বাদ করিও, জন্মান্তরে যেন তোমাকেই পাই।' (পৃ.১৩১) 'বিবাহ'-এর জন্মান্তরীয় বন্ধনে বিশ্বাস করতেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাই তাঁর 'ধর্মতত্ত্ব' মেনে-চলা চরিত্ররাও প্রায়শই মৃত্যুমুহূর্তে স্বামীর কাছে জন্মান্তরীয় বিবাহ-বন্ধনেরই আরজি পেশ করে। ব্যতিক্রম ভ্রমর। জন্মান্তরে স্বামী নয়, সুখ চায় সে! ব্যঞ্জনা স্পষ্ট; এ'জন্মের স্বামীর থেকে 'সুখী' হতে পারেনি ভ্রমর!

'ধর্মতত্ত্ব'-এ 'দম্পতিপ্রীতি'-র যে মান্য কাঠামো গড়ে তুলেছিলেন বঙ্কিম, ভ্রমর দাসী সেই কাঠামোর অন্তর্ঘাত ঘটিয়ে, তাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়। 'অনুশীলন'-এর ব্যর্থতা মূর্ত হয়ে ওঠে ভ্রমরের জীবনকাহিনিতে। কিন্তু, আদতেই তাতে করে খুব দুঃখিত হয়েছিলেন কি বঙ্কিমচন্দ্র? এতবার সংস্করণ করতে ভালোবাসতেন যিনি, তাঁর উপন্যাসগুলিকে, চাইলে তো তিনি বদলাতে পারতেন ভ্রমরকে? চাইলে তো তাকেও সূর্য্যমুখীর ছাঁচে ঢালতে পারতেন? রোহিণী, গোবিন্দলালের যেখানে আদ্যন্ত সংস্কার করেন তিনি, সেখানে ভ্রমর তবে বাদ যায় কেন? সন্দেহ জাগে 'ধর্মতত্ত্ব'-এর একস্বরিক কাঠামোতে হাঁপিয়ে-ওঠা বঙ্কিমচন্দ্রই এই প্রশ্রয়টুকু দেননি তো? না'হলে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার কেনই বা জানাবেন—'স্ত্রী চরিত্রের মধ্যে বঙ্কিমবাবুর নিজের মতে সর্বোৎকৃষ্ট ভ্রমর।'[৪]

লবঙ্গলতা

গঙ্গাতীরবর্তী 'কালিকাপুর' (পৃ.৩০) গ্রামের বাসিন্দা লবঙ্গলতার 'বিবাহের বয়ঃক্রম' (পৃ.৩১) হলে, শান্তিপুরনিবাসী অমরনাথ ঘোষের সঙ্গে তার বিবাহ স্থির হয়। অমরনাথ— 'মধ্যে মধ্যে লবঙ্গকে শিশুবোধ হইতে ''ক''-য়ে করাত, ''খ''-য়ে খরা' (পৃ.৩০)-ও শেখাত। অর্থাৎ, সম্পর্কে তারা গুরু-শিষ্যাও বটে। ইতোমধ্যে অমরনাথের কুলকলঙ্কের কারণে এ'বিয়ে ভেঙে গেলে, লবঙ্গলতার বিয়ে হল জনৈক রামসদয় মিত্রের সঙ্গে। বিবাহের পর অমরনাথ একরাত্রে চোরের মত লবঙ্গ-রূপ-বহ্নি-বিবিক্ষুঃ পতঙ্গ হয়ে, লবঙ্গর

ঘরে প্রবেশ করলে, তাঁর 'কামবৃত্তি'-র উপযুক্ত শাস্তি বিধান করে লবঙ্গলতা। দেশান্তরিত হয় অমরনাথ।

রামসদয় মিত্রের প্রথম পক্ষ—'চিররুগ্না এবং প্রাচীনা।' (পৃ.১১) সে-পক্ষে দুই সন্তান। দ্বিতীয় পক্ষ লবঙ্গলতা—'রামসদয় বাবু প্রাচীন, বয়ঃক্রম ৬৩ বৎসর। ললিতলবঙ্গলতা নবীনা, বয়স ১৯ বৎসর, দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী—আদরের আদরিণী, গৌরবের গৌরবিনী, মানের মানিনী, নয়নের মণি, ষোলআনা গৃহিণী। তিনি রামসদয়ের সিন্দুকের চাবি, বিছানার চাদর, পানের চূন, গেলাসের জল। তিনি রামসদয়ের জ্বরে কুইনাইন, কাসিতে ইপিকা, বাতে ফ্লানেল এবং আরোগ্যে সুরুয়া।' (পৃ.১১) 'উত্তরচরিত'-এর বঙ্কিম-ভাষ্যের স্পষ্টতই ব্যঙ্গানুকরণ এই অংশ। বোঝা যায়, প্রথমা পত্নীই শুধু নন, স্বয়ং রামসদয়ও চিররুগ্ন!

'কৃষ্ণকান্তের উইল' থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিয়ে দিতে চাইছিলেন দাম্পত্যে 'ভক্তি' আর 'প্রীতি' দুয়েরই মিলন ঘটা কাম্য। ভ্রমর গোবিন্দলালকে লেখা চিঠিতে তা-ই বলতে চেয়েছিল যে, তাদের মধ্যে সামাজিক অর্থে 'ভক্তি' আছে, আন্তরিক অর্থে যে 'ভক্তি', যার নামান্তর 'প্রীতি', তা আর অবশিষ্ট নেই। ফলে জীবনের শেষপর্যন্ত ভ্রমর সেই 'কোমলতা'হীন সামাজিক 'ভক্তি'র আচরণটুকু করে চলবে। 'ধর্মতত্ত্ব' মতে—'প্রীতি...ভক্তির অন্তর্গত....ভক্তির অনুশীলনেই প্রীতির অনুশীলন' (পৃ.১২৯)। লক্ষ করা যাক লবঙ্গলতার স্বামীর প্রতি 'ভক্তি'র 'অনুশীলন'কে —'লবঙ্গলতার অশেষ গুণের মধ্যে একটি এই যে, তিনি বাস্তবিক পিতামহের তুল্য সেই স্বামীকে ভালবাসিতেন—কোন নবীনা নবীন স্বামীকে সেরূপ ভালবাসেন কি না সন্দেহ।' (পৃ.১১) লবঙ্গলতা সামাজিকভাবে সাধ্বীশিরোমণি। ফলে 'পিতামহের তুল্য' স্বামীর প্রতি তার 'ভক্তি' প্রশ্নাতীত। কিন্তু 'বাস্তবিক পিতামহের তুল্য' স্বামীকে কি সত্যিই 'ভালবাসিতেন' নবীনা লবঙ্গলতা? একটু লক্ষ করা যাক লবঙ্গলতার স্বামীকেন্দ্রিক অস্বস্তিগুলি ঃ

এক. 'আপন হস্তে নিত্য শুভ্র কেশে কলপ মাখাইয়া কেশগুলি রঞ্জিত করিতেন।' (পৃ.১২)

দুই. 'মলমলের ধুতি' ছাড়িয়ে রামসদয়কে লবঙ্গ পরতে বাধ্য করত—'কোকিলপেড়ে, ফিতে-পেড়ে, কল্কাপেড়ে' (পৃ.১২) ধুতি।

তিন. 'রামসদয় প্রাচীন বয়সে, আতরের শিশি দেখিলে ভয়ে পলাইত —লবঙ্গলতা, তাহার নিদ্রিতাবস্থায় সর্বাঙ্গে আতর মাখাইয়া দিতেন।' (পৃ.১২)

চার. বৃদ্ধ রামসদয়ের 'চস্‌মাগুলি লবঙ্গ প্রায় চুরি করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিত'। (পৃ.১২)

'বাস্তবিক পিতামহের তুল্য' স্বামীকে সত্যিই যদি ভালবেসে থাকে লবঙ্গলতা, তবে তার পিতামহত্ব নিয়ে এত অস্বস্তি কেন 'নবীনা' এই গৃহিণীর? এরপরেও কি বলা চলে এই দাম্পত্য 'অনন্যব্রত'? রামসদয় মিত্রের 'ষোলআনা গৃহিণী' লবঙ্গলতা হতেই পারেন, কিন্তু লবঙ্গলতার জীবনের 'ষোলআনা' কি রামসদয় জুড়ে বসতে পেরেছেন?

এহো বাহ্য। রামসদয়-লবঙ্গর দাম্পত্যের মধ্যে যে 'একাভিসন্ধি'র অভাব আছে, তাও লক্ষ করার মতো। লবঙ্গলতার আত্মকথনে শুনি সন্ন্যাসীর গুণের কথা—'মিত্র মহাশয় ষষ্ঠি বৎসর বয়সে যে, এ পামরীর এত বশীভূত, তাহা আমার গুণে, কি সন্ন্যাসী ঠাকুরের গুণে, তাহা বলিয়া উঠা ভার; আমিও কায়মনোবাক্যে পতিপদসেবার ত্রুটি করি না, ব্রহ্মচারীও আমার জন্য যাগ, যজ্ঞ, তন্ত্র, মন্ত্র প্রয়োগে ত্রুটি করেন না।' (পৃ.৬০) যে 'দম্পতিপ্রীতি' অবিচ্ছিন্ন রাখবার জন্য বাইরে থেকে 'যাগ, যজ্ঞ, তন্ত্র, মন্ত্র'-এর আমদানি করতে হয়, সে কি আদপেই 'দম্পতিপ্রীতি'? বঙ্কিমচন্দ্রের মতে দাম্পত্যের প্রাণভোমরা যে 'একাভিসন্ধি' (পৃ. ৫৪) 'তন্ত্র, মন্ত্র' দিয়ে কি তা বানানো যায়, না রক্ষা করা যায়?

রামসদয়-লবঙ্গলতার এই দাম্পত্যের সামনেই পুনর্বার আবির্ভূত হন অমরনাথ। প্রথম পক্ষের কনিষ্ঠ সন্তান শচীন্দ্রর বিবাহসূত্রে, রজনীর বিবাহপ্রার্থী রূপে অমরনাথের মুখোমুখি হল লবঙ্গলতা। লবঙ্গলতা ভেবেছিল রজনী সম্পত্তি মিত্রদের দান করে দিতে চাইলে বুঝি অমরনাথ 'আগুনে সেঁকা কলাপাতার মত শুকাইয়া উঠিবে।' (পৃ.৬৬) কিন্তু, তেমনটা ঘটল না। 'কামবৃত্তি'র যে শাস্তি অমরনাথকে যৌবনচাপল্যে লবঙ্গলতা দিয়েছিল তা-ই তাঁর 'চিত্তশুদ্ধি' ঘটিয়েছে। ফলে অমরনাথের পূর্ববৃত্তান্ত রজনীকে বলে দেবার হুমকি দিলে, উল্টে অমরনাথই লবঙ্গকে বলে—'তুমি শুনাও বা না শুনাও, আমি স্বয়ং আজি তাহাকে সকল শুনাইব। আমার দোষ গুণ সকল শুনিয়া রজনী আমাকে গ্রহণ করিতে হয়, গ্রহণ করিবে; না করিতে হয়, না করিবে। আমি তাহাকে প্রবঞ্চনা করিব না।' (পৃ.৭০) অমরনাথের চরিত্রের এই উন্নতির আভাসই খুলে দেয় লবঙ্গলতার মনের আগল—'আমি হারিয়া, মনে মনে অমরনাথকে শত শত ধন্যবাদ করিতে করিতে, হর্ষবিষাদে ঘরে ফিরিয়া আসিলাম।' (পৃ.৭০) এই অংশের সুন্দর ব্যাখ্যা করেন অধ্যাপিকা জলি মল্লিক বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ

> ''হর্ষ-বিষাদ' কেন?—অমরনাথ চরিত্রের সাধুতা প্রতিপন্ন হওয়ায় হর্ষ এবং কার্যসিদ্ধি না হওয়ায় বিষাদ। এই হর্ষই লবঙ্গলতা চরিত্রের অনুচ্চারিত প্রেমের আভাস।'[৫]

একদা রূপে উন্মত্ত হয়েছিল যে, আজ তাঁর গুণের প্রতিই মুগ্ধতা প্রকাশ করল লবঙ্গলতা—'তুমি অদ্বিতীয়। আমাকে ক্ষমা করিও; আমি তোমার গুণ জানিতাম না।' (পৃ.৮০)

এরপর অমরনাথ-লবঙ্গলতার অন্তিম সাক্ষাৎকার। লবঙ্গর সেই আশ্চর্য উত্তর, অমরনাথের প্রশ্নের মুখে—'তুমি আমার প্রতি একটু—অণুমাত্র—স্নেহ করিবে? ল। তোমাকে স্নেহ করিলে আমি ধর্ম্মে পতিত হইব।' (পৃ.৮১) এই 'ধর্ম্ম' লবঙ্গলতার সতী-ধর্ম। আর 'স্নেহ'? বর্তমানে অর্থ-সংকোচনের ফলে 'স্নেহ' শব্দের সঙ্গে বাৎসল্যের যোগ ঘনিষ্ঠ হলেও মধ্যযুগ থেকে উনিশ শতক অবধি এই শব্দের অর্থ ছিল 'ভালোবাসা'। স্মরণীয়, জ্ঞানদাসের খুব চেনা সেই পদটি ঃ

‘শিশুকাল হৈতে বন্ধুর সহিতে
পরাণে পরাণে নেহা।
না জানি কি লাগি কো বিহি গঢ়ল
ভিন ভিন করি দেহা।।’[৬]

সঙ্গতভাবেই অমরনাথ বলে, ‘স্নেহের ভিখারী’ সে নয়, কিন্তু, লবঙ্গর ‘সমুদ্রতুল্য হৃদয়ে’ কি তাঁর জন্য ‘এতটুকু স্থান নাই?’ (পৃ.৮১) লবঙ্গলতার উত্তর একেবারে ‘ধর্মতত্ত্ব’-এর মাপসই—‘না—যে আমার স্বামী না হইয়া একবার আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়াছিল, তিনি স্বয়ং মহাদেব হইলেও তাঁহার জন্য আমার হৃদয়ে এতটুকু স্থান নাই।’ (পৃ.৮১) বেশ, ‘স্বামী’ না হয়ে যে ‘প্রণয়াকাঙ্ক্ষী’ হয় সতী লবঙ্গলতা তাকে ‘হৃদয়ে’ স্থান দিতে অ-রাজি! কিন্তু, এরপরেও তো তাঁর উচ্চারণে রয়ে যায় আশ্চর্য এক পরিসর। লবঙ্গলতা বলে—‘তুমি আমার কে? তা ত জানি না। এ পৃথিবীতে তুমি আমার কেহ নও। কিন্তু যদি লোকান্তর থাকে—’ (পৃ.৮১)। ‘ইহলোকে’ রামসদয় মিত্রের ‘ষোলআনা গৃহিণী’ হয়েই যার জীবন কাটল, সে-ও তবে ‘লোকান্তর’-এ অন্য কিছুর বাসনা রাখে? ‘আনন্দমঠ’-এ শান্তি বলেছিল—‘বিবাহ ইহকালের জন্য এবং বিবাহ পরকালের জন্য।’ (পৃ.৭৫) বিবাহের এই লোকান্তরিত ব্যাপ্তি লবঙ্গলতা মানল কই? সেই কবে ‘মৃণালিনী’ উপন্যাসে হেমচন্দ্র মনোরমাকে জ্ঞান দিয়েছিল—‘স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের চিন্তামাত্রও সতীত্বের বিঘ্ন।’ (পৃ.৭২) ইহলোকে মিত্রজার ঘর করেও যে লবঙ্গলতা ‘লোকান্তর’-এর জন্য মনে গুছিয়ে রাখল অমরনাথকে, সে হেমচন্দ্রের জ্ঞান-ই বা শুনল কোথায়? ‘ধর্মতত্ত্ব’-এর ‘অনুশীলন’ যে লবঙ্গলতার সামনে মিথ্যা হয়ে যায় তা আমরা বুঝতে পারি। শুধু অবাক লাগে এই দেখে যে, এ’সব কিছুর জন্যই লবঙ্গলতা কোনো শাস্তি পায় না! শ্রীঅরবিন্দের ‘দুই’ বঙ্কিমের তত্ত্ব ফিরিয়ে মনে পড়ে ঃ

> ‘The earlier Bankim was only a poet and stylist—the later Bankim was a seer and nation builder.’[৭]

এ’তত্ত্বকে মেনে নিয়ে না-পড়া অভ্যাসেই যাঁরা আওড়ে যান, পরবর্তী দ্রষ্টা-ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে পূর্ববর্তী কবি-শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের পরাজয়গাথা, তাদের ভুল প্রমাণ করে আমাদের আশ্বস্ত করেন ‘ধর্মতত্ত্ব’-এর পরেও সংশোধিত ‘রজনী’-র অ-সংশোধিত লবঙ্গলতা।

সাংখ্য, তন্ত্র ও ‘অনুশীলন’ ঃ

ভারতীয় দর্শনের অসমাপ্ত ইতিহাসে শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সাংখ্যদর্শন আর তন্ত্রের মধ্যে এক গভীর যোগ লক্ষ করেছেন। সামান্য উদ্ধার করি তাঁর সুচিন্তিত মন্তব্য ঃ

> ‘পরিদৃশ্যমান জগৎ আসলে কার্য এবং তা জড়রূপ। অতএব তার কারণ হিসেবেও জড়রূপ কিছু অনুমেয়। সাংখ্যে এই জড়রূপ জগৎ কারণকে প্রকৃতি বা প্রধান আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অতএব প্রকৃতিকে primordial matter বলা হয়। .. সাংখ্যের প্রচলিত ব্যাখ্যা অনুসারে পুরুষ বলতে চেতন আত্মা-soul-বোঝায়।... তন্ত্রর সঙ্গে সাংখ্যর কোনো-না-কোনো সম্পর্ক অনুমান করা প্রয়োজন।... তাহলে কি এমন প্রকল্পের সুযোগ থাকে যে আদিম তন্ত্রসাধনার অন্তর্নিহিত তত্ত্বগত দিকই কালক্রমে সাংখ্যে সুস্পষ্ট দার্শনিক রূপ গ্রহণ করেছিল?’[৮]

দেবীপ্রসাদের মতো প্রাতিষ্ঠানিক দার্শনিক ছিলেন না বঙ্কিম। কিন্তু, আশ্চর্য হতে হয় লক্ষ করলে, যে সাংখ্যদর্শন আর তন্ত্রের মধ্যে একজাতীয় সম্পর্ক বঙ্কিমচন্দ্রও নির্ধারণ করেছিলেন। ‘Letters on Hinduism’-এর চতুর্থ পত্রে বঙ্কিম সাংখ্য প্রসঙ্গেই মন্তব্য করেন—‘It sees no solution of the great problem of life, the relief from misery—in nothing (? anything) but knowledge. And knowledge is of value in its eyes only as furnishing the means of the dissociation of the soul from Nature. This doctrain strikes at the root of all true religion.’ (Pg. 246) সমস্ত ‘true Religion’-এর গোড়াতেই যদি সাংখ্য আঘাত হেনে থাকে, তবে বোঝা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পিত ‘অনুশীলন ধর্ম’-এর সঙ্গেও এর বিরোধ আছে। পূর্বোক্ত প্রবন্ধেই বঙ্কিম এরপর বলেন, সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ কীভাবে রূপান্তরিত হয়েছে তন্ত্রের শিব-শক্তিতে—‘typified Nature in Sakti and Purusha in Siva, and were finally elaborated and systematized in the Tantras.’ (Pg. 246) সঙ্গতভাবেই বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণায় ‘true Religion’-এর বাইরেই থেকে যাবে তন্ত্র। ‘The Statesman’ পত্রিকায় ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ২২শে নভেম্বর রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্দেশ্য করে যে চিঠি লেখেন বঙ্কিমচন্দ্র তাতেও স্পষ্ট তন্ত্র সম্পর্কে তাঁর অনীহা—‘True Hinduism and Tantrikism are as much opposed to each other as light and darkness...’ (Pg. 224).

<u>কপালকুণ্ডলা</u>

তন্ত্র সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণাকে ‘গৌরচন্দ্রিকা’ হিসেবে রেখে প্রবেশ করা যাক ‘কপালকুণ্ডলা’ উপন্যাসের বহুজ্ঞাত সূতিকা-সমাচারে। বঙ্কিমচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হিসেবে ‘খুলনা’য় কাজে যোগ দেন ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের ৯ নভেম্বর।[৯] সেখানেই দীনবন্ধু মিত্র, সঞ্জীবচন্দ্র আর পূর্ণচন্দ্রের উপস্থিতিতে বঙ্কিম উত্থাপন করেন এক অভিনব সমস্যা ঃ

> ‘যদি শিশুকাল হইতে ষোল বৎসর পর্যন্ত কোনও স্ত্রীলোক সমুদ্রতীরে বনমধ্যে কাপালিক কর্তৃক প্রতিপালিত হয়, কখনো কাপালিক ভিন্ন অন্য কাহারো মুখ না দেখিতে পায়, এবং সমাজের কিছুই জানিতে না পায়, কেবল বনে বনে সমুদ্রতীরে বেড়ায়, পরে সেই স্ত্রীলোকটিকে যদি কেহ বিবাহ করিয়া সমাজে লইয়া আইসে, তবে সমাজ সংসর্গে তাহার কতদূর পরিবর্তন হইতে পারে, এবং তাহার উপরে কাপালিকের প্রভাব কি একেবারে অন্তর্হিত হইবে?’[১০]

লক্ষণীয়, বঙ্কিমচন্দ্রের আদত জিজ্ঞাস্য দু’টি। এক. ‘সমাজ সংসর্গে’ মেয়েটির কতদূর পরিবর্তন হবে? আর, দুই. মেয়েটির উপর ‘কাপালিকের প্রভাব’ কি একেবারে মুছে যাবে? ‘কপালকুণ্ডলা’-র জীবনচরিতে উত্তর মিলবে এ’দুয়েরই।

কপালকুণ্ডলা ‘ষোড়শী’ (পৃ. ২৮) এবং কাপালিক-পালিতা। ‘খ্রীষ্টিয়ান তস্কর কর্ত্তৃক অপহৃত’ (পৃ. ৩৩) এই মেয়েটি বাল্যেই কাপালিকের কাছে আশ্রয় পায়। ‘কাপালিক ইহাকে প্রাপ্ত হইয়া আপন যোগসিদ্ধি মানসে প্রতিপালন করিয়াছিলেন।’ (পৃ. ৩৩) মাত্র কাপালিকের দ্বারা পালিত এই মেয়েটি সঙ্গতভাবেই যৌনজ্ঞানরহিত—‘ইনি এ পর্য্যন্ত অনূঢ়া; ইঁহার চরিত্র পরম পবিত্র।’ (পৃ.৩৩) মোদ্দা কথা এখনো অবধি কপালকুণ্ডলা ‘কামবৃত্তি’র স্পর্শরহিত। এহেন পরিস্থিতিতে আচম্‌কাই কপালকুণ্ডলার প্রাণরক্ষার্থে অধিকারী নবকুমারের সঙ্গে তাঁর বিবাহের ‘ঘটকালি’ (পৃ. ৩৩) করলেন। এই সূত্রেই বিবাহ এবং যৌনতা সম্পর্কে সামান্য কিছু জ্ঞান অধিকারী কপালকুণ্ডলাকে দেওয়ার চেষ্টা করলেন। লক্ষ করা যাক তার ফলাফল ঃ

বিবাহ

অধিকারী কপালকুণ্ডলাকে বললেন নবকুমারকে বিবাহ করতে। কপালকুণ্ডলা প্রশ্নাতুর—‘বিবাহের নাম তো তোমাদিগের মুখে শুনিয়া থাকি, কিন্তু কাহাকে বলে সবিশেষ জানি না। কি করিতে হইবে?’ (পৃ. ৩০) অধিকারী বিবাহের সামাজিক তাৎপর্য বোঝালেন, কপালকুণ্ডলার চেনা জগতের ছবি ধার করে—‘বিবাহ স্ত্রীলোকের একমাত্র ধর্ম্মের সোপান; এই জন্য স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী বলে; জগন্মাতাও শিবের বিবাহিতা।’ (পৃ. ৩০) ‘কপালকুণ্ডলা নিতান্ত ভক্তিপরায়ণা।’ (পৃ. ৩৪) ‘জগন্মাতা’ যদি ‘বিবাহ’ করে থাকেন, তবে তারও করতে বাধা নেই। কিন্তু, বিবাহের তাৎপর্য সে তো আদতে কিছুই বুঝল না!—‘অধিকারী মনে করিলেন, সকলই বুঝাইলেন। কপালকুণ্ডলা মনে করিলেন, সকলই বুঝিলেন’ (পৃ. ৩০)। ফলে নবকুমারের সঙ্গে যাত্রার প্রাক্‌কালে সে আবার

শিখল—'পতিমাত্র তোমার ধর্ম্ম। পতি শ্মশানে গেলে তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে যাইতে হইবে।' (পৃ. ৩৫) 'শ্মশানে' পতির 'সঙ্গে' যেতে হবে, তা জানল কপালকুণ্ডলা, শুধু শিখল না, সংসারে গিয়ে কী করতে হবে!

যৌনতা

যোল বছর পর্যন্ত যৌনতা কপালকুণ্ডলার অ-পরিজ্ঞাত। এ'হেন কপালকুণ্ডলাকে কাপালিকের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন করতে চেয়ে —'অধিকারী তান্ত্রিক সাধনে স্ত্রীলোকের যে সম্বন্ধ, তাহা অস্পষ্ট রকম কপালকুণ্ডলাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন।' (পৃ. ৩০) 'তান্ত্রিক সাধনে' কী অবস্থান 'স্ত্রীলোকের'? দেখে নেওয়া যাক গবেষকের মন্তব্য ঃ

> 'শিব সৃষ্টির পুং আদর্শ, শক্তি স্ত্রী এবং উভয়ের মিলন বা কামকলাই সৃষ্টির পদ্ধতি।... তান্ত্রিকেরা যে দুটি রহস্যের অনুকরণ করেন তার প্রথমটি হল শিব শক্তির কামকলা, সাধক ও তাঁর সাধন সঙ্গিনীর আনুষ্ঠানিক দেহ মিলন, যা পঞ্চমকার সাধনা বা পঞ্চতত্ত্ব নামে পরিচিত... তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপে ব্যবহৃত উপকরণগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে নারীদের স্রাব থেকে নিঃসৃত রক্ত বা রজঃ। আগেই বলেছি এই রজঃ স্ত্রী বীজ হিসাবে কল্পিত, তন্ত্রের ভাষায় রক্তচন্দন বা খ-পুষ্প, যা দেবীর নিকট অতি পবিত্র। সবচেয়ে পবিত্র কার্যকর হচ্ছে অক্ষতযোনি কিশোরীর প্রথম রজঃ।... তন্ত্র সাধনার মূল অনুষ্ঠানটি হল মৈথুন, যেখানে সাধক ও তার সঙ্গিনী শিব ও শক্তির ভূমিকাকে অনুসরণ করেন।'[১১]

এই কথাগুলিই নিশ্চয় 'অস্পষ্ট' রকমে কপালকুণ্ডলাকে বোঝাতে চেয়েছিল অধিকারী। মনে পড়বে প্রথম সংস্করণে এই অস্পষ্টতাটুকু একেবারেই ছিল না; অধিকারী কপালকুণ্ডলাকে বলেছিল—'স্ত্রীলোকের সতীত্ব নাশ না করিলে যে তান্ত্রিক সিদ্ধ হয় না, তাহা তুমি জান না।' (পৃ. ৯৫) কিন্তু, 'অস্পষ্ট'রকমেও নারী-পুরুষের জৈবিক মিলন সম্পর্কে যেটুকু বুঝল কপালকুণ্ডলা, তাতে তার কী মনে হল?—'কপালকুণ্ডলা তাহা কিছু বুঝিল না, কিন্তু তাহার বড় ভয় হইল।' (পৃ.৩০) কিছু না বুঝেও এই যে 'ভয়' কপালকুণ্ডলার মনে গেঁথে গেল, এরপর এই 'ভয়'ই তাকে ঠেলে দেবে যৌন-শীতলতার দিকে; তার যৌন-আচরণে সঞ্চারিত করবে পঙ্গুত্ব।

বিবাহ-কেন্দ্রিক যৌনতার বাচন কপালকুণ্ডলাকে অনেক স্পষ্টভাবে এরপর বুঝিয়ে দেবে 'ননন্দা শ্যামাসুন্দরী' (পৃ.৪৭)। 'তপস্বিনী' (পৃ. ৪৮) কপালকুণ্ডলাকে সম্বোধন করে শ্যামাসুন্দরী বলে—'একবার

আমাদের গৃহস্থের মেয়ের মত সাজ। কত দিন যোগিনী থাকিবে?' (পৃ. ৪৮) আর এই সূত্রে শ্যামাসুন্দরী প্রয়োগ করে আশ্চর্য এক যৌন রূপকল্প—'পরশপাথরের স্পর্শে রাঙ্গও সোনা হয়।... মেয়ে মানুষেরও পরশপাতর আছে। ... পুরুষ। পুরুষের বাতাসে যোগিনীও গৃহিণী হইয়া যায়। তুই সেই পাতর ছুঁয়েছিস্।' (পৃ. ৪৮) শ্যামাসুন্দরীর দু'টি গানেও প্রকাশিত সেই একই 'কামবৃত্তি'-র স্পর্শজনিত চিত্র ঃ

এক. 'ছি ছি—সরম টুটে, কুমুদ ফুটে, চাঁদের আলো পেলে।।'
বিয়ের কনে রাখতে নারি ফুলশয্যা গেলে।।' (পৃ. ৪৭)

দুই. 'সোনার পুত্তলি ছেলে কোলে তোর দিব ফেলে,
দেখি ভাল লাগে কি না লাগে।' (পৃ. ৪৮)

শ্যামাসুন্দরীর এই অনর্গল যৌন-বাচনের বিপরীতেই আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে কপালকুণ্ডলার যৌন-শীতলতার ছবি—'শ্যা। বল দেখি ফুলটি ফুটিলে কি সুখ? মৃ। লোকের দেখে সুখ, ফুলের কি?' (পৃ. ৪৯) ফুলের ফুটে ওঠার মধ্যে যে ফুলেরই নিজস্ব যৌন আনন্দ আছে, তা কিছুতেই বুঝতে পারছেন না কপালকুণ্ডলা।

'এক বৎসরের অধিক কাল নবকুমারের গৃহিণী' (পৃ. ৭০) থাকার পর আবার কপালকুণ্ডলাকে আমরা দেখতে পাই। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশ্ন ছিল দুটি : 'সমাজ সংসর্গে' কপালকুণ্ডলার কতদূর পরিবর্তন হবে? আর 'কাপালিকের' অর্থাৎ তন্ত্রের প্রভাব তার উপর থেকে একেবারে মুছে যাবে কি না? 'সমাজ সংসর্গে' কিছু পরিবর্তন কপালকুণ্ডলার ঘটেছে সত্য। সে শিখেছে সামাজিক যৌনতার বাচন। শ্যামাসুন্দরীকে কপালকুণ্ডলা বলেছে—'তুমিও কি মনে করিয়াছ যে, আমি রাত্রে ঘরের বাহির হইলেই কুচরিত্রা হইব?' (পৃ. ৭১) আর 'গর্ব্বিতবচনে' নবকুমারকে বলেছে—'আইস, আমি অবিশ্বাসিনী কি না, স্বচক্ষে দেখিয়া যাও।' (পৃ. ৭২) কিন্তু, 'বিবাহ'-এর সামাজিক হিতকামী কাঠামোর মধ্যে সে যে এখনো স্বস্তিতে নেই, তাও আমরা বুঝতে পারি, যখন কপালকুণ্ডলা বলে—'যদি জানিতাম যে স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসীত্ব, তবে কদাপি বিবাহ করিতাম না।' (পৃ. ৭২)

আর তন্ত্রের প্রভাব? তা কি পুরোপুরি মুছে গেছে? সম্ভবপর নয় বলেই বঙ্কিমচন্দ্রের মনে হয়েছে—'কপালকুণ্ডলা অন্তঃকরণ সম্বন্ধে তান্ত্রিকের সন্তান' (পৃ. ৮৯)। ফলে এক বৎসর স্বামী সহবাসের পরও সেই যৌন-শীতলতা কপালকুণ্ডলার মন থেকে দূরীভূত হয়নি—'পৃথিবীর সর্ব্বত্র মানসলোচনে দেখিলেন—কোথাও কাহাকে দেখিতে পাইলেন না! অন্তঃকরণ মধ্যে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন—তথায় ত নবকুমারকে দেখিতে পাইলেন না' (পৃ. ৮৭)। 'ধর্মতত্ত্ব'-এ বঙ্কিম লিখেছিলেন—'দম্পতিপ্রীতির সুখ কিয়ৎপরিমাণে অনুশীলনসাপেক্ষ হইলেও সে অনুশীলন অতি সহজ ও সুখকর।' (পৃ. ১২২) এতই 'সহজ ও সুখকর' যে 'দম্পতিপ্রীতি'-র 'অনুশীলন', এক বছরেও তা নির্জিত করতে পারল না 'তন্ত্র'-এর ধাক্কায় তৈরি হওয়া কপালকুণ্ডলার যৌন-শীতলতাকে? আদতেই কি ঘাতসহ তবে 'দম্পতিপ্রীতি'-র অনুশীলন?

সমাজ ও 'সমর্থা' ঃ

'কামবৃত্তি' এসে 'দম্পতিপ্রীতি'-তে আঘাত হানলে সেই 'কামবৃত্তি' অবশ্যই শাস্তিযোগ্য। 'ধর্মতত্ত্ব'-এর মান্য কাঠামোতে তা-ই বলা হয়। কিন্তু, এমন সম্ভাবনা যদি তৈরি হয়, যেখানে 'দম্পতিপ্রীতি'-র আড়ে-আসা ত্রিভুজের তৃতীয় কোণটিতে 'কামবৃত্তি' নেই, আছে কোনো এক-রকমেরই 'প্রীতি', তখন কী হবে? তবে কি সেই 'প্রীতি' শাস্তিযোগ্য? বিষয়টিকে বোঝবার জন্য রূপ গোস্বামীর নির্মিত পরিভাষার সহায়তা নেওয়া যাক। 'কৃষ্ণরতি'-র তিন প্রকারের কথা বলেছেন রূপ গোস্বামী ঃ

> 'যেখানে স্বসুখবাসনাময় সম্ভোগেচ্ছাই রতির হেতু, সেখানে সাধারণী।... এই রতির সীমা প্রেমের প্রারম্ভ স্তর পর্যন্তই, ... 'সাধারণী'তে সম্ভোগেচ্ছা সব সময়েই পৃথক থাকে, আর সমঞ্জসায় কখনো কখনো মাত্র পৃথক থাকে। এ রতি পত্নীভাবের ... যে রতিতে সম্ভোগেচ্ছা বিন্দুমাত্র পৃথক থাকে না, রতির সঙ্গে একাত্ম বা বিলীন হয়ে যায় তাই হল সমর্থা, এতে স্ব-ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিলালসা থাকে না।...পরকীয়াত্বেই সমর্থা রতির প্রতিষ্ঠা।'[১২]

বৈষ্ণবীয় প্রেক্ষিত থেকে মুক্ত করে, একটু আলগাভাবেই ব্যবহার করা যাক পরিভাষা তিনটি। স্পষ্টতই বঙ্কিমের ধারণায় 'সাধারণী' হচ্ছে 'কামবৃত্তি'-র নামান্তর, আর 'সমঞ্জসা', 'দম্পতিপ্রীতি'-র। কিন্তু সমস্যা 'সমর্থা' নিয়ে। কারণ, একাধারে তা 'পরকীয়া' অথচ তাতে আবার 'স্ব-ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিলালসা' অর্থাৎ 'কামবৃত্তি' নেই! 'পরকীয়া' অথচ আত্মনিবেদিত নিঃশব্দ 'প্রীতি'-র এই পরিসর বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্মতত্ত্ব'-এর মান্য-কাঠামোকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে অস্বস্তিকর প্রশ্নের মুখে। 'দুর্গেশনন্দিনী'-র আয়েষা, 'রজনী'-র অমরনাথ আর 'চন্দ্রশেখর'-এর প্রতাপ, বঙ্কিমের সেই ত্রয়ী-অস্বস্তি।

আয়েষা

কতলু খাঁর কন্যা আয়েষার জগৎসিংহের সঙ্গে প্রথম আলাপ রোগশয্যায়। আহত জগৎসিংহের সেবিকা আয়েষা; সেখান থেকেই জগৎসিংহের প্রতি আয়েষার একৈকমুখী প্রণয়ের সূত্রপাত। ওসমান প্রশংসা করলে, আয়েষার উত্তর স্মরণীয়—'আমি ত স্বভাবতঃ রমণী; পীড়িতের সেবা আমার পরম ধর্ম্ম' (পৃ. ৭০)। 'ধর্মতত্ত্ব'-এর গুরু বলেছিলেন 'প্রীতি ও দয়ার মিশ্রণে স্নেহ' (পৃ. ৫৩) জন্ম নেয়। 'দয়া' আয়েষার মধ্যে পূর্বাবধি ছিল, আর 'প্রীতি' জগৎসিংহের প্রতি ধাবিত হল, তার সেবার সময়। দু'য়ে মিলে মনের গোপন কোণে জন্ম নিল 'স্নেহ' অর্থাৎ ভালোবাসা।

শুধু কি তাই! 'উত্তরচরিত'-এর ভাষ্যে রোগকালীন 'ঔষধ' অথবা 'বৈদ্য' হল স্ত্রী। 'দম্পতিপ্রীতি'র প্রথম সোপানে তো পা রেখেই দিয়েছেন আয়েষা—'আয়েষা ঔষধ আনিলেন' (পৃ. ৭৩)। শুধু প্রথম

সোপানই বা বলি কী করে? 'বিষবৃক্ষ'-এ হরদেব ঘোষাল তাঁর চিঠিতে লেখেন—'চিত্তের যে অবস্থায়, অন্যের সুখের জন্য আমরা আত্মসুখ বিসর্জ্জন করিতে স্বতঃপ্রস্তুত হই, তাহাকে প্রকৃত ভালবাসা বলা যায়। ''স্বতঃপ্রস্তুত হই'', অর্থাৎ ধর্ম্মজ্ঞান বা পুণ্যাকাঙ্ক্ষায় নহে।' (পৃ. ৮৯) এই স্বতঃপ্রস্তুতির লক্ষণ দেখি আয়েষার মধ্যে। রোগশয্যায় জগৎসিংহের প্রশ্ন—'আমি পীড়ার মোহে স্বপ্ন দেখিতাম, স্বর্গীয় দেবকন্যা আমার শিয়রে বসিয়া শুশ্রূষা করিতেছেন, সে তুমি, না তিলোত্তমা?' (পৃ. ৭৩) অনায়াসে 'আত্মসুখ বিসর্জ্জন' দিল আয়েষা, বলল—'আপনি তিলোত্তমাকে স্বপ্ন দেখিয়া থাকিবেন।' (পৃ. ৭৩) আয়েষার এই প্রণয়কে 'একৈকমুখী' বলেছি আমরা। কেন? লক্ষ করা যাক আয়েষা সম্পর্কে জগৎসিংহের চিন্তাসূত্রটি—'আয়েষা সহোদরাধিক স্নেহের সহিত তাঁহার যত্ন করিতেছে' (পৃ. ৯০)।

এরপরই সেই বিখ্যাত বন্দীশালার দৃশ্য। বন্দী রাজপুত্রের মুক্তি-কাঙ্ক্ষিণী আয়েষার 'নিঃশব্দ রোদন' (পৃ. ১১৭)-এর অর্থ খুঁজে পায় না জগৎসিংহ। সে-অর্থ বাঙ্ময় হয়ে ওঠে ওসমানের উপস্থিতিতে। ওসমানের অভিযোগের উত্তরে আয়েষা 'মুক্তকণ্ঠে' ঘোষণা করে—'এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর!' (পৃ. ১১৮) আয়েষার 'নীরব রোদন' (পৃ. ১১৮) এর অর্থ যখন জগৎসিংহ বুঝতে পারছেন, তখনই আয়েষার দীর্ঘায়ত ভাষ্য—'এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর,—যাবজ্জীবন অন্য কেহ আমার হৃদয়ে স্থান পাইবে না। কাল যদি বধ্যভূমি ইঁহার শোণিতে আর্দ্র হয়—.... তথাপি দেখিবে হৃদয়-মন্দিরে ইঁহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া অন্তকাল পর্য্যন্ত আরাধনা করিব।' (পৃ. ১১৮) 'সমর্থা' রতির কথা আমরা আগেই বলেছি। এবার লক্ষ করা যাক আয়েষার বাচন—'কাল যদি ইনি মুক্ত হইয়া শত মহিলার মধ্যবর্তী হন, আয়েষার নামে ধিক্কার করেন, তথাপি আমি ইঁহার প্রেমকাঙ্ক্ষিণী দাসী রহিব।' (পৃ. ১১৮) কৃষ্ণকথার ইঙ্গিতবাহী এই বাচনে আয়েষা শেষাবধি সমর্থা রতির প্রাণপ্রতিমা 'রাধা'। তারই শ্রেষ্ঠ প্রকাশ জগৎসিংহকে লেখা আয়েষার চিঠিতে—'আমি তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী নহি। আমার যাহা দিবার, তাহা দিয়াছি, তোমার নিকট প্রতিদান কিছু চাহি না। আমার স্নেহ এমন বদ্ধমূল যে, তুমি স্নেহ না করিলেও আমি সুখী; কিন্তু সে কথায় আর কাজ কি!' (পৃ. ১২৯) প্রতিদানপ্রত্যাশাহীন এই প্রণয়ই 'প্রকৃত ভালোবাসা'।

জগৎসিংহ-তিলোত্তমার বিবাহে আয়েষার মাঙ্গলিক বাচন—'আমি যে রত্নগুলি দিলাম, অঙ্গে পরিও। আর আমার—তোমার সার রত্ন হৃদয় মধ্যে রাখিও।' (পৃ. ১৩৭) বিবাহেই উপন্যাসের সমাপ্তি নয়। সমাপ্তি আয়েষার জীবনমুখিনতায়। হাতের 'গরলাধার অঙ্গুরীয়' (পৃ. ১৩৮) কে একবার জীবন-নাশের পন্থা ভেবেছিল আয়েষা; কিন্তু মনে সংশয় জন্ম নিল—'জগৎসিংহ শুনিয়াই বা কি বলিবেন?' (পৃ. ১৩৮) আয়েষা তার চিঠিতে লিখেছিল—'জগদীশ্বর তোমাকে সুখী করিবেন, আয়েষার কথা মনে করিয়া কখনও দুঃখিত হইও না।' (পৃ. ১২৯) প্রণয়াস্পদের হৃদয়ে যাতে ক্লেশমাত্র অনুভব না হয়, তাই আয়েষার অন্তিম চেষ্টা। একৈকমুখী 'প্রীতি'র এই আশ্চর্য রূপ, যার মধ্যে 'কামবৃত্তি'-র লেশমাত্র নেই, তাকে কী করে ধিক্কার জানানো সম্ভব বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে? ফলে, 'ধর্মতত্ত্ব'-এর মান্য কাঠামোর মধ্যে না আসলেও, এই

‘সমর্থা রতি’-কে তার যথোপযুক্ত মর্যাদাতেই রক্ষা করেন তিনি। তাই, দ্বিতীয় খণ্ডের সামান্য অংশে উপস্থিত থেকেও মর্যাদায় আয়েষাও ‘দুর্গেশনন্দিনী’ আর তার সম্পর্কেই বঙ্কিমচন্দ্রের সেই আশ্চর্য উপমাগর্ভ মন্তব্য—‘যেমন উদ্যানমধ্যে পদ্মফুল, এ আখ্যায়িকা মধ্যে তেমনই আয়েষা।’ (পৃ. ৬৭)

অমরনাথ

শান্তিপুরের বাসিন্দা অমরনাথ ঘোষ। তাঁর পিসির গ্রামের লবঙ্গলতার সঙ্গে অমরনাথের ‘সম্বন্ধ’ (পৃ. ৩০) ঠিক হয়েছিল। কিন্তু, পিতৃকুলের কলঙ্কের কারণে এই বিয়ে ভেঙে যায়। লবঙ্গলতার বিয়ে হয় রামসদয় মিত্রের সঙ্গে। ‘লবঙ্গলাভে নিরাশ’ (পৃ. ৩১) অমরনাথ ‘প্রথম যৌবনে’ (পৃ. ৭৭) এক রাত্রে ‘রূপোন্মাদে উন্মাদ’ (পৃ. ৭৭) হয়ে লবঙ্গলতার পিত্রালয়ে গোপনে প্রবেশ করে। লবঙ্গলতা অমরনাথের ‘কামবৃত্তি’-র তীব্র শাস্তি বিধান করে—‘ডাকিয়া পাড়ার লোক জমা করিলাম। ... চোর লজ্জায় মুখে কাপড় দিয়া রহিল। আমি দয়া করিয়া তাহার মুখের কাপড় খুলাইলাম না, কিন্তু স্বহস্তে লোহার শলা তপ্ত করিয়া তাহার পিঠে লিখিয়াছিলাম, ‘‘চোর!’’ ’ (পৃ. ৭০) এই মানসিক আঘাতে ‘বাত্যাতাড়িত পতঙ্গের মত’ (পৃ. ৩১) দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন অমরনাথ। কথক বলেননি বটে, কিন্তু আমরা পরবর্তী অমরনাথকে দেখে বুঝতে পারি, এই অবসরে চতুর্বিধ বৃত্তির নিয়ত অনুশীলন করেছেন অমরনাথ। ‘ধর্মতত্ত্ব’-এর একেবারেই মাপে মিলে যান তিনি ঃ

শারীরিকী বৃত্তি	রজনীকে বাঁচাতে গিয়ে ‘ডোম কি সিউলি’ (পৃ. ৩৯) জাতীয় ‘বলবান্’(পৃ. ৩৯) পুরুষের সঙ্গে যথাসাধ্য লড়াই করে অমরনাথ।
কার্য্যকারিণী বৃত্তি	রজনীর সম্পত্তি-উদ্ধারের জন্য যত কষ্ট স্বীকার করেছে অমরনাথ, তা তার ‘কার্য্যকারিণী বৃত্তি’-রই পরিচয়।
চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি	‘সেক্ষপিয়রের নায়িকাগণ হইতে শকুন্তলা, সীতা, কাদম্বরী, বাসবদত্তা, রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি আসিয়া পড়িল। অমরনাথ একে একে তাঁহাদিগের চরিত্রের বিশ্লেষ করিলেন।’ (পৃ. ৪৭)
জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি	‘প্রাচীন ইতিবৃত্ত-লেখকদিগের মত লইয়া অমরনাথ কোম্‌তের ত্রৈকালিক উন্নতি-সম্বন্ধীয় মতের সমর্থন করিলেন।’ (পৃ. ৪৮)

‘ধর্মতত্ত্ব’ মেনেই অনুশীলিত অমরনাথ ঝাঁপিয়ে পড়েন পরোপকারে।

পরোপকারের সূত্রেই রজনীর জীবন-বৃত্তান্তে প্রবেশ করেন অমরনাথ। উপকারের প্রেক্ষাপটেই ঠিক হয়ে যায় রজনী-অমরনাথের বিবাহ। কিন্তু, রজনী মনে মনে প্রথমাবধি ভালোবেসেছে শচীন্দ্রকে। সন্ন্যাসীর

ঔষধে প্রকাশ পায়, শচীন্দ্রেরও মনের কথা তা-ই। ফলে রজনী-শচীন্দ্রের ঘটকালি করতে আসরে নামে লবঙ্গলতা; শচীন্দ্রের বিমাতা। সেই লবঙ্গলতা যার সম্বন্ধে অমরনাথের সিদ্ধান্ত—'প্রণয়? স্নেহ? ভালবাসা? আমি জানি, ইহার অভাবই সুখ—ভালবাসাই দুঃখ। সাক্ষী লবঙ্গলতা।' (পৃ. ৩৪) সেই লবঙ্গলতাই অমরনাথকে ভয় দেখায়, রজনীকে পূর্ববৃত্তান্ত কথনের। অনুশীলিত অমরনাথ স্বমুখে রজনীর কাছে কবুল করেন সে কথা। কারণ, অনুশীলিত বলেই তিনি বোঝেন, 'দম্পতিপ্রীতি'-তে 'বিশ্বাস'-এর মর্যাদা কতখানি—'যাহাকে অবলম্বন করিয়া আমি সংসারে সুখী হইতে চাহিতেছি—তাহাকে আবার প্রতারণা করিব!' (পৃ. ৭৬) আর রজনীর প্রতি তাঁর উদার বক্তব্য—'আমি মনে জানি, আমি তোমার যোগ্য নহি।' (পৃ. ৭৭) 'কামাদি' 'শারীরিকী বৃত্তি' তাঁর অনুশীলিত বলেই, অমরনাথ 'প্রণয়ে আত্মবিসর্জ্জন'-এর কথা ভাবতে পারেন। তাই রজনীও শচীন্দ্রের প্রতি তাঁর অনুরাগ ব্যক্ত করলে অমরনাথ সিদ্ধান্ত নেন—'রজনী শচীন্দ্রের, শচীন্দ্র রজনীর; মাঝখানে আমি কে?' (পৃ. ৭৮)

বৈষ্ণবীয় পরিভাষাটিকে যদি তার প্রেক্ষিত থেকে চ্যুত করে, লিঙ্গ-নিরপেক্ষভাবে আমরা ব্যবহার করি, তবে নিঃসন্দেহে অমরনাথ 'সমর্থা রতি'-র আলম্বন। ফলে শচীন্দ্র-রজনীর মঙ্গলার্থে রজনীর প্রতি নিজের প্রণয়কে সংহরণ করে নিল অমরনাথ—'শচীন্দ্রের রজনী—শচীন্দ্রকে দিয়া আমি এ সংসার ত্যাগ করিব। এ হাট ভাঙ্গিব, এ হৃদয়কে শাসিত করিব' (পৃ. ৭৮)। পরোপকারের যথাযোগ্য স্বীকৃতি পেল অমরনাথ। তাঁর প্রতিদানপ্রত্যাশাহীন প্রণয়ের, তাঁর 'সমর্থা রতি'-র মঙ্গলময়ত্বের প্রতীক হয়ে রয়ে গেল শচীন্দ্র-রজনীর সন্তান—'অমরপ্রসাদ' (পৃ. ৮৪)।

'এহো হয় আগে কহ আর'। অমরনাথ রজনীকে ভালবেসেছেন। কিন্তু তৎপূর্বেই 'কামবৃত্তি'কে 'শাসিত' করে অমরনাথ ভালবেসেছেন লবঙ্গলতাকে—'আমার এক বাঞ্ছনীয় পদার্থ ছিল—আজিও আছে। কিন্তু সে বাসনা পূর্ণ হইবার নহে। পূর্ণ হইবার নহে বলিয়া তাহা হৃদয় হইতে অনেক দিন হইল উন্মূলিত করিয়াছি। আর পুনরুজ্জীবিত করিতে চাহি না।' (পৃ. ৩৫) 'পুনরুজ্জীবিত' করতে না চাইলেও, 'পুনরুজ্জীবিত' হয় তা। রজনীর সম্পত্তির সূত্রে সামনে আসেন লবঙ্গলতা। অমরনাথ-লবঙ্গলতার শেষ কথোপকথনে স্পষ্ট হয়ে যায় লবঙ্গর জন্য অমরনাথের মনের অনুচ্চারিত প্রেমের স্বরূপ। আর নিঃশব্দ সেই প্রণয়ের সম্মুখেই যখন সশব্দ হয়ে ওঠে লবঙ্গলতার বেদনা—'আমি তখনই মিত্রদিগের গৃহে গেলাম।.. দেখিলাম, লবঙ্গলতা ধূল্যবলুণ্ঠিতা হইয়া শচীন্দ্রের জন্য কাঁদিতেছে। যাইবামাত্র লবঙ্গলতা আমার পা জড়াইয়া আরও কাঁদিতে লাগিল—বলিল, ''ক্ষমা কর! অমরনাথ, ক্ষমা কর!... আমি বিষ খাইয়া মরিব।'' আমার বুক ভাঙ্গিয়া গেল।' (পৃ. ৭৮) তখন, সঙ্গতভাবেই, 'প্রণয়ে আত্মবিসর্জ্জন'-এ অভ্যস্ত অমরনাথ 'প্রতিজ্ঞা' করেন 'সব বিসর্জ্জন দিব।' (পৃ. ৭৯) 'ধর্মতত্ত্ব'-এর মান্য কাঠামোকে অস্বীকার করে, 'অনুশীলন

ধর্ম'-এর সার্থকতাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও, বঙ্কিম-সাহিত্যের জগতে এই পুরুষটি 'অদ্বিতীয়' (পৃ. ৮০)।

প্রতাপ

'চন্দ্রশেখর'-এর 'উপক্রমণিকা'তেই আমরা দেখা পাই প্রতাপের। 'ষোল বৎসরের নায়ক' (পৃ. ১০)। সর্বজ্ঞ কথকের দৈববাণীতেই নির্ধারিত হয় তাঁর ভবিষ্যৎ—'বাল্যপ্রণয়ে কোন অভিসম্পাত আছে।' (পৃ. ১০) কুলের প্রশ্নে শৈবলিনী-প্রতাপের বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। এমতাবস্থায় 'পরামর্শ' (পৃ. ১০) করে প্রতাপ-শৈবলিনী আয়োজন করে মৃত্যুর। মাঝগঙ্গায় সাঁতরে গিয়ে—'প্রতাপ ডুবিল' (পৃ. ১১); না, মরণ নয়, মরণ-মিলন—'শৈবলিনি, এই আমাদের বিয়ে!' (পৃ. ১১) 'প্রকৃত ভালবাসা'-র লক্ষণ যে 'প্রণয়ে আত্মবিসর্জ্জন' এ সেই ভালবাসা।

ভবিতব্যের ইঙ্গিতে চন্দ্রশেখর প্রতাপের প্রাণরক্ষা করলেন। শৈবলিনীকে তিনি স্বয়ং বিবাহ করলেন আর 'প্রতিবাসি-কন্যা' (পৃ. ৪০) রূপসীর বোন সুন্দরীর সঙ্গে প্রতাপের বিয়ে দেওয়ালেন। প্রতাপকে 'নবাবের সরকারে' (পৃ. ৪০) চাকরিও করে দিলেন চন্দ্রশেখর। সঙ্গতভাবেই প্রতাপ মন্তব্য করেন—'আমার সর্বস্ব চন্দ্রশেখর হইতে' (পৃ. ৪১)। ফলে, উপকারীর উপকারার্থে, লরেন্স ফষ্টরের নৌকা থেকে চন্দ্রশেখরের স্ত্রী শৈবলিনীকে উদ্ধার করলেন প্রতাপ। এখানেই তাঁর জীবন-গ্রন্থিতে অচ্ছেদ্য জট পাকল।

শৈবলিনী প্রতাপকে অভিযুক্ত করল তার কামাগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়ার জন্য। প্রতাপও প্রত্যুত্তরে বলল—'ঈশ্বর জানেন, ইদানীং আমি তোমাকে সর্প মনে করিয়া, ভয়ে তোমার পথ ছাড়িয়া থাকিতাম। তোমার বিষের ভয়ে আমি বেদগ্রাম ত্যাগ করিয়াছিলাম। তোমার নিজের হৃদয়ের দোষ—তোমার প্রবৃত্তির দোষ।' (পৃ. ৪৯) শৈবলিনীর 'প্রবৃত্তির দোষ'-এর একমাত্র আলম্বন প্রতাপ, সে'কথা জেনে—'প্রতাপের মাথায় বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল' (পৃ. ৫০)। প্রতাপ বুঝলেন, তিনি অজানিতেই তাঁর উপকারীর অপকার করে বসেছেন। ফলে প্রতাপকে যখন শৈবলিনী ইংরেজদের নৌকা থেকে মুক্ত করে আনল, তখন 'অগাধ জলে সাঁতার' (পৃ. ৬৯) দিতে দিতে প্রতাপ শৈবলিনীকে দিয়ে চিরবিস্মৃতির শপথ করিয়ে নিল।

অতঃপর প্রতাপের শেষ সাক্ষাৎ মেলে উদয়নালার শিবিরে। 'বাতুলতা' (পৃ. ১২৮) মুক্ত শৈবলিনীর মুখে প্রতাপ শোনে সেই অমোঘ উচ্চারণ—'আমি সুখী হইব না। তুমি থাকিতে আমার সুখ নাই—' (পৃ. ১২৮)। ফলে, একদা যে 'প্রণয়ে আত্মবিসর্জ্জন' করতে চেয়েও পারেনি, এবার প্রতাপ পূর্ণ করে নেয় সেই মনোবাঞ্ছা। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেয় সে। রমানন্দ স্বামীর প্রশ্নের উত্তরে মুমূর্ষু প্রতাপের উক্তি—'আমি বুঝিলাম, আমি জীবিত থাকিতে শৈবলিনী বা চন্দ্রশেখরের সুখের সম্ভাবনা নাই। যাহারা আমার পরম

প্রীতির পাত্র, যাহারা আমার পরমোপকারী, তাহাদিগের সুখের কন্টক স্বরূপ এ জীবন আমার রাখা অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিলাম।' (পৃ. ১৩০) আর, রমানন্দ স্বামীর কাছেই কবুল যান প্রতাপ, তাঁর 'প্রকৃত ভালবাসা'র গোপন কথা—'কে বুঝিবে, আমি এই ষোড়শ বৎসর, আমি শৈবলিনীকে কত ভালবাসিয়াছি। পাপচিত্তে আমি তাহার প্রতি অনুরক্ত নহি—আমার ভালবাসার নাম—জীবন বিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা। ... এ জন্মে এ অনুরাগে মঙ্গল নাই বলিয়া, এ দেহ পরিত্যাগ করিলাম।' (পৃ. ১৩১) 'ধর্মতত্ত্ব'-এর কামবৃত্তি-দম্পতিপ্রীতির দ্বিধাবিভক্ত কাঠামোকে একেবারেই অস্বীকার করে যায় পুরুষের 'সমর্থা রতি'-র এই আশ্চর্য গল্প। এহো বাহ্য। প্রতাপের 'প্রণয়ে আত্মবিসর্জ্জন' আসলে 'ধর্মতত্ত্ব'-এর 'দম্পতিপ্রীতি'-র 'অনুশীলন'কেই প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়। কীভাবে? শৈবলিনী-চন্দ্রশেখরের পরিবারকে 'রাষ্ট্র'-এর মঙ্গলার্থে রক্ষা করতে গিয়ে প্রতাপ আত্মবিসর্জিত হল। বেশ কথা। কিন্তু, এর ফলে তো প্রতাপ-রূপসীর সংসারও ভেঙে গেল! রূপসীর 'দম্পতিপ্রীতি'-র কী হবে? রোহিণী-কুন্দনন্দিনী-শৈবলিনীকে শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে হাকিম বঙ্কিমচন্দ্রের লোক-প্রসিদ্ধি আছে বটে; নিরপরাধিনী রূপসী শাস্তি পেল কেন? 'ধর্মতত্ত্ব'-এর দিকে তাকিয়েই বলতে বাধ্য আমরা—'শাস্ত্র এখানে মূক।' (পৃ. ১৩১)

সন্ন্যাস ও অনুশীলন ঃ

সন্ন্যাসীদের নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সামান্য কিছু আলাপ-আলোচনা হয়েছিল শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের। 'বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ' নামের রচনা থেকে উদ্ধার করা যাক সেই কথোপকথন ঃ

> 'কথায় কথায় আমি তাঁহার নভেল সমূহে সন্ন্যাসী চরিত্রগুলির কথা তুলিলাম। হাসিয়া বলিলেন, 'সব নভেলেই আছে বটে, কিন্তু কেন থাকে জানি না।' আমি বলিলাম, 'আপনার পিতার সম্বন্ধীয় সন্ন্যাসীর গল্প সঞ্জীববাবুর কাছে শুনিয়াছি। হইতে পারে, শৈশবাবধি তার দরুণ মনে একটা Impression আছে।' বঙ্কিমবাবু—'সে গল্প শুনিয়াছি বটে, কিন্তু সেজন্য কিছু হইয়াছে, আমার বোধ হয় না। তবে অনেক স্থানে অনেক সন্ন্যাসী দেখেছি।' আমি বলিলাম, 'বই-এর অনুরূপ কোনো সন্ন্যাসীর আশ্চর্য কীর্তিকলাপ কখনো দেখেছেন কি না?' একটু ভাবিয়া উত্তর করিলেন, 'না'।'[১৩]

সন্ন্যাসীদের 'আশ্চর্য কীর্তিকলাপ' সম্পর্কে এক রকমের শ্রদ্ধার বোধ বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল, তা আন্দাজ করা চলে তাঁর উপন্যাসের কোন-কোন সন্ন্যাসীর 'কীর্তিকলাপ' দেখে। রমানন্দ স্বামীর 'যোগবল' বা রজনীর সন্ন্যাসীর চিকিৎসাবিদ্যায় পারঙ্গমতা সেরকমই কিছু উদাহরণ। কিন্তু, 'অনুশীলন ধর্ম'-এর আচরণে

'ইন্দ্রিয়সংযম' আবশ্যক; ইন্দ্রিয় উচ্ছেদ অধর্ম! অথচ ভারতীয় সন্ন্যাসের ধারায় 'কামাদি' রিপুর উচ্ছেদই প্রাথমিক সোপান! ফলে 'দম্পতিপ্রীতি'র শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র 'অনুশীলন ধর্ম'-এর 'প্রীতি' বৃত্তির নিরিখে সন্ন্যাসকে কখনোই মেনে নিতে পারেননি। অনুশীলন ধর্ম আর সন্ন্যাস ধর্মের মধ্যে যে পার্থক্যগুলি লক্ষ করা যেতে পারে, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষ্য-অনুসারেই তাদের সাজিয়ে নেওয়া যাক ঃ

	অনুশীলন ধর্ম	**সন্ন্যাস ধর্ম**
এক	'অনুশীলন ধর্ম' মতে 'বৃত্তি নিকৃষ্ট হউক বা উৎকৃষ্ট হউক, উচ্ছেদমাত্র অধর্ম্ম'। (পৃ.২৫)	সন্ন্যাসীরা 'অধার্ম্মিক; কেন না তাঁহারাও আর সকল বৃত্তির প্রতি অমনোযোগী হইয়া, দুই একটির সমধিক অনুশীলন করেন।' (পৃ. ২৫)
দুই	'অনুশীলন প্রবৃত্তিমার্গ..ভগবান স্বয়ং কর্ম্মেরই শ্রেষ্ঠতা কীর্ত্তন করিয়াছেন; অনুশীলন কর্ম্মাত্মক।' (পৃ.২৮)	'সন্ন্যাসকে আমি ধর্ম্ম বলি না—অন্তত সম্পূর্ণ ধর্ম্ম বলি না।....—সন্ন্যাস নিবৃত্তিমার্গ। সন্ন্যাস অসম্পূর্ণ ধর্ম্ম'। (পৃ.২৮)
তিন	'জগৎরক্ষার্থ এবং ধর্ম্মাচরণের জন্য দম্পতিপ্রীতি।' (পৃ.১১৯) 'দম্পতিপ্রীতি'-র অনুশীলনেরই সমুচিত ফল 'অপত্যপ্রীতি'।	'যাঁহারা সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বী, তাঁহাদিগের নিকট অপত্যপ্রীতি ও দম্পতিপ্রীতি অতিশয় ঘৃণিত।...দম্পতিপ্রীতি সমুচিত মাত্রায় পরম ধর্ম্ম। তাহা পরিত্যাগ ঘোরতর অধর্ম্ম। অতএব সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বীদিগের এই আচরণ যে মহৎ পাপাচরণ তাহা তোমাকে বলিতে হইবে না।' (পৃ.১২৩)
চার	'অনুশীলন ধর্ম'-এ 'শারীরিকী বৃত্তি' অর্থাৎ 'কামাদি রিপু' অনুশীলিত হয়। অর্থাৎ অনুশীলনের উদ্দেশ্য 'চিত্তসংযম'। অনুশীলিত নারী- পুরুষের 'দম্পতিপ্রীতি কোনভাবেই 'কামবৃত্তি'র আঘাতে বিপর্যস্ত হয় না।	'লোকনিন্দাভয়ে বা পবিত্র চরিত্রের ভান করিয়া বা সন্ন্যাসাদি ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, অনেকে উপভোগ ত্যাগ করেন, কিন্তু কামনা ত্যাগ করিতে পারেন না। তারপর একদিন বালির বাঁধ ভাঙ্গিয়া পাপের স্রোতে সব ভাসিয়া যায়।' (পৃ.১০০)

'দম্পতিপ্রীতি'র সঙ্গে 'সন্ন্যাস'-এর এই দ্বন্দ্ব বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসেও সহজলভ্য। 'চন্দ্রশেখর'-এ রমানন্দ স্বামী যখন মুমূর্ষু প্রতাপকে বলেন—'আমি তোমার অন্তঃকরণ বুঝিয়াছি। ব্রহ্মাণ্ডজয় তোমার এই ইন্দ্রিয়জয়ের তুল্য হইতে পারে না—তুমি শৈবলিনীকে ভালবাসিতে?' (পৃ.১৩১) তখন 'সুপ্ত সিংহ' (পৃ.১৩১) জবাব দেয়—'কি বুঝিবে, তুমি সন্ন্যাসী!' (পৃ.১৩১) 'সন্ন্যাসী' রমানন্দর পক্ষে 'প্রণয়ে আত্মবিসর্জ্জন'-এর আকাঙ্ক্ষা বোঝা সম্ভব নয়। হেমচন্দ্রের গুরু মাধবাচার্য্যেরও একই অবস্থা। বঙ্কিমচন্দ্র

লেখেন—'মাধবাচার্য্য কস্মিন্ কালে স্ত্রীজাতির অনুরাগী নহেন—সুতরাং স্ত্রীচরিত্র বুঝিতেন না।' (পৃ.৬৯) 'অনুশীলন ধর্ম'-এ 'দম্পতিপ্রীতি', 'জাগতিক প্রীতি'-তে আরোহণের 'প্রথম সোপান', যে 'জাগতিক প্রীতি'-রই অংশমাত্র 'স্বদেশপ্রীতি'। আর সন্ন্যাস ধর্ম 'দম্পতিপ্রীতি'কে 'স্বদেশপ্রীতি'র অন্তরায় ভাবে। ফলে মাধবাচার্য্য হেমচন্দ্র-মৃণালিনীর 'দম্পতিপ্রীতি'-র খণ্ডনেই আগ্রহী—'যে পর্যন্ত সেখানে না যবনের সহিত যুদ্ধ কর, সে পর্যন্ত মৃণালিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিবে না।' (পৃ.৭) ফলে সন্ন্যাস সম্পর্কে, বিশেষত 'শারীরিকী বৃত্তি'-র উচ্ছেদ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাব অকরুণ। বঙ্কিম দেখান 'বাসনা' ত্যাগ না করে 'উপভোগ' ত্যাগ করার ফল কত ভয়ঙ্কর; দেখান কীভাবে 'পাপের স্রোতে' ভেসে যায় সন্ন্যাসের রিপু-উচ্ছেদ-প্রকল্প। ইতঃপূর্বেই অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য, তাঁর একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতায় লক্ষ করেছেন বিষয়টি ঃ

> 'বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সকল উপন্যাসেই এক কিংবা একাধিক আদিরসের পরবশ সন্ন্যাসীর চিত্র আঁকিয়াছেন।... বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের সন্ন্যাসী-চরিত্র মাত্রই ব্রতভঙ্গের অপরাধে অপরাধী।'[১৪]

'সন্ন্যাসী-চরিত্র মাত্রই' নিশ্চয় বঙ্কিম-উপন্যাসে ব্রতভঙ্গের অপরাধে অপরাধী নন, কিন্তু, সন্ন্যাস এবং অনুশীলনের দ্বন্দ্বে বঙ্কিম যে সবসময় 'ধর্মতত্ত্ব'-এর একস্বরিক কাঠামোকে সমর্থন করতে পেরেছেন, তাও নয়। ভবানন্দ, অভিরাম স্বামী আর জয়ন্তীর সূত্রে বিষয়টি আমাদের আলোচ্য।

ভবানন্দ

'আনন্দমঠ'-এর সূত্রপাতেই মহেন্দ্রের সঙ্গে ভবানন্দের সাক্ষাৎ হয়। ভবানন্দ ইংরেজদের গুণের কথা বললে, মহেন্দ্র জানতে চায় এ'সব গুণ সন্তানদের আছে কিনা? ভবানন্দের উত্তর—'গুণ গাছ থেকে পড়ে না। অভ্যাস করিতে হয়।' (পৃ. ২৪) অভ্যাস! কী সর্বনাশ! বঙ্কিমচন্দ্র তো 'ধর্মতত্ত্ব'-এর গোড়াতেই বলেছিলেন—'অভ্যাস আর অনুশীলন... এক নহে... অনুশীলন, শক্তির অনুকূল; অভ্যাস, শক্তির প্রতিকূল। অনুশীলনের ফল শক্তির বিকাশ, অভ্যাসের ফল শক্তির বিকার। অনুশীলনের পরিণাম সুখ, অভ্যাসের পরিণাম সহিষ্ণুতা।' (পৃ. ৮) তাই 'আনন্দমঠ'-এর সন্ন্যাসীরা ইন্দ্রিয়-দমনের 'অনুশীলন' করে না, ইন্দ্রিয়-অবদমনের 'অভ্যাস' করে। লক্ষণীয়, 'আনন্দমঠ'-এর দীক্ষার নিয়মাবলী ঃ

এক. 'যে এ ব্রত গ্রহণ করে, তাহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, স্বজনবর্গ, কাহারও সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিতে নাই। স্ত্রী, পুত্র, কন্যার মুখ দেখিলেও প্রায়শ্চিত্ত আছে।' (পৃ. ৫৯) কেননা—'পুত্র কলত্রের মুখ দেখিলেই আমরা দেবতার কাজ ভুলিয়া যাই।' (পৃ. ৫৯) অনুশীলিত 'দম্পতিপ্রীতি' আর 'অপত্যপ্রীতি'-র থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত সন্তানধর্ম!

দুই. 'ইন্দ্রিয় জয় করিবে? স্ত্রীলোকের সঙ্গে একাসনে বসিবে না?... বসিব না। ইন্দ্রিয় জয় করিব।' (পৃ. ৬১) কী অদ্ভুত বৈপরীত্য! কেউ যদি 'ইন্দ্রিয় জয়' করেই ফেলে, তবে তার 'স্ত্রীলোকের সঙ্গে' 'একাসনে' বসায় বাধা কোথায়? 'আনন্দমঠ'-এ দীক্ষার নিয়মাবলীর মধ্যেই রয়ে গেছে 'অভ্যাস'-এর সীমাবদ্ধতা।

এই 'অভ্যাস'-এর মধ্যেই কাটছে ভবানন্দের জীবন। ভবানন্দ—'যুবা পুরুষ—ঘনকৃষ্ণ গুম্ফশ্মশ্রুতে তাহার চন্দ্রবদন আবৃত—সে বলিষ্ঠকায়, অতি সুন্দর পুরুষ।' (পৃ. ১৫) অভ্যাসে 'কামাদি' রিপুকে 'বালির বাঁধ' দিয়ে রেখেছিল ভবানন্দ। সেই অর্গল ভেঙে গেল নদীকূলশায়িনী 'দীপ্ত স্ত্রীমূর্ত্তি' (পৃ. ৪৭)-তে প্রাণদান করতে গিয়ে। 'সেবা'র ছিদ্রপথে ভবানন্দের 'কামবৃত্তি'-র বন্ধনমুক্তি ঘটল। সত্যানন্দের সঙ্গে কথোপকথনে ভবানন্দ যখন জানতে পারল, যাকে সে বাঁচিয়েছে, সে কল্যাণী, তাঁরই গুরু-ভ্রাতা মহেন্দ্রের স্ত্রী, তখন তাঁর আচরণ লক্ষণীয়—'ভবানন্দ চমকিয়া উঠিলেন। তখন তিনি বুঝিলেন যে, যে স্ত্রীলোককে তিনি ঔষধবলে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন, সেই মহেন্দ্রের স্ত্রী কল্যাণী। কিন্তু কোন কথা প্রকাশ করা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন না।' (পৃ. ৫৭) কেন 'কোন কথা' প্রকাশ করলেন না ভবানন্দ? কারণ—'কল্যাণীর রূপে তাহার হৃদয় কাতর হইয়াছিল' (পৃ. ৬৭)।

'রূপ-বহ্নি' 'বিবিক্ষু' ভবানন্দ-পতঙ্গের অধঃপতনের করুণ চিত্রই এরপর উঠে আসে উপন্যাসে। চার বছর ধরে কল্যাণীকে প্রেম নিবেদন করতে-থাকা ভবানন্দের আত্মকথনে ফুটে ওঠে সন্তানধর্মের ব্যর্থতা, সন্ন্যাসের সমস্যা আর অভ্যাসের কুফল—'যে দিন তোমায় প্রাণদান করিয়াছিলাম, সেই দিন হইতে আমি তোমার পদমূলে বিক্রীত। আমি জানিতাম না যে, সংসারে এ রূপরাশি আছে। এমন রূপরাশি আমি কখন চক্ষে দেখিব জানিলে, কখন সন্তানধর্ম গ্রহণ করিতাম না। এ ধর্ম এ আগুনে পুড়িয়া ছাই হয়।' (পৃ. ৮০) ভবানন্দ সন্তানধর্মের কঠোর নিয়মাবলী সম্পর্কে ওয়াকিবহাল—'মৃত্যু আমার প্রায়শ্চিত্ত; কেন না, আমার চিত্ত ইন্দ্রিয়ের বশ হইয়াছে।' (পৃ. ৮০) শেষতক্ তাই যুদ্ধক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় প্রাণবিসর্জন দেয় ভবানন্দ!

অননুশীলিত 'কামবৃত্তি' নিয়ে 'দম্পতিপ্রীতি'তে আঘাত হেনেছিল যে সন্ন্যাসী ভবানন্দ, সঙ্গতভাবে 'ধর্মতত্ত্ব'-এর কাঠামো মেনেই সেই 'ব্রতচ্যুত অধর্মী' (পৃ. ৮১) কে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হল। কিন্তু, এতই একমাত্রিক নয় ভবানন্দের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাব। 'ধর্মতত্ত্ব'-এর নির্লিপ্ত বাচনের বাইরে দাঁড়িয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে স্বীকার করতে হয়, ভবানন্দের মতো আশ্চর্য চরিত্রকে এক কথায় অপরাধী সাব্যস্ত করা সমস্যার। লক্ষ করা যাক, দুটি অংশ ঃ

এক. ভবানন্দের 'কামবৃত্তি' অননুশীলিত। ফলে 'বালির বাঁধ' ভেঙে গেলে, আর সামলাতে পারেন না তিনি। বেশ। কিন্তু—'দাহ! কল্যাণি দাহ! জ্বালা! কিন্তু জ্বলিবে যে ইন্ধন, তাহা আর নাই।' (পৃ. ৮০)—এ'কথা যে বলে, সেই ভবানন্দকে কি নিছক কামুক বলে মনে হয়? কল্যাণীর নিষ্করুণ নির্লিপ্ততার কাছে প্রতিহত হতে হতে, যে ভবানন্দ 'সাশ্রুলোচনে' (পৃ. ৮১) বিদায় নেয়, চোখের জল ফেলা সেই পুরুষটিকে 'কামবৃত্তি'-পরায়ণ বলে অনায়াসে ধিক্কার জানানো সম্ভব কি?

দুই. হোক্ সন্ন্যাসী; হোক্ তাঁর অননুশীলিত 'কামবৃত্তি'। তার মধ্যেই ক্রমজায়মান কোন এক 'প্রীতি'র আভাসে উজ্জ্বল ভবানন্দ। তাঁকে নিছক ধিক্কার জানানো 'ধর্মতত্ত্ব'কারের পক্ষেও অসম্ভব। তাই ভবানন্দের মৃত্যুতেই বঙ্কিমচন্দ্রের সেই বিরল আর্তনাদ—'হায়! রমণীরূপলাবণ্য! ইহ সংসারে তোমাকেই ধিক্।' (পৃ. ৯৬)।

অভিরাম স্বামী

'মাতৃপিতৃদুষ্কৃতিভারে আবরণ নিবেদন করাই কর্ত্তব্য।' (পৃ. ৮২) এ কথা জেনেও বিমলা তার পত্রে উন্মোচিত করেছে তার পিতা অভিরাম স্বামীর পূর্বজীবনের পাপ। যৌবনে গড় মান্দারণের নিকটে থাকতেন শশিশেখর ভট্টাচার্য্য—'জগদীশ্বর শশিশেখরকে সর্ব্বপ্রকার গুণ দান করিয়াও এক দোষ প্রবল করিয়া দিয়াছিলেন, সে যৌবনকালের প্রবল দোষ।' (পৃ. ৮১) সেই দোষে দুষ্ট শশিশেখর, দু'বার দু'টি নারীর (একজন বিমলার মা, অন্যজন তিলোত্তমার মাতামহী) গর্ভ উৎপাদন করেন। প্রায় কুড়ি বছর বাদ তার জীবন-নাট্যের যবনিকা উঠলে দেখা গেল, শশিশেখর ভট্টাচার্য্যের পরিচয় ত্যাগ করে তিনি হয়েছেন অভিরাম স্বামী। কেমন সন্ন্যাসী তিনি? অভিরাম স্বামী 'পরমহংস' (পৃ. ১৩৩)। 'পরমহংস'দের সম্পর্কে সামান্য তথ্য উদ্ধার করা যাক ঃ

> '...পরমহংসেরা কেবল প্রণব জপ ও জ্ঞানানুশীলন করিয়া থাকেন।... পরমহংস ত্রিদণ্ড, ...যজ্ঞোপবীত ও নিত্য-কর্ম পরিত্যাগ করিবে। কৌপীন, আচ্ছাদন-বস্ত্র, শীত-নিবারিকা কন্থা, যোগপট্ট, বহির্বাস, পাদুকা, ছত্র, অক্ষমালা ও বংশ-দণ্ড গ্রহণ করিবে। ...অতিভোজন করিলে ও রিপু-পরতন্ত্র হইলে, যোগাভ্যাসে মনঃসংযোগ হয় না, এজন্য পরমহংসদের অপরিমিত আহার এবং কাম, ক্রোধ, শোক, মোহ, হর্ষ, বিষাদ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবার ব্যবস্থা আছে।...পরমহংসদের এক একটি দল আছে, তাহাকে মণ্ডলী কহে; যেমন মঠের

অধ্যক্ষকে মোহন্ত বলে, সেইরূপ পরমহংস-মণ্ডলীরও একজন অধ্যক্ষ বা কর্তা থাকেন; তাঁহার নাম স্বামী।'[১৫] (নিম্নরেখাঙ্কন আমাদের)

'পরমহংস'দের আচরণীয় কোনোকিছুই কি আমরা অভিরাম স্বামীর মধ্যে লক্ষ করেছি? ক্রোধ-শোক-হর্ষ যা-কিছু 'পরমহংস'দের পরিত্যজ্য, সে-সম্পর্কে অভিরাম স্বামীর পরীক্ষা প্রার্থণীয় ঃ

ক্রোধ ঃ 'এই কথা বলিবামাত্র ক্রোধে পরমহংসের চক্ষু হইতে অগ্নি স্ফূরিত হইতে লাগিল' (পৃ. ২১)।

শোক ঃ 'ব্রাহ্মণ অধোমুখে বসিয়া রোদন করিতেছেন।' (পৃ. ১৩১)

হর্ষ ঃ অভিরাম স্বামী পুতি ফেলিয়া উঠিয়া রাজপুত্রকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন, পুতির উপর যে পা দিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাহা জ্ঞান নাই।' (পৃ. ১৩৫)

এ'হেন যে 'পরমহংস' তিনি 'জ্ঞানানুশীলন' পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণ উপন্যাস জুড়েই ক্রিয়াশীল থাকেন পুত্রী বিমলা আর পৌত্রী তিলোত্তমার ভাগ্যনির্মাণে। অনুমান করা যায় কি, যৌবনে 'কামবৃত্তি'র যে অতি-অনুশীলনে শশিশেখর 'দম্পতিপ্রীতি'-র অমর্যাদা করেছিলেন, প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে শুদ্ধচিত্ত অভিরাম স্বামী নিজের কন্যা এবং পৌত্রীর সেই 'দম্পতিপ্রীতি'-র মঙ্গলার্থেই স্বেচ্ছানিয়োজিত থাকলেন? তাই যদি হয়, তবে মানতেই হয় সন্ন্যাস 'পরমহংসে'র কামাদি-রিপু উচ্ছিন্ন করতে পারেনি, বরং অনুশীলন তাঁর অপরিস্ফূট 'দম্পতিপ্রীতি'কে উন্নীত করেছে 'অপত্যপ্রীতি' ও 'স্বজনপ্রীতি'-তে। গীতা-অনুবাদে বঙ্কিম লিখেছিলেন—'কূর্ম্ম তাহার হস্তপদাদি সংহৃত করিয়া রাখে—ধ্বংস করে না, এবং আবশ্যকমত তদ্দ্বারা জৈবনিক কার্য্য নির্বাহ করে। ইন্দ্রিয়াদি সম্বন্ধেও তাই। ইহার সংযম ধর্ম্ম, ধ্বংস ধর্ম্ম নহে।' (পৃ. ১০০) আর অভিরাম স্বামী সম্পর্কে উপন্যাসকারের মন্তব্য—'সাংসারিক অধিকাংশ বিষয়ে রিপু সংযত করা অভ্যাস করিয়াছিলেন' (পৃ. ১৪)। সন্ন্যাসের বাহ্যিক আচরণের আড়ালে তবে কি অনুশীলন ধর্মই পালন করে চলেছেন অভিরাম স্বামী?

এইসূত্রেই লক্ষ করতে পারি আমরা অপছন্দের সন্ন্যাসকে নির্জিত করে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে এমনকী সন্ন্যাসীদেরও ঠেলে দিয়েছেন অনুশীলনের পথে। 'কপালকুণ্ডলা'র অধিকারী, 'বিষবৃক্ষ'-এর শিবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, 'চন্দ্রশেখর'-এর রমানন্দ স্বামী, 'রজনী'র 'দণ্ডী' বা 'অবধূত' সন্ন্যাসী, এঁরা সকলেই সন্ন্যাসী হওয়া সত্ত্বেও মোক্ষবাঞ্ছা করার চেয়ে সংসার তথা 'দম্পতিপ্রীতি'কে কোন-না-কোনভাবে ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা করেছে। এহো বাহ্য। যে কমলাকান্ত 'বিবাহ' না-করে 'অন্তরের অন্তরে সন্ন্যাসী' (পৃ. ৭০) হয়ে গেল, যে গোবিন্দলাল 'সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ' (পৃ. ৯২) ধারণ করে 'ভ্রমরাধিক

ভ্রমর' (পৃ. ৯২)-এর সন্ধানরত, আর যে অমরনাথ 'ভবের হাট' থেকে 'দোকানপাট' তুলে 'আমি সন্ন্যাসী' (পৃ. ৮০) বলে 'কাশ্মীর' যাত্রা করল, লক্ষণীয় তাদের প্রত্যেকেরই সন্ন্যাসের একটিমাত্র কারণ ঃ ব্যর্থ দম্পতিপ্রণয়াকাঙ্ক্ষা। জানতে ইচ্ছা করে অপ্রাপণীয় দম্পতিপ্রীতি আর সন্ন্যাস কি তবে বঙ্কিম-মানসে, একে অন্যের পরিপূরক? তাই কি 'ধর্মতত্ত্ব'-এর একস্বরিক কাঠামোর মধ্যে সন্ন্যাসকে তীব্র ভর্ৎসনা করলেও, প্রয়োগক্ষেত্রে, উপন্যাসের সন্ন্যাসীরা সম্মানিত, এমনকী আশ্চর্য এক কারুণ্যে ভূষিত?

জয়ন্তী

সন্ন্যাসধর্মের মধ্যে অন্তর্ঘাত করে যায় বঙ্কিম-কল্পিত অনুশীলন ধর্ম—আমাদের এই ঘাতসহ অনুমানের আরেক মূর্তিমতী প্রমাণ 'সীতারাম' উপন্যাসের জয়ন্তী। বঙ্কিম-উপন্যাসের চরিত্রচিত্রশালায় জয়ন্তী একমাত্র সন্ন্যাসিনী।

উপন্যাসের পরিসরে জয়ন্তীর প্রথম আবির্ভাব 'বৈতরণী সৈকতে' (পৃ. ৫৬)। এ'পারেই 'যমযন্ত্রণা' (পৃ. ৫৬) ভোগ করছে যে স্বামীপরিত্যক্তা শ্রী, তাকে সন্ন্যাসিনী জয়ন্তী বোঝায়—'ও পারে যে যন্ত্রণার কথা শুনিতে পাও, সে আমরা এই পার হইতে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাই।' (পৃ. ৫৭) অচিরেই প্রায়-সমবয়স্কা জয়ন্তীর সঙ্গে 'সখীত্বে' বাঁধা পড়ে শ্রী। জয়ন্তীর পরামর্শেই শ্রী সন্ন্যাসিনীর 'ছদ্মবেশ' ধারণ করে—'এখন এই বেশ ছদ্মবেশস্বরূপ গ্রহণ কর না—তাতে দোষ কি?' (পৃ. ৫৮) এ কেমন সন্ন্যাসিনী, যে 'সন্ন্যাস'কে 'ছদ্মবেশ'স্বরূপ ধারণ করতে বলে? অচিরেই শ্রী বুঝতে পারে তার 'সমবয়স্কা প্রব্রজিতা'-র—'জীবনস্রোতঃ কিছুই শুকায় নাই।' (পৃ. ৬০) ফলে 'দুই দিন' একত্র যাপনের পরই গাঢ় হল 'সখীত্ব', সন্ন্যাসিনী শ্রীর সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়ে বসল—'এ দুই দিন, মা! বাছা! বলিয়া কথা হইতেছিল,... সন্ন্যাসিনী সে সম্বোধন ছাড়িয়া বহিন্ সম্বোধন' (পৃ. ৬৪)-এ আপ্যায়িত করল শ্রীকে। শ্রী জয়ন্তীর কাছে কবুল করল স্বামীর প্রতি তার প্রগাঢ় অনুরাগ—'স্ত্রীলোকের একমাত্র পুণ্য স্বামিসেবা।... স্বামী ছাড়িয়া আমি ঈশ্বরও চাহি না। আমার স্বামীকে আমি ত্যাগ করিয়াছি বলিয়া আমার যে দুঃখ, আর ঈশ্বর পাইলে আমার যে সুখ, ইহার মধ্যে আমার স্বামি-বিরহদুঃখই আমি ভালবাসি।' (পৃ. ৬৫) আর স্বামীকে ভালবাসে বলেই 'প্রিয়প্রাণহন্ত্রী' সে, স্বামীকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। 'দম্পতিপ্রীতি' চ্যুত 'বহিন্'-এর জীবনকথা শুনে—'জয়ন্তীর চক্ষু ছল ছল করিল।' (পৃ. ৬৬) সন্ন্যাসের রিপু-উচ্ছেদ-প্রকল্প জয়ন্তীর অভ্যাসগত হয়েছে কই? বাধ্যতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশ্ন—'এমন সন্ন্যাসিনী কি সন্ন্যাসিনী?' (পৃ. ৬৬)

এক বৎসর পর উড়িষ্যা থেকে গঙ্গাধর স্বামীর আদেশে মহম্মদপুরে ফিরল শ্রী আর জয়ন্তী।

ইতোমধ্যে জয়ন্তীর 'শিষ্যা' (পৃ. ৮৫) শ্রী, জয়ন্তীর কাছে শিখেছে 'নিষ্কাম' ধর্মের কথা, 'অনাসক্তি'র কথা। কি শিখেছে সন্ন্যাসিনী শ্রী?—'আমি সন্ন্যাসিনী; সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছি।... যে সব কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে, তাহার পতিসেবাও ধর্ম্ম নহে; দেবসেবাও তাহার ধর্ম্ম নহে।' (পৃ. ১২০) গীতোক্ত 'অনাসক্তি'-র 'ধর্মতত্ত্ব'-এর একেবারে বিপরীত যে অর্থ শ্রী করেছে, তা সে কোত্থেকে শিখেছে? তার মতে জয়ন্তীর থেকে—'সন্ন্যাসিনীর ধর্ম্ম শিখাইয়াছ, তাই শিখিয়াছি।' (পৃ. ১৩৯) কিন্তু, সত্যিই কি জয়ন্তী তা-ই শিখিয়েছে? জয়ন্তীর উত্তর নঞর্থক—'আমি কি তাই শিখাইয়াছিলাম? আমি কি শিখাই নাই যে, অনুষ্ঠেয় যে কর্ম্ম, অনাসক্ত হইয়া ফলত্যাগপূর্বক তাহার নিয়ত অনুষ্ঠান করিলেই কর্ম্মত্যাগ হইল, নচেৎ হইল না? স্বামিসেবা কি তোমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম নহে?' (পৃ. ১৫৩) অর্থাৎ জয়ন্তী যে-শিক্ষা শ্রীকে দিতে চেয়েছিল, তা স্পষ্টতই 'ধর্মতত্ত্ব'-এর কাঠামো-মাফিক আদর্শ গৃহিণী হয়ে-ওঠার শিক্ষা। যে শিক্ষায় শিক্ষিত প্রফুল্ল, যে-শিক্ষা ইন্দিরা বা চঞ্চলকুমারীর মজ্জাগত, এ সেই শিক্ষা। জয়ন্তীর প্রদত্ত শিক্ষা সন্ন্যাসের 'শারীরিকী বৃত্তি' উচ্ছিন্ন করার শিক্ষা নয়; 'অনুশীলন ধর্ম'-এর 'ইন্দ্রিয় সংযম'-এর শিক্ষা—'যদি ইন্দ্রিয়গণ তোমার বশ্য নয়, তবে তোমার স্বামিসেবা সকাম হইয়া পড়িবে। অনাসক্তি ভিন্ন কর্ম্মানুষ্ঠানে কর্ম্মত্যাগ ঘটে না।' (পৃ. ১৫৩) সন্ন্যাসকে ছদ্মবেশমাত্র করে অনুশীলন ধর্মের পাঠ পড়িয়ে যাওয়া আশ্চর্য এই সন্ন্যাসিনী সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের সংশয়ই যথার্থ—'এমন সন্ন্যাসিনী কি সন্ন্যাসিনী?' (পৃ. ৬৬)

অনুশীলন ও ব্রহ্মচর্য ঃ

মুসলিম নিপীড়নে-শাসনে, হিন্দু পুরুষ হারিয়েছে তার পূর্বগৌরব, তার আর্যত্ব। সেই হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করতে হবে—এই ছিল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের হিন্দু জাতীয়তাবাদের মূল সুর। সেই হৃতগৌরব ফিরে পাওয়ার প্রথম ধাপে ছিল হৃত স্বাস্থ্যের-শক্তির পুনরুদ্ধারের বাসনা। শৌর্যে-বীর্যে যারা একদিন ছিল ভীমার্জুনের বংশধর, আজ তারা হীনবল-হীনবীর্য!—এমন একটা আক্ষেপ তাই জাতীয়তাবাদী রচনায় অহরহ শোনা যেত। ঈশানচন্দ্র বসুর 'চিত্ত-বিনোদ' কাব্যটি প্রকাশিত হয় ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে। এর দ্বিতীয় সর্গেই পাই, কবির আক্ষেপ ঃ

'একেত পরাধীনতা অনর্থের মূল
বিনাশে ইহাতে রূপ, গুণ, বল বীর্য
পৌরুষত্ব।'[১৬] (নিম্নরেখাঙ্কন আমাদের)

লক্ষণীয়, আর্য-হিন্দুত্বের পুনর্জাগরণের জন্য যে 'বীর্য'বান হওয়ার সাধনায় সেদিন বাঙালি মেতেছিল, তা উভয়ার্থেই প্রযুক্ত—'বল' এবং 'পৌরুষত্ব'। এই দু'য়ের সাধনাতেই সেদিন মেতেছিল বাঙালি হিন্দু। 'বল'-এর সাধনায় তার মনোনিবেশের প্রমাণ মিলবে বাঙালির ব্যায়াম সমিতি এবং কুস্তির আখড়া স্থাপনে। আর 'বীর্য'-এর অনুশীলনে বাঙালির সেদিন সবচেয়ে বড় হাতিয়ার 'ব্রহ্মচর্য'।

পূর্ণানন্দ স্বরূপ স্বামীর একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় 'ধর্মপ্রচারক' মাসিকপত্রের পাতায়। মুখ্যত ১৮৯৩ থেকে ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে প্রবন্ধগুলি রচিত ও মুদ্রিত। সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠা থেকে প্রবন্ধগুলি গ্রন্থাকারে সংকলিত হয় ১৩৪২ বঙ্গাব্দে, 'চিন্তামণি-মালা' নামে। তারই একটি প্রবন্ধ—'ব্রহ্মচর্যের অভাবে অপকার।' পূর্ণানন্দ স্বামীর বক্তব্য ঃ

> 'দশটি বিধবার বিবাহ দিতে বিড়ম্বিত হওয়া অপেক্ষা যদি কেহ আপনার একটি ছেলেকেও বিহিত ব্রহ্মচর্যে রাখিয়া শাস্ত্রাধ্যয়ন করাইতে পারেন তবে হিন্দুমাত্রের নিশ্চয়ই তিনি শ্রদ্ধেয় ও সমাজে কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।'[১৭]

কিন্তু এতো না-হয় ছিল, তাদের কথা, যারা এখনো প্রবেশ করেনি বিবাহিত জীবনে। আর যারা প্রবেশ করেছে, তাদের তবে কী হবে? তাদের জন্য নিদান হাঁকা হয় 'বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য'। 'নীচ ইন্দ্রিয় সুখভোগে' যেন 'আসক্ত' না হয়ে পড়ে বাঙালি যুবক-যুবতী। ১৮৮৪ সালে মুদ্রিত সূর্য্যনারায়ণ ঘোষের 'বৈজ্ঞানিক দাম্পত্য-প্রণালী' বইটির কিছু অংশ উদ্ধার করলেই বোঝা যায় হিন্দু-জাতীয়তাবাদের উদ্বেগ এবং শঙ্কামুক্তির উপায় ঃ

> 'নরনারীর একত্র মিলনই ইন্দ্রিয়সেবন নামে অভিহিত। ইন্দ্রিয়সেবনে শরীরের প্রত্যেক গ্রন্থি প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও স্নায়ু আমূল কম্পিত হয়, দৈহিক ও মানসিক বলবিশেষ খর্ব্ব হয় এবং সেই সঙ্গে দেহের সারাংশ ক্ষয়িত ও দেহচ্যুত হয়। ইন্দ্রিয়সেবন মাত্রই ক্ষতিকর। মিত হউক অমিত হউক কালে হউক অকালে হউক প্রয়োজনে হউক আর অভিলাষেই হউক ইন্দ্রিয়সেবনে নিশ্চিতরূপে দেহ ক্ষয় করিবে। ...বৈজ্ঞানিক অপ্রাপ্ত বয়সে বিবাহ ও ইন্দ্রিয়সেবন আরম্ভ, কালাকাল ভেদ না মানিয়া অতিরতি উপভোগ ও ব্যাভিচার পাপের উত্তরোত্তর প্রাদুর্ভাব এই সকল কারণে বাঙ্গালি জাতিকে ক্রমশঃ সর্ব্বনাশের নিকট লইয়া যাইতেছে।'[১৮]

সমকালীন হিন্দু জাতীয়তাবাদের ধারায় গৌরবান্বিত এই 'ব্রহ্মচর্য'-এর ধারণা থেকে শতহস্ত দূরে

বঙ্কিমচন্দ্রের 'অনুশীলন ধর্ম'-এর 'দম্পতিপ্রীতি'-র অবস্থান। এমনকী 'দম্পতিপ্রীতি'-র অন্তর্গত পর্যাপ্ত 'কামবৃত্তি'-র দাবিও মান্যতা পায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্মতত্ত্ব'-এর কাঠামোয়। 'ব্রহ্মচর্য'-এ 'শারীরিকী বৃত্তি'র উচ্ছেদ আর 'ধর্মতত্ত্ব'-এ 'শারীরিকী বৃত্তি'-র অনুশীলন। যৌনতা-প্রসঙ্গে হিন্দু জাতীয়তাবাদ আর বঙ্কিমি-মননের অবস্থান যুযুধান বৈপরীত্যে! হিন্দু জাতীয়তাবাদের এই 'শারীরিকী বৃত্তি'-র উচ্ছেদ-প্রকল্প বাস্তব জীবনে যে কতটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি করত, তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ 'প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ'-এর গুরু মতিলাল রায়ের করুণ স্বীকারোক্তি ঃ

> 'ব্রহ্মচর্য ব্রত তো গ্রহণ করিলাম কিন্তু দেহ-প্রাণ-মন সেকথা শুনিবে কেন? সে এক নূতন দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিয়া বসিলাম।... প্রবৃত্তিতাড়নায় আমার মন স্থির করিয়া লইল—ইহা একটি অস্বাভাবিক আবরণ; নিয়মিতভাবে ইন্দ্রিয়সেবাই বিবাহিত জীবনের ব্রহ্মচর্য। কিন্তু বিপদ হইল তাঁহাকে (স্ত্রী) একথা বুঝাইতে পারিলাম না।... তখন জোর আরম্ভ করিলাম... তাঁর নিদ্রিতাবস্থায় পাশববৃত্তি চরিতার্থ করার সুযোগটুকুও ছাড়িয়া দিতাম না।... প্রতি তিন চারিদিন অন্তর নিদ্রিতাবস্থায় স্খলিতবীর্য হইয়া তাঁর কাছে কাতরভাবে মিনতি জ্ঞাপন করি।'[১৯]

আর 'শারীরিকী বৃত্তি'র জাতীয়তাবাদী-উচ্ছেদ বনাম বঙ্কিমি-অনুশীলনে, বঙ্কিমচন্দ্রের করুণ পরাজয়ের সাক্ষী 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের জীবানন্দ-শান্তি।

শান্তি-জীবানন্দ

বাল্যেই মাতৃহারা শান্তি, বাবার টোলের 'ছাত্র'দের কাছে মানুষ হয়েছে। 'শৈশবে নিয়ত পুরুষ-সাহচর্য্যের' (পৃ. ৫০) ফলে শান্তির মধ্যে নারীসুলভ লালিত্যের অভাব ঘটেছিল। পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে 'নিরাশ্রয়' (পৃ. ৫০) শান্তিকে, তাঁর পিতারই ছাত্র জীবানন্দ 'বিবাহ করিলেন' (পৃ. ৫১)। শ্বশুর শাশুড়ীর তাড়নে-ভর্ৎসনায় শান্তি গৃহত্যাগিনী হল। একদল সন্ন্যাসীর সঙ্গে মিলে সে 'দেশ বিদেশ পর্যটন' (পৃ. ৫১) করে বেড়াতে লাগল। 'ক্রমশঃ তাহার যৌবন-লক্ষণ দেখা দিল।' (পৃ. ৫১) তার মধ্যে জেগে উঠল 'স্ত্রী স্বভাব' (পৃ. ৫২)। ফল?—'শান্তি সন্ন্যাসিসম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।' (পৃ. ৫২) জীবানন্দের কাছে ফিরে এল শান্তি। আশ্চর্য এই 'দম্পতিপ্রীতি'! অনন্যব্রত—'আমি আর আমার স্বামী এক আত্মা' (পৃ. ৮৫)। ফলে গৃহত্যাগিনী শান্তিকে এক লহমায়, কোন সন্দেহ-সংশয় ব্যতিরেকেই আত্মগৃহে স্থান দিলেন জীবানন্দ—'স্বামি-সহবাসে শান্তির চরিত্রের পৌরুষ দিন দিন বিলীন বা প্রচ্ছন্ন

হইয়া আসিল। রমণীয় রমণী চরিত্রের নিত্য নবোন্মেষ হইতে লাগিল। সুখস্বপ্নের মত তাঁহাদের জীবন নির্ব্বাহিত হইত; কিন্তু সহসা সে সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইল।' (পৃ. ৫৩)

জীবানন্দ-শান্তির দাম্পত্য-সুখস্বপ্ন ভেঙে দিলেন 'আনন্দমঠ'-এর মঠাধিকারী সত্যানন্দ মহারাজ। তাঁর 'দক্ষিণ হস্ত' (পৃ. ৬৫) হয়ে দেশোদ্ধার ব্রতে দীক্ষা নিল জীবানন্দ। গ্রহণ করল সন্তান ধর্ম। শপথ নিল—'জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ... স্ত্রী নাই...।' (পৃ. ২১) 'অনুশীলন ধর্ম'-এর একেবারে বিপরীতে 'সন্তান ধর্ম'। 'দম্পতিপ্রীতি'-কে অস্বীকার করতে চায় তা। শুধু তাই নয়, আগেই আমরা লক্ষ করেছি, 'সন্তান ধর্ম'-এর বিশ্বাস 'অভ্যাস'-এ, 'অনুশীলন'-এ নয়। ফলে সত্যানন্দের এই ব্রতের পরিকল্পনা যেমন মিথ্যা, তেমনই মিথ্যা জীবানন্দের শপথ। একটু লক্ষ করা যাক। ক্ষুধা-তৃষ্ণা ইত্যাদি 'শারীরিকী বৃত্তি'। 'অনুশীলন ধর্ম'-এ 'শারীরিকী বৃত্তি' অনুশীলিত হয়, আর 'সন্তান ধর্ম'-এ 'বৃত্তি'র 'অভ্যাস' করতে হয়। সেই 'অভ্যাস'-এর ফল? 'আনন্দমঠ'-এ সুপ্রচুর খাদ্য জোটে না—'জীবানন্দের অদৃষ্টে এরূপ আহার অনেক কাল হয় নাই।' (পৃ. ৪১) না খাওয়ার 'অভ্যাস'-এ নিজেকে অভ্যস্ত করেছেন জীবানন্দ; পরিমিত আহারের 'অনুশীলন' করেননি। ফলে যেদিন বোন নিমাইয়ের বাড়ি গেলেন তিনি, সেদিন ভেঙে গেল 'অভ্যাস'-এর বাঁধ; দু'জনের আহার্য এবং একখানি 'পাকা কাঁটাল' সবই 'ধ্বংসপুরে' (পৃ. ৪২) পাঠিয়ে দিলেন জীবানন্দ! যাঁর ক্ষুধা-বৃত্তির এই অবস্থা, তাঁর কাম-ক্ষুধার কি হবে?

সঙ্গতভাবেই জীবানন্দ শান্তির কাছে স্বীকার করেন, তাঁর কামনার 'অভ্যাস'-এর বাঁধ শান্তিকে দেখে ভেঙে গেছে। প্রণয়স্রোতে ভেসে যাচ্ছে 'দেশ'—'এক দিকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, জগৎসংসার; এক দিকে ব্রত, হোম, যাগ, যজ্ঞ; সবই এক দিকে, আর এক দিকে তুমি। একা তুমি। ... দেশ তো শান্তি, দেশ লইয়া আমি কি করিব? দেশের এক কাঠা ভূঁই পেলে তোমায় লইয়া আমি স্বর্গ প্রস্তুত করিতে পারি, আমার দেশে কাজ কি? দেশের লোকের দুঃখ,—যে তোমা হেন স্ত্রী পাইয়া ত্যাগ করিল—তাহার অপেক্ষা দেশে আর কে দুঃখী আছে?' (পৃ. ৪৫) জীবানন্দের মননে 'দম্পতিপ্রীতি'-র অন্তর্গত 'অভ্যাস' জনিত বিকারগ্রস্ত 'কামবৃত্তি'-র অতিরেকী ভাবনা 'স্বদেশপ্রীতি'-র অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণায় 'ব্রহ্মচর্য'-এর 'অভ্যাস' শুধু 'দম্পতিপ্রীতি'র 'অনুশীলন'-এ আঘাত হানে না, তা একই সঙ্গে 'স্বদেশপ্রীতি'-রও পরিপন্থী।

'আনন্দমঠ'-এর গোড়াতেই বঙ্কিম লিখেছিলেন—'বাঙ্গালীর স্ত্রী অনেক অবস্থাতেই বাঙ্গালীর প্রধান সহায়।' (পৃ. ৩) জীবানন্দের 'প্রধান সহায়' শান্তি। 'অনুশীলন ধর্ম'-এর প্রাণময়ী প্রতিমা সে; দেবী চৌধুরাণীর দোসর। 'ধর্মতত্ত্ব'-এর মাপে একটু লক্ষ করা যাক শান্তির 'অনুশীলন'-এর স্বরূপ ঃ

শারীরিকী বৃত্তি	'শান্তি তাহাদিগের দলে থাকিয়া ব্যায়াম করিত, অস্ত্রশিক্ষা করিত এবং পরিশ্রমসহিষ্ণু হইয়া উঠিল।' (পৃ. ৫১)
কার্য্যকারিণী বৃত্তি	'কুটীর মধ্যে শতগ্রন্থিযুক্ত বসনপরিধানা রুক্ষকেশা এক স্ত্রীলোক বসিয়া চরকা করিতেছিল।' (পৃ. ৪৩)
জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি	'ব্যাকরণের এক বর্ণ জানে না, কিন্তু ভট্টি, রঘু, কুমার, নৈষধাদির শ্লোক ব্যাখ্যা সহিত মুখস্ত করিতে লাগিল।' (পৃ. ৫০)
চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি	শান্তির গলায় 'অপূর্ব গীতিধ্বনি' (পৃ. ৫৫) শুনতে পাওয়া গেছে ঃ 'দড় বড়ি ঘোড়া চড়ি কোথা তুমি যাও রে। সমরে চলিনু আমি হামে না ফিরাও রে।' (পৃ. ৫৫)

বুঝতে অসুবিধা হয় না শান্তির 'দম্পতিপ্রীতি' বা তদন্তর্গত 'কামবৃত্তি' সবই অনুশীলিত। ফলে, জীবানন্দের, 'স্বদেশপ্রীতি'-র আড়ে আসা 'কামবৃত্তি'-ময় 'দম্পতিপ্রীতি'কে নির্জিত করে সে—'ছি—তুমি বীর। আমার পৃথিবীতে বড় সুখ যে, আমি বীরপত্নী। তুমি অধম স্ত্রীর জন্য বীরধর্ম্ম ত্যাগ করিবে? তুমি আমায় ভালবাসিও না—আমি সে সুখ চাহি না—কিন্তু তুমি তোমার বীরধর্ম্ম কখনও ত্যাগ করিও না।' (পৃ. ৪৫)

অনুশীলিতা এই শান্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়েই তাই অনাবৃত হয়ে পড়ে 'সন্তান ধর্ম'-এর ফাঁক-ফাঁকি। সত্যানন্দ-শান্তির প্রশ্নোত্তর পর্বটি লক্ষণীয় ঃ

সত্যানন্দের প্রশ্ন	**শান্তির উত্তর**
এক. 'কেন এ পাপাচার করিতে আসিলে?' (পৃ. ৬৫)	এক. 'পত্নী স্বামীর অনুসরণ করে, সে কি পাপাচরণ? সন্তানধর্মশাস্ত্র যদি একে পাপাচরণ বলে, তবে সন্তানধর্ম অধর্ম। আমি তাঁহার সহধর্মিণী, তিনি ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত, আমি তাঁহার সঙ্গে ধর্মাচরণ করিতে আসিয়াছি। (পৃ. ৬৫)
দুই. 'পত্নী কেবল গৃহধর্মেই সহধর্মিণী—বীরধর্মে রমণী কি?' (পৃ. ৬৫)	দুই. 'কোন্ মহাবীর অপত্নীক হইয়া বীর হইয়াছেন? রাম সীতা নহিলে কি বীর হইতেন?' (পৃ. ৬৫)
তিন. 'কিন্তু রণ-ক্ষেত্রে কোন্ বীর জায়া লইয়া আইসে?' (পৃ. ৬৫)	তিন. 'অর্জুন যখন যাদবী সেনার সহিত অন্তরীক্ষ হইতে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কে তাঁহার রথ চালাইয়াছিল?' (পৃ. ৬৫)

শান্তির এই 'অনুশীলন ধর্ম'-ই নির্জিত করার চেষ্টা করে জীবানন্দের 'সন্তান ধর্ম'কে। কিন্তু 'অভ্যাস'-এর বিকারকে কি আর এত সহজে অনুশীলিত করা যায়? তাই পুনর্জীবনপ্রাপ্ত বিকারগ্রস্ত জীবানন্দ যখন আবারও

কবুল করে—'আমার সুখ সন্তানধর্মে' (পৃ. ১১৫) আর, 'সন্তানধর্ম'-এর 'অভ্যাস'-এর বশবর্তী হয়ে যখন বলে বসে—'গৃহে গিয়া ত সুখভোগ করা হইবে না।' (পৃ. ১১৫) তখন বাধ্যত শান্তি 'সন্তানধর্ম'-এর সঙ্গে 'অনুশীলন ধর্মে'র আপোষ রফা করে খাড়া করে আশ্চর্য এক বিবাহ-তত্ত্ব—'বিবাহ ইহকালের জন্য, এবং বিবাহ পরকালের জন্য।... ইহকালেই কি আমাদের বিবাহ নিষ্ফল? তুমি আমায় ভালবাস, আমি তোমায় ভালবাসি, ইহা অপেক্ষা ইহকালে আর কি গুরুতর ফল আছে?' (পৃ. ৭৫) কী করবেন তবে 'ইহকালে' এই 'বীর দম্পতি' (পৃ. ১০৬)? তারা পালন করবেন—'চিরব্রহ্মচর্য্য' (পৃ. ১১৫)!

বুঝতে পারি আমরা, সমকালীন হিন্দু জাতীয়তাবাদের 'ব্রহ্মচর্য'-এর কাছে, নতি-স্বীকার করল বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্মতত্ত্ব'-এর 'দম্পতিপ্রীতি'। 'অনুশীলন ধর্ম'কে পরাজিত করল 'সন্তান ধর্ম'। 'অভ্যাস'-এর বিকারের কাছে পরাভূত হল 'অনুশীলন'-এর সামঞ্জস্য-চর্যা! বঙ্কিমচন্দ্রেরই ভাষায়—'বিসর্জ্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল।' (পৃ. ১১৮)

'প্রীতি' বনাম 'মৈত্রী' ঃ

'ধর্মতত্ত্ব'-এর 'স্বজনপ্রীতি' অধ্যায়ে 'অপত্যপ্রীতি ও দম্পতিপ্রীতি ভিন্ন স্বজনপ্রীতির ভিতর আরও কিছু আছে' (পৃ. ১২৩) জানিয়ে বঙ্কিম লেখেন—'এমন অনেক ব্যক্তির সংসর্গে আমরা পড়িয়া থাকি যে, তাহারা আমাদের স্বজনমধ্যে গণনীয় না হইলেও তাহাদের গুণে মুগ্ধ হইয়া আমরা তাহাদের প্রতি বিশেষ প্রীতিযুক্ত হইয়া থাকি। ...ঈদৃশ প্রীতিও অনুশীলনীয় ও উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। সামঞ্জস্যের সাধারণ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া ইহার অনুশীলন করিবে।' (পৃ. ১২৩) বঙ্কিমচন্দ্র যাকে 'বন্ধুপ্রীতি' (পৃ. ১২৩) বলেন, উনিশ শতকে তার একটি অন্যতর রূপ আমরা খুঁজে পাই বাঙালি সংস্কৃতিতে। তাকে বলতে পারি 'মাধুর্যঘন সখ্য'। পরিভাষাটির ব্যাখ্যা আর তার উনিশ শতকীয় প্রেক্ষিতের জন্য, অধ্যাপক তপোব্রত ঘোষের রচনা সামান্য উদ্ধার করা যাক ঃ

> 'বিশুদ্ধ সখ্যে দুই বন্ধু দু'জনের সমান। এই সমানত্বেই বন্ধুত্ব সম্মানিত হয়। কিন্তু মাধুর্যঘন সখ্যে দুই বন্ধুর অগোচরেই দুজনের ব্যবহারে নারীপুরুষের ব্যবহার আরোপিত হয়।... ঊনবিংশ শতকের যেসব বাঙালি পুরুষদের বিশিষ্ট বন্ধুত্বের খবর পাওয়া যায় সেসব ক্ষেত্রে সর্বত্রই এই নারী পুরুষের সম্পর্কের ছাঁচ সহজেই ধরা পড়ে। এগুলির মধ্যে মধুসূদন দত্ত আর গৌরদাস বসাকের বন্ধুত্বের খবর যাঁরা মধুসূদন পড়েননি তাঁরাও...অবগত আছেন। ... বাংলা মহাকাব্যের প্রথম কবির জীবনে যেমন এই গৌরদাস তেমনি বাংলা গীতিকাব্যের প্রথম কবির জীবনে অনাথবন্ধু। অনাথবন্ধু রায় ছিলেন বিহারীলাল চক্রবর্তীর পত্রমিতা।... বিহারীলালের জীবনীকার জানাচ্ছেন যে, অনাথবন্ধুর চিঠি আসতে দেরি হলে বিহারীলাল 'বিরহ-কাতর প্রেমিকের' মতো 'সেন্টিমেন্টাল' হয়ে উঠতেন।... দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর

> 'ফারসি-পড়া রসিক মানুষ' শ্রীকণ্ঠ সিংহ। তাঁদের বন্ধুত্বের গ্রন্থি হচ্ছে হাফেজের গজল। সূফীসাধক হাফেজের ঈশ্বরভক্তি সখ্যভক্তি। ঈশ্বর তাঁর কাছে রূপবান সখা।'[২০]

উনিশ শতকের এই 'মাধুর্যঘন সখ্য'-এর কোনো আভাস কি মিলবে বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবনবৃত্তে? বন্ধুর জীবন-চরিত লিখতে বসে বঙ্কিম বলেছিলেন—'দীনবন্ধুর স্নেহ-ঋণে আমি ঋণী' (পৃ. ৭৯); বলেছিলেন—'তাঁহার ন্যায় বন্ধুর প্রীতি সংসারের একটি প্রধান সুখ।' (পৃ. ৯১) গীতা-অনুবাদের পাদটীকায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন—'সখা ও সুহৃদে অবশ্য প্রভেদ আছে। যাঁহার নিকট উপকার পাওয়া গিয়াছে, সেই সখা।' (পৃ. ১৪) আর হার্দিক যোগ যাঁর সঙ্গে, সে-ই 'সুহৃদ'। 'মৃণালিনী' উপন্যাসটি তিনি উৎসর্গ করেছিলেন 'সুহৃৎপ্রধান' (পৃ. ২) দীনবন্ধু মিত্রকে। এহো বাহ্য। পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথায় পাই 'মাধুর্যঘন' এই সখ্যের পরিচয় ঃ

> 'বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধুর বন্ধুত্ব বঙ্গে আদর্শস্বরূপ ছিল।... বঙ্কিমচন্দ্রের বয়ঃক্রম তখন তের কি চৌদ্দ বৎসর হইবে। উভয়েই কবিতা লিখিতেন। কখনো দেখাশুনা নাই, চোখাচোখি নাই, পত্রের দ্বারা এই সময় ইঁহাদের বন্ধুত্ব জন্মিল। ইউরোপের 'রয়্যাল লাভারস'দের ন্যায় ভালবাসা জন্মিল।'[২১]

বঙ্কিমচন্দ্রের ভাই পূর্ণচন্দ্র আর দীনবন্ধুর ছেলে ললিতচন্দ্র, উভয়ের মন্তব্য থেকেই স্পষ্ট 'আনন্দমঠ'-এর আশ্চর্য উৎসর্গটি দীনবন্ধুর প্রতিই। কী লিখেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র?—'ক্ব নুমাং ত্বদধীনজীবিতাং/বিনিকীর্য ক্ষণভিন্নসৌহৃদঃ।/নলিনীং ক্ষতসেতুবন্ধনো/ জলসংঘাত ইবাসি বিদ্রুতঃ।।—স্বর্গে মর্ত্যে সম্বন্ধ আছে। সেই সম্বন্ধ রাখিবার নিমিত্ত এই গ্রন্থের এরূপ উৎসর্গ।' (পৃ. ২) মৃত দীনবন্ধুর উদ্দেশ্যে যে শ্লোকটি বঙ্কিমচন্দ্র উৎসর্গ করেছেন, সেটি 'কুমারসম্ভবম্'-এর চতুর্থ সর্গের 'রতিবিলাপ'-এর অংশ। অকাল-মৃত কামদেবের প্রতি রতির এই বিলাপ, দীনবন্ধু-বঙ্কিমের মাধুর্যঘন সখ্যের নিরুপায় ব্যঞ্জনাগর্ভ প্রকাশ ঃ

> 'হে দয়িত! সেতুভঙ্গ করিয়া বারিরাশি যখন চকিতে চলিয়া যায়, তখন তন্মধ্যগত মৃণালিনীর যে দশা ঘটে, আমাকে সেই দশায় ফেলিয়া এবং এত কালের ভালোবাসা, প্রেম—সব মুহূর্ত্তে ত্যাগ করিয়া তুমি কোথায় পলাইলে? আমি যে তোমাকে ছাড়া কিছুই জানি না। রতির জীবন যে একমাত্র তোমারই অধীন।'[২২]

এই আশ্চর্য 'মৈত্রী'কে স্মরণে রেখেই চোখ ফেরানো যাক 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের দিকে। এমনিতে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের জগতে নায়কেরা নির্বান্ধব। জগৎসিংহ-নবকুমার-হেমচন্দ্র অথবা অমরনাথ- প্রতাপ-রাজসিংহ, সকলেই বড় 'একা'! ব্যতিক্রম নগেন্দ্র আর দেবেন্দ্র। একমাত্র 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে এই দুই জ্ঞাতি-ভাইয়ের, দু'জনেরই একটি করে 'সুহৃদ' আছে। লক্ষণীয়, তার মধ্যে নগেন্দ্রের 'সুহৃদ' হরদেব ঘোষাল, আদতে তার

'পত্রমিতা'। এহো বাহ্য। আমরা লক্ষ করতে চাইছি দেবেন্দ্র-সুরেন্দ্র-মৈত্রী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কবিকর্ণপূর তাঁর 'অলঙ্কারকৌস্তুভ' বইতে সমলিঙ্গের সখ্যকে চিহ্নিত করেছিলেন 'মৈত্রী' নামে।[২৩]

দেবেন্দ্র 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের প্রতিনায়ক। তাঁর 'সমবয়স্ক' 'সুশীতলকান্তি' 'যুবাপুরুষ', তাঁরই 'মাতুলপুত্র' সুরেন্দ্র। 'গুণে সর্ব্বাংশে দেবেন্দ্রের বিপরীত'। (পৃ. ২৯) সুরেন্দ্রের 'স্বভাবগুণে' দেবেন্দ্র 'ইহাকে ভালবাসিতেন।' (পৃ. ২৯) কেমন সেই ভালবাসা? — 'দেবেন্দ্র, ইঁহার ভিন্ন, সংসারে আর কাহারও কথার বাধ্য নহেন।' (পৃ. ২৯) মদ্যপান পরিত্যাগের অনুরোধে দেবেন্দ্র-সুরেন্দ্রের কথোপকথনটি লক্ষণীয়—'দে। যাহাদের বাঁচিয়া সুখ, তাহারা বাঁচিবার আশায় মদ ছাড়ুক। আমার বাঁচিয়া কি লাভ? সুরেন্দ্রের চক্ষু বাষ্পাকুল হইল। তখন বন্ধুস্নেহে পরিপূর্ণ হইয়া কহিলেন, ''তবে আমাদের অনুরোধে ত্যাগ কর।'' দেবেন্দ্রের চক্ষে জল আসিল। দেবেন্দ্র বলিল, 'আমাকে যে সৎপথে যাইতে অনুরোধ করে, তুমি ভিন্ন এমন আর কেহ নাই। যদি কখন আমি ত্যাগ করি, সে তোমারই অনুরোধে করিব।' (পৃ. ৩০) দেবেন্দ্রের মৃত্যু-কামনায় সুরেন্দ্রের চোখে জল আসে, আর সুরেন্দ্রের মঙ্গলকামনায় দেবেন্দ্রের চোখ 'বাষ্পাকুল' হয়ে ওঠে! আশ্চর্য এই 'মাধুর্যঘন সখ্য', এই 'মৈত্রীরতি' শেষপর্যন্ত দেবেন্দ্রের অননুশীলিত 'কামবৃত্তি'র কাছে পরাজিত হয়ে নিঃশব্দে প্রস্থান করবে—'তোমাকে যদি ছাড়িতে হয়, সেও স্বীকার, তবু আমি কুন্দনন্দিনীকে দেখিবার আশা ছাড়িতে পারিব না।' (পৃ.৫১)

কিন্তু, এতো না-হয় ছিল সেই 'মৈত্রীরতি' যেখানে দেহসঙ্গমের কোন অবকাশ আমরা লক্ষ করিনি। উনিশ শতকের বাংলাদেশ কিন্তু এতো দৈহিকতাহীন ছিল না। ফলে উনিশ শতকের বঙ্গদেশে সমকামী আচরণের খবর অনেকটাই আজ আমাদের জানা। তার মধ্যে বিশেষ একজনের দিকেই ফিরে তাকাবো আমরা। বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যগুরু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। দাম্পত্যজীবনে চরম অসুখী ছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত। নিজের মনোনীত মেয়েকে যেমন তিনি বিয়ে করতে পারেননি, তেমনি তাঁকে বিয়ে করতে হয়েছিল পিতার নির্বাচিত 'কুৎসিতা', 'হাবা', 'বোবার মত' (পৃ.১০৮) দুর্গামণিকে। কাব্যগুরুর ভগ্ন দাম্পত্যের আখ্যানকেই বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষ'-এ তুলে এনেছিলেন দেবেন্দ্র-হৈমবতীর মধ্যে আর কাব্যগুরুর 'জীবনচরিত'-এ ঝরে পড়েছিল তাঁর জন্য শিষ্যের সমবেদনা—'দুর্গামণির দুঃখ ছিল কি না তাহা জানি না। যে আগুনে ভিতর হইতে শরীর পুড়ে, সে আগুন তাঁহার হৃদয়ে ছিল কি না জানি না। ঈশ্বরচন্দ্রের ছিল—কবিতায় দেখিতে পাই। অনেক দাহ করিয়াছে দেখিতে পাই। যে শিক্ষাটুকু স্ত্রীলোকের নিকট পাইতে হয়, তাহা তাঁহার হয় নাই। যে উন্নতি স্ত্রীলোকের সংসর্গে হয়, স্ত্রীলোকের প্রতি স্নেহ ভক্তি থাকিলে হয়, তাঁহার তাহা হয় নাই।' (পৃ.১০৯) এ'হেন ঈশ্বর গুপ্ত সম্পর্কেই সে আমলের জনপ্রিয় গুজব : ঈশ্বর গুপ্ত সমকামী। 'সম্বাদরসরাজ'-এর বর্ণনা অনুযায়ী স্কুল-কলেজের ছেলে-ছোকরা থেকে বন্ধুরা পর্যন্ত, সকলেই ঈশ্বর

গুপ্তের 'পায়ুকাম'-এর অভ্যাসের সঙ্গে পরিচিত! 'রসমুদ্গর' পত্রিকার সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত এবং তাঁর বন্ধুবর্গ ক্ষেত্রমোহন বা গোলোককে ঘিরে 'সম্বাদরসরাজ'-এর (২৪ জুলাই ১৮৪৯) লেখনী অবাধ ঃ

'মারিয়া ক্ষেত্রের পায়ু নিঃশেষ করিল আয়ু
দেখিয়া গোলোকে মরে দুঃখে।
নির্গত রসমুদ্গর ক্রোধে কাঁপে থর থর
বীর্য্য পুঁছে গোলোকের মুখে।।'[২৪]

তবু এ'ছিল 'কোম্পানির আমল'; তখনও মুছে যায়নি প্রাক্-ঔপনিবেশিক 'সখী-সাধনা'-র স্মৃতি। ফলে সমলৈঙ্গিক সম্পর্ক নিয়েও ছি-ছিৎকার জাগেনি বাঙালি সংস্কৃতিতে। সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বরী রাণী ভিক্টোরিয়ার পদতলে যেদিন আশ্রয় পেলাম আমরা, তারপর ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে 'ইন্ডিয়ান পেনাল কোড'-এর ৩৭৭ ধারা হিসেবেই এল 'Anti-Sodomy Law'.[২৫] অবদমিত হতে শুরু হল সমকামিতা। 'ধর্মতত্ত্ব'-এর গুরুর কণ্ঠেও শুনি আশঙ্কা ও চেতাবনী—'এই বন্ধুপ্রীতি অনেক সময়ে অত্যন্ত বলবতী হইয়া থাকে।... সামঞ্জস্যের সাধারণ নিয়মের বশবর্তী হইয়া ইহার অনুশীলন করিবে।' (পৃ.১২৩) আর হিন্দু জাতীয়তাবাদী প্রকল্পে বীর্য-রক্ষার যে আপ্রাণ-চেষ্টা তাতেও সমানভাবে ধিক্কৃত হল সমকামিতা। আদীশ্বর ভট্টাচার্য্যের 'ছাত্রগণের নৈতিক অবস্থা ও তাহার প্রতিকার' নামক বই থেকে পূর্ববঙ্গের ছাত্রসমাজ সম্পর্কে লেখকের উদ্বেগটুকু লক্ষ করা যাক ঃ

> 'পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ স্কুলে এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য নিয়মিত দল আছে—সেগুলি Friend-ship club বা বন্ধুত্বের দল নামে পরিচিত।....তাদের বন্ধুত্বের অর্থ আর কিছুই নয়—পরস্পরের দ্বারা স্ত্রীলোকের অভাবটা পূর্ণ করা।...এদের মধ্যে বিবাহিত জীবনের অনুকরণে প্রণয়পত্রের ব্যবহার চলে থাকে... অনেক স্থলে ছেলেরা এই উদ্দেশ্যে হরির লুট বা সংকীর্তন করে।'[২৬]

জাতীয়তাবাদী চিন্তা অথবা 'ধর্মতত্ত্ব'-এর মান্য কাঠামো সবক্ষেত্রেই সমলৈঙ্গিক সম্পর্ক বা 'বলবতী' 'বন্ধুপ্রীতি' নির্জিত হলেও আশ্চর্যজনকভাবেই ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য এবং দীনবন্ধু মিত্রের 'সুহৃৎ' বঙ্কিমচন্দ্রের কলমে উঠে এসেছে অভাবনীয় কিছু মুহূর্ত। তেমনই একটি 'ইন্দিরা' উপন্যাসে সুভাষিণী-ইন্দিরার চুম্বন-দৃশ্য! পুরুষ মানুষের মন কেমন করে ভুলাতে হয়, উনিশ বছরের ইন্দিরাকে সেই শিক্ষা দিতে বসেছিল 'সখী' সুভাষিণী। সবশেষে শিখিয়েছিল 'ব্রহ্মাস্ত্র'—'মাগী আমার গলা বেড়িয়া হাত দিয়া আমার মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া, আমার মুখচুম্বন করিল।' (পৃ.৪৪) 'সধবা হইয়াও জন্মবিধবা' (পৃ.৩৫) যে ইন্দিরা, যাঁর 'যৌবনের প্রবৃত্তি সকল অপরিতৃপ্ত' (পৃ.৩৫) ছিল, সমলিঙ্গের থেকে পাওয়া এই যৌনতার আস্বাদকে তৃপ্তিপূর্বকই গ্রহণ করে সে—'যা শিখাইয়াছিলে, তার মধ্যে একটা বড় মিষ্ট লাগিয়াছিল—সেই মুখচুম্বনটি। এসো আর একবার শিখি। তখন সুভাষিণী আমার গলা ধরিল, আমি তার গলা ধরিলাম। গাঢ় আলিঙ্গনপূর্বক

পরস্পরে মুখচুম্বন করিয়া, গলা ধরাধরি করিয়া, দুই জনে অনেকক্ষণ কাঁদিলাম। এমন ভালবাসা কি আর হয়?' (পৃ.৪৫) সমাজ-হিতকামী যৌনতার মান্য কাঠামো রচনা করেন যে বঙ্কিমচন্দ্র, তিনিই কি ভুলে যেতে পারেন 'ক্ষণভিন্নসৌহৃদঃ'? 'বলবতী' 'বন্ধুপ্রীতি' কি আর সদাসর্বদা রক্ষা করতে পারে 'সামঞ্জস্য'?

'শাস্ত্র এখানে মূক' ঃ

গবেষণার দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা 'ধর্মতত্ত্ব'-এর তন্নিষ্ঠ পাঠে দেখিয়েছি, কীভাবে যৌনতার এক রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত হিতকামী দাম্পত্য-নির্ভর কাঠামো তৈরি করে নিচ্ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তৃতীয় অধ্যায়ে সেই কাঠামোকে মান্য করে গড়ে-ওঠা বঙ্কিম-উপন্যাসের বৃহত্তর জগৎটিকে স্পর্শ করতে চেয়েছি আমরা। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা দেখতে চাইছি, সেই কাঠামোকে বার বার প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দেওয়া বঙ্কিম-উপন্যাসের বিপজ্জনক অন্ধি-সন্ধিগুলিকে। তারই সমাপ্তিতে পৌঁছে আমরা লক্ষ করতে চাইব, তিনটি হার্দিক সম্পর্ককে যাদের সামনে 'ধর্মতত্ত্ব' কার্যত সম্পূর্ণরূপে পরাভূত! আরো আশ্চর্যের এই যে, 'ধর্মতত্ত্ব'-এর এই পরাজয়ে কোথাও যেন প্রৌঢ় শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন-রসিক মনের নৈঃশব্দ্যময় উল্লাসই শ্রুত হয়। ভবানী পাঠক-প্রফুল্ল, ঔরঙ্গজেব-ইমলি বেগম আর দরিয়া-মোবারক-জেব-উন্নিসা, সেই তিনটি খণ্ড-কাহিনি, 'ধর্মতত্ত্ব' যেখানে সম্পূর্ণ অস্বীকৃত।

ভবানী পাঠক-প্রফুল্ল

ইতিহাস থেকে শুধু নাম দুটো নেওয়া : ভবানী পাঠক আর দেবী চৌধুরাণী। বাকিটা বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব। কেমন উপন্যাসের ভবানী পাঠক?—'ব্রাহ্মণের গায়ে নামাবলি, কপালে ফোঁটা, মাথা কামান। ব্রাহ্মণ দেখিতে গৌরবর্ণ, অতিশয় সুপুরুষ, বয়স বড় বেশী নয়।' (পৃ.৩৬) এই 'সুপুরুষ' ব্রাহ্মণটি শৈব—'শিবলিঙ্গ' (পৃ.৮৫) তাঁর অর্চিত। বঙ্কিমচন্দ্রের সোদ্ভাবিত অনুশীলন ধর্মে তিনি নিষ্ণাত। অনুশীলিত এই মানুষটি অপরিচিত প্রফুল্লকে প্রথম দর্শনেই সম্বোধন করেছেন 'মা' (পৃ.৩৬) বলে। 'কামবৃত্তি'-কে অনুশীলিত করা এই শৈব-সাধক প্রফুল্লকে বলেন—'এ বনে আমার অনুচর এমন অনেক আছে যে, তোমার এই ধনের লোভে, তোমার সঙ্গে পাপাচরণ করিতে সম্মত হইবে। অতএব তোমার সে মতি হইলে, আমি তোমাকে এই দণ্ডে এখান হইতে বিদায় করিতে বাধ্য।' (পৃ.৩৯) প্রফুল্ল সম্পর্কে ভবানী পাঠকের পর্যবেক্ষণও তারিফযোগ্য—'তোমার রূপ আছে, যৌবন আছে, যদিও ডাকাইতের হাতে উদ্ধার পাও—কিন্তু রূপ যৌবনের হাতে উদ্ধার পাইবে না।' (পৃ.৪০) ও, তবে যাঁকে প্রথম সাক্ষাতেই মাতৃ-সম্বোধন করেন ভবানী পাঠক, তাঁর 'রূপ' 'যৌবন' সম্পর্কেও খুব একটা অনবহিত নন এই 'সুপুরুষ' ব্রহ্মচারীটি? ফলে রঙ্গরাজকে যখন তিনি বলবেন যে 'রাণী' (পৃ.৪১) খুঁজে পেয়েছেন, তখন সেই হবু রাণীর সম্পর্কে বলতে ভুলবেন না—'মেয়েটি যুবতী এবং সুন্দরী।' (পৃ.৪১) 'রাণী' হওয়ার পক্ষে এ'দুটি কি অত্যাবশ্যক ছিল?

'রজনী' উপন্যাসে লবঙ্গকে 'শিশুবোধ' পড়িয়েছিলেন অমরনাথ। সেইসূত্রে লবঙ্গ তাঁর 'শিষ্যা' (পৃ. ৩০)। 'রাজসিংহ' উপন্যাসে চঞ্চলকুমারী নিজেকে রাণার 'শিষ্য' (পৃ.১১১) দাবি করে 'জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা' (পৃ.১১১) জানাবে। আর 'দেবী চৌধুরাণী'তে ভবানী পাঠক ও প্রফুল্ল অভিধার্থেই গুরু-শিষ্যা—'জগদীশ্বর লোহা সৃষ্টি করেন, মানুষে কাটারি গড়িয়া লয়। ইস্পাত ভাল পাইয়াছি; এখন পাঁচ সাত বৎসর ধরিয়া গড়িতে শাণিতে হইবে।' (পৃ.৪১) কিন্তু, প্রফুল্লই সেই 'লোহা' কেন, যার থেকে ভবানী পাঠকের 'কাটারি' না গড়লেই নয়? একটু লক্ষ করে দেখুন, 'অনুশীলন ধর্ম'-এর পালনে নিশি ঠাকুরাণী কিন্তু প্রফুল্লর পূর্বসুরী ঃ

	প্রফুল্ল	নিশি
শারীরিকী বৃত্তি	'প্রফুল্ল চারি বৎসর ধরিয়া মল্লযুদ্ধ শিখিল। (পৃ.৫১)	'নিশি বাল্যকালে ব্যায়াম শিখিয়াছিল।' (পৃ.৫১) সে-ই প্রফুল্লর মল্লযুদ্ধের গুরু।
কার্য্যকারিণী বৃত্তি	'প্রফুল্লের বিষয়বুদ্ধি, বুদ্ধির প্রাখর্য্য ও সদ্বিবেচনার গুণে, সংসারের বিষয়কর্ম্মও তাহার হাতে আসিল।' (পৃ.১৩৫)	বজরায় ব্রজেশ্বর বা ব্রেনানকে আনার পর নিশির 'কার্য্যকারিণী বৃত্তি'র পরিচয় আমরা পেয়েছি।
জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি	'ব্যাকরণ কয়েক মাসে অধিকৃত হইল। তারপর প্রফুল্ল ভট্টিকাব্য জলের মত সাঁতার দিয়া পার হইয়া গেল।' (পৃ.৪৯)	'নিশি ঠাকুরাণী, রাজার ঘরে থাকিয়া, পরে ভবানী ঠাকুরের কাছে লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন—বর্ণ শিক্ষা, হস্তলিপি, কিঞ্চিৎ শুভঙ্করী আঁক প্রফুল্ল তাঁহার কাছে শিখিল।' (পৃ.৪৯)
চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি	'ছাদের উপর গালিচা পাতিয়া সেই বহুরত্নমণ্ডিতা রূপবতী মূর্ত্তিমতী সরস্বতীর ন্যায় বীণাবাদনে নিযুক্তা।' (পৃ.৬১)	'নিশিই দেবীর বীণার ওস্তাদ।' (পৃ.১০৫)

অর্থাৎ 'অনুশীলন' দেবীর আগে নিশিরই সম্পূর্ণ হয়েছে। তবু কেন নিশিকে 'দেবী চৌধুরাণী'-র পদে বরণ করে নিলেন না ভবানী পাঠক? বরং, প্রফুল্লর স্বামী আছে; সে অনায়াসে বলে—'কখন স্বামী দেখ নাই, তাই বলিতেছ—স্বামী দেখিলে কখন শ্রীকৃষ্ণে মন উঠিত না।' (পৃ.৪৪) স্বামীর সঙ্গে মাত্র একটি রাত্রি যাপনের স্মৃতিই প্রফুল্লকে 'দেবী চৌধুরাণী' হতে দিল না। তুলনায়, নিশি ঠাকুরাণীর তো সে বালাইও নেই!—'আমার ব্রজেশ্বর বৈকুণ্ঠেশ্বর একই।' (পৃ.৮২) ফলে নিশিকে 'দেবী চৌধুরাণী' বানালে ভবানী পাঠকের দলও ভাঙত না। তবু, কেন প্রফুল্লর নির্বাচন?

এই নির্বাচনের প্রকাশ্য কারণ নিশ্চয় প্রফুল্লর বিপুল অর্থ—'ধনের ধার বড় ধার।' (পৃ. ৫৫) কিন্তু, একমাত্র অনুক্ত কারণ 'সুন্দরী' 'যুবতী' প্রফুল্লর প্রতি অনুশীলিত ব্রহ্মচারী ভবানী পাঠকের গোপন এক 'প্রীতি'। ভবানী পাঠক 'প্রায়শ্চিত্ত'-এর প্রয়োজনে ইংরেজের হাতে আত্মসমর্পণ করলেন—এই ঘটনার ব্যাখ্যায় অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য ইতঃপূর্বেই উপস্থাপন করেছেন ভবানী পাঠক ও প্রফুল্লর সম্পর্কের এই গোপন মাত্রা ঃ

> 'ইংরেজের অর্থ লুণ্ঠন করিয়া দরিদ্র প্রজাদিগের মধ্যে তাহা বিতরণ করাকে ভবানী ঠাকুর কোনদিন পাপ বলিয়া মনে করিতেন না। সুতরাং এই জন্য তিনি প্রায়শ্চিত্ত করিতে চলিয়াছিলেন বলিয়া মনে করা যায় না।....যদি বলি, ইহা হাতের মুঠোর মধ্যে পাওয়া এক সুন্দরী যুবতীর প্রতি ভবানী পাঠকের অজ্ঞাত মোহ, তবে তাহাই অনুশীলন তত্ত্বের সাধক ভবানী পাঠকের পাপ, সেই পাপেরই তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল মনে হইতে পারে।'[২৭]

প্রফুল্লর প্রতি 'অজ্ঞাত মোহ' যে ভবানী পাঠকের ছিল, তা আমরা মেনে নিলেও, শ্রীভট্টাচার্যের প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্বে আমরা বিশ্বাস করতে নারাজ। তুলনায় আমরা লক্ষ করতে চাইব এই পংক্তিটি—'ভবানী পাঠক প্রফুল্লচিত্তে দ্বীপান্তরে গেল।' (পৃ.১৩৬) এই 'প্রফুল্লচিত্তে' শব্দটির শ্লেষার্থ কি এই নয় যে, প্রফুল্লকে 'হৃদয়াধিষ্ঠাত্রী দেবী' করে নিয়েই 'দ্বীপান্তর' যাত্রা করলেন ভবানী পাঠক?

'দেবী চৌধুরাণী' প্রফুল্লর দাম্পত্যে প্রত্যাবর্তনের গল্প। প্রফুল্ল আর ব্রজেশ্বরের দাম্পত্য, হারানো প্রাপ্তির গল্প। গোপনে এ'গল্প কি প্রফুল্ল আর ভবানী পাঠকের অন্য এক রকমের একপাক্ষিক 'প্রীতি'র গল্পও নয়? দৃশ্যতই 'ধর্মতত্ত্ব' এখানে বিহ্বল!

ঔরঙ্গজেব-ইম্‌লি বেগম

'শুক্রবারে যখন বাদশাহ্ মস্‌জীদে ঈশ্বরকে ডাকিতে যান, তখন লক্ষ হিন্দু সমবেত হইয়া তাঁহার নিকট রোদন করিতে লাগিল। দুনিয়ার বাদশাহ দ্বিতীয় হিরণ্যকশিপুর মত আজ্ঞা দিলেন, ''হস্তীগুলা পদতলে ইহাদিগকে দলিত করুক।'' সেই বিষম জনমর্দ্দ হস্তিপদতলে দলিত হইয়া নিবারিত হইল।' (পৃ.১১৮) ইতিহাসের ঔরঙ্গজেব ইতরবিশেষ এমনই। কুটিল, পরধর্মবিদ্বেষী, নীচমনা এক দোর্দণ্ডপ্রতাপ শাসক। কিন্তু, বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' উপন্যাসের ঔরঙ্গজেবের চরিত্রের নেতিবাচকতার উৎস তাঁর বিধ্বস্ত দাম্পত্য। 'প্রাচীনা এবং নবীনা' প্রবন্ধে বঙ্কিম লিখেছিলেন—'স্ত্রীজাতি আমাদিগের শুভাশুভের মূল।' (পৃ. ১৫৩) ঔরঙ্গজেবের সমস্ত অশুভের মূল তাঁর বিপর্যস্ত 'দম্পতিপ্রীতি'; তাঁর স্ত্রীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক; তাঁর প্রতি তাঁর স্ত্রীদের আচরণ। একটু লক্ষ করা যাক দুই প্রধানা মহিষী 'যোধপুরী' আর 'উদিপুরী'র 'দম্পতিপ্রীতি' ঃ

যোধপুরী বেগম	স্বামীর মৃত্যুচিন্তায় রত—'তখন যোধপুর রাজকন্যা মনে মনে বলিলেন, ''হে ভগবান্! আমাকে বিধবা কর! এ রাক্ষস আর অধিক দিন বাঁচিলে হিন্দু নাম লোপ হইবে।" (পৃ.৫৬)
উদিপুরী বেগম	মদ্যপানে নিরন্তর রত। 'ফার্স মুলুকের বাদশাহ' (পৃ. ১২৬)-এর স্বপ্নে বিভোর—'উদিপুরী বলিল, ''না না। তুমি ফার্স মুলুকের বাদশাহ। মোগল বাদশাহের হাত হইতে আমাকে কাড়িয়া লইতে আসিয়াছ।"....''হুজুরের সঙ্গে আল্‌বৎ যাইব।' (পৃ.১২৬)

এই যাঁর অন্তঃপুরের ছবি—এক স্ত্রী তাঁর মৃত্যুকামনা করে, আর অন্য স্ত্রী পারস্যাধিপতির সঙ্গ কামনা করে, সে যখন বলে—'আমি প্রাচীন হইয়াছি, কিন্তু কখন কাহাকেও ভালবাসি নাই।' (পৃ.১৪৮) আমরা বুঝতে পারি, 'প্রাচীন' এই মানুষটি 'কখন' কারো ভালোবাসাও পাননি! আস্বাদ করেননি 'দম্পতিপ্রীতি'-র মাধুর্য।

ঠিক সেই কথাই প্রথম আলাপে বাদশাহকে মনে করিয়ে দেয় মাণিকলালের ঘরনী নির্মলকুমারী। ঔরঙ্গজেবকে 'বাক্যশূন্য' করে নির্মল বলে—'আপনার বড় ভাই দারা শেকোকে বধ করিয়া তাহার দুইটা কবিলা কাড়িয়া আনিতে গিয়াছিলেন—পারিয়াছিলেন কি?—অধম খ্রিস্টিয়ানীটা আসিয়াছিল জানি, রাজপুতনী দিল্লীর বাদশাহের মুখে সাত পয়জার মারিয়া স্বর্গে চলিয়া যায় নাই কি?' (পৃ.১৩১) নির্মলকুমারীর 'সাহস ও চতুরতা' (পৃ.১৩১) মুগ্ধ করে ঔরঙ্গজেবকে। ক্রমে ক্রমে নির্মলকুমারী, ঔরঙ্গজেবের আদরের 'ইম্‌লি বেগম' (পৃ.১৪৬) হয়ে ওঠে। নিছক, 'কামবৃত্তি' নয় এই আকর্ষণ; 'কন্দর্প ঠাকুরের' 'কারসাজি' (পৃ.১৩৫) এই সম্পর্কে নেই বললেই চলে। নির্মলকুমারীর প্রশ্নের উত্তরে সে কথাই বলেন ঔরঙ্গজেব—'তুমি সুন্দরী বটে, কিন্তু সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইবার বয়স আমার আর নাই। আর তুমি সুন্দরী হইলেও উদিপুরী অপেক্ষা নও। বোধ করি, আমি তোমার কাছে ভিন্ন আর কোথাও সত্য কথা কখন পাই নাই, সেই জন্য। বোধ করি, তোমার বুদ্ধি, চতুরতা আর সাহস দেখিয়া তোমাকেই আমার উপযুক্ত মহিষী বলিয়া বিশ্বাস হইয়াছে।' (পৃ.১৪৮) 'রূপ' নয় 'গুণগ্রহণে' যে 'আসঙ্গলিপ্সা' তা তো 'প্রকৃত ভালবাসা'; 'দম্পতিপ্রীতি'-রই এক রূপ!

'ধর্মতত্ত্ব'-এর কাঠামো অনুসারে নির্মলকুমারী সতী স্ত্রী, আর ঔরঙ্গজেবও দাম্পত্য যাপনে ক্লান্তপ্রাণ এক পুরুষ। তাদেরকে নিয়েই এরপর সৃষ্টি হল বঙ্কিম-উপন্যাসের সর্বোত্তম প্রণয় দৃশ্য। 'কখনও কাহাকেও' যা বলেননি, সেই কাতর প্রার্থনা নিয়ে প্রৌঢ় আলমগীর নতজানু হলেন 'রূপবতী যুবতী'-র সামনে—'এ জন্মে কেবল তোমাকেই ভালবাসিয়াছি। তাই, তুমি যদি বল যে, তোমার স্বামী না থাকিলে তুমি আমার বেগম হইতে, তাহা হইলে এ স্নেহশূন্য হৃদয়—পোড়া পাহাড়ের মত হৃদয়—একটু স্নিগ্ধ হয়।' (পৃ.১৪৮) অনুরূপ প্রার্থনা একদা লবঙ্গলতার কাছে অমরনাথও করেছিল। 'ধর্মতত্ত্ব' মেনে সতী লবঙ্গলতা পাখির জন্য বরাদ্দ 'স্নেহ'টুকুও দিতে অস্বীকার করেছিল অমরনাথকে। আর, ইম্‌লি বেগম? যার 'দম্পতিপ্রীতি'-র অনুশীলন আমরা আগেই দেখেছি? সে এই প্রৌঢ়ের প্রণয়-নিবেদনের আশ্চর্য স্বীকৃতি দিল—'আমার ভাগ্যবশতঃই অবিবাহিত অবস্থায় আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় নাই।' (পৃ. ১৪৮)

এই স্বীকৃতিটুকুই যথেষ্ট। 'মনুষ্য কখন পাষাণও হয় না।' (পৃ. ১৪৯) ফলে 'পোড়া পাহাড়ের মত হৃদয়' (পৃ. ১৪৮) যার, সেই বাদশাহ আলমগীর ক্ষণিকের জন্য বদলে গেলেন। হয়ে উঠলেন বঙ্কিম-সাহিত্যে 'প্রণয়ে আত্মবিসর্জ্জন'-করা অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রেমিক। 'বিষণ্ণ' সুরেই 'ইম্‌লি বেগম'-কে জানালেন—'দুনিয়ার বাদশাহ হইলেও কেহ সুখী হয় না—কাহারও সাধ মিটে না। এ পৃথিবীতে আমি কেবল তোমায় ভাল বাসিয়াছি, অতএব তোমায় আটকাইব না—ছাড়িয়া দিব। তুমি যাহাতে সুখী হও, তাহাই করিব। যাহাতে তোমার দুঃখ হয়, তাহা করিব না।' (পৃ. ১৪৮) ইতিহাসের কুখ্যাত ঔরঙ্গজেবকে ব্যথিতহৃদয় উদারচেতা প্রেমিকে রূপান্তরিত করার সমস্ত কৃতিত্ব 'ধর্মতত্ত্ব' প্রণেতার, এ'কথা ভাবতে সত্যই বিস্ময় জাগে!

দরিয়া-মোবারক-জেব-উন্নিসা

মোবারক খাঁর প্রথমা পত্নী 'দরিয়া বিবি' ওরফে 'দবীর-উন্নিসা' (পৃ. ৩৮)। 'স্বদেশে' (পৃ. ৫৮) থাকতে তাকে বিবাহ করেছিলেন মোবারক। পরে 'পাগল' (পৃ. ৫৮) ভেবে তাকে 'তালাক দিয়া পরিত্যাগ' (পৃ. ৫৮) করেন। 'ভাল বাসুক বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারে?' (পৃ. ৪) 'উত্তরচরিত'-এর বঙ্কিম-ভাষ্য মোবারক মানতে না চাইলেও, দরিয়া মানে। স্বামীকে সে 'পরিত্যাগ' করেনি। বরং 'উত্তরচরিত'-এর 'স্ত্রী-সূক্ত'-এর সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে মানতেই হয় দরিয়া আদর্শ পত্নী। রাজসিংহের সঙ্গে প্রথম সংঘর্ষের পর কূপে পতিত হয় মোবারক। তার 'প্রাণরক্ষয়িত্রী' (পৃ. ৩৩) হয়ে আসে দরিয়া। 'রূপ' নয়, 'গুণ'-ই তাঁর সম্বল ঃ

'বিপদে যে বন্ধু'	'যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে, রণক্ষেত্র নিঃশব্দ হইলে, কেহ যেন কূপের উপর হইতে বলিল, ''বাঁচিয়া আছ?'' মোবারক উত্তর করিল, ''আছি। তুমি কে?''... স্ত্রীলোক বলিল, ''এ গলা কি চেন না?'' মোবা। চিনিতেছি। দরিয়া এখানে কোথা হইতে?' (পৃ. ১০৭)
'কার্য্যে যে মন্ত্রী'	'দরিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে মোবারককে কূপমগ্ন হইতে দেখিয়া, প্রথমেই দোলার সন্ধানে গিয়াছিল।... একখানায় আহত মোবারককে তুলিল।... তখন মোবারককে লইয়া দরিয়া দিল্লির পথে চলিল।' (পৃ. ১০৮)
'রোগে যে বৈদ্য'	'উপযুক্ত স্থানে উপস্থিত হইয়া দরিয়া মোবারককে শুশ্রূষা করিল। দরিয়ার চিকিৎসাতেই মোবারক আরোগ্য লাভ করিল।' (পৃ. ১০৮)

এহেন 'অনন্যব্রত' স্ত্রীকে কি ত্যাগ করা যায়, না উচিৎ? ফলে পুনর্বার মোবারকের দাম্পত্যে প্রতিষ্ঠা পেল দরিয়া।—'মোবারক পবিত্রা পরিণীতা লইয়া ঘরকরনা সাজাইতেছিল।' (পৃ. ১৩৪) আর 'মুখচুম্বন' করে স্ত্রীর কাছে শপথ করল সে—'আর কখনও তোমায় ত্যাগ করিব না' (পৃ. ১০৮)। আর যদি ত্যাগ করে? দরিয়া বিবি এমনিতে 'ধর্মতত্ত্ব'-এর মাপেই আদর্শ পত্নী, কিন্তু 'দেবী চৌধুরাণী'র মতো ততটাও পুরুষতান্ত্রিকতার দাবি মেনে অনুশীলিত নন, যতটা হলে স্বামীকে অনায়াসে আর দু'টি সতীনের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া চলে—'আমি একা তোমার স্ত্রী নহি। তুমি যেমন আমার, তেমনি সাগরের, তেমনি নয়ান বৌয়ের। আমি একা তোমায় ভোগ দখল করিব না।' (পৃ. ১৩৫) পুরুষতন্ত্রকে সযত্নে টিঁকিয়ে রাখা 'ধর্মতত্ত্ব'-এর এই 'অনুশীলন' মেনে নিতে রাজি নয় দরিয়া। মোবারকের উপরে তাঁর নিঃসপত্ন অধিকার। ফলে মোবারক যদি কখনো তাঁকে ত্যাগ করে 'রাজপুত্রীকে বিবাহ' (পৃ. ৪২) করার কথাও ভাবে, তবে দরিয়ার ভবিষ্যদ্বাণী গুঞ্জরিত হয়—'মৃত্যু' (পৃ. ৪২)।

মোবারক মানুষটিও চরিত্রগুণে ভালই। নির্ভীক —'মোবারক আলি, ইহলোকে কাহাকেও ভয় করে না।' (পৃ. ১০১) 'রণপণ্ডিত' (পৃ. ৯১)। সর্বোপরি 'কামবৃত্তি'কেও অনুশীলিত করেছে সে। তাই চঞ্চলকুমারীর কটাক্ষ-সূত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য—'বুঝি অন্য কেহ হইলে তাহার মনে হইত, নয়ন ছাড়া আর কোথাও বিষ আছে কি? কিন্তু মোবারক সে ইতর প্রকৃতির মনুষ্য ছিলেন না। তিনি রাজসিংহের ন্যায় যথার্থ বীরপুরুষ।' (পৃ. ৯৯) এ'হেন মানুষটির চরিত্রের একমাত্র দুর্বলতা বাদশাজাদী জেব-উন্নিসা। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের এই পুত্রী 'ইন্দ্রিয়' সম্পর্কে 'বিচারশূন্য, বাধাশূন্য এবং তৃপ্তিশূন্য' (পৃ. ৪৩)। সেই 'প্রৌঢ়া সুন্দরী' (পৃ. ৪৬) জেব-উন্নিসার 'রূপরাশিতে বিক্রীত' (পৃ. ৪৬) মোবারক—'জেব উন্নিসার রূপের সমুদ্রে সে ডুবিয়া গিয়াছিল' (পৃ. ৪৭)। জেবউন্নিসা নিছক কামবৃত্তি-পরায়ণ; 'দম্পতিপ্রীতি' তাঁর কাছে ঠাট্টার বিষয়—'আমি কি হিন্দুদের বামুনের মেয়ে, না রাজপুতের মেয়ে যে, এক স্বামী করিয়া, চিরকাল দাসীত্ব করিয়া, শেষ আগুনে পুড়িয়া মরিব?' (পৃ. ৪৭) আর মোবারক? তার যাচ্ঞা দম্পতিপ্রীতি'-ই। জেব-উন্নিসা ঠাট্টার ছলে 'প্রাণাধিক' শব্দ উচ্চারণ করলে তাই মোবারক বলে—'ভিক্ষা এই যে, যেন মোল্লার হুকুমে ঐ শব্দে আমার অধিকার হয়।' (পৃ. ৪৬) কিন্তু, তা সম্ভব নয়, কারণ 'প্রীতিবৃত্তি'-র কোন 'অনুশীলন'-ই জেব-উন্নিসা কোনদিন করেননি, করতে চানও না—'ভালবাসা গরীব দুঃখীর দুঃখ। শাহজাদীরা সে দুঃখ স্বীকার করে না।' (পৃ. ৬০)

জেব-উন্নিসার এই 'কামবৃত্তি' ঠেকে গেল মোবারক-দরিয়ার 'দম্পতিপ্রীতি'-তে—'আমি আর মহালের ভিতর যাইব না—আমি দরিয়াকে ঘরে আনিয়াছি।' (পৃ. ১৩৫) ব্যাহত 'কাম' রূপান্তরিত হল 'ক্রোধ'-এ। 'বাদশাহী দস্তুর' (পৃ. ১৩৫) মতো জেব-উন্নিসা মোবারকের 'নিপাতসাধন' (পৃ. ১৩৫) করার

জন্য কৃতসঙ্কল্প হলেন। রাজাদেশে সর্পদংশনে প্রাণ গেল মোবারকের। আর তার এই মৃত্যুসংবাদ থেকেই 'সহসা' (পৃ. ১৩৮) পরিবর্তন শুরু হল জেব-উন্নিসার—'সংবাদ আসিবামাত্র সহসা তাঁহার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল—এ শুক্‌না মাটিতে কখন জল উঠে নাই। দেখিলেন, কেবল তাই নহে, গণ্ড বাহিয়া ধারায় ধারায় সে জল গড়াইতে লাগিল। শেষ দেখিলেন, চীৎকার করিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছে।' (পৃ. ১৩৮) 'রূপের গর্ব্বে' অন্ধ হয়ে, 'ইন্দ্রিয়ের দাসী' হয়ে একদা যে 'ভালবাসা'কে (পৃ. ১৩৮) সে চিনতে পারেনি, আজ মোবারকের 'বধসংবাদ' চিনতে বাধ্য করল তাকে। জেব-উন্নিসা বুঝলেন—'বাদশাহজাদীরাও ভালবাসে; জানিয়া হউক, না জানাইয়া হউক, নারীদেহ ধারণ করিলেই ঐ পাপকে হৃদয়ে আশ্রয় দিতে হয়।' (পৃ. ১৩৮) 'ভালবাসার দুঃখ'কে নিজের হৃদয়ে অনুভব করতে শুরু করল জেব-উন্নিসা; শুরু হল তাঁর 'চিত্তশুদ্ধি'।

জেব-উন্নিসার সঙ্গে পুনর্জীবিত মোবারকের মিলন ঘটল উদয়পুরে, চঞ্চলকুমারীর অবরোধে। প্রথম রাত্রে তাঁকে দেখলেন জেব-উন্নিসা—'জেব-উন্নিসা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পুড়িতেছিল।' (পৃ. ১৬৬) দ্বিতীয় রাত্রে ঘটল মিলন। দুঃখের আগুনে পুড়ে সম্পূর্ণ হয়েছে বাদশাজাদীর 'চিত্তশুদ্ধি'—'বাদশাহজাদী আর বাদশাহজাদী নহে, মানুষী মাত্র।' (পৃ. ১৭২) আত্মনিবেদিতা হলেন তিনি মোবারকের কাছে—'আমি তোমার' (পৃ. ১৭১)। 'সরা' মতানুসারে 'পরিণয়' (পৃ. ১৭২) সম্পন্ন হল তাদের। দাম্পত্যে প্রবেশ করলেন ঔরঙ্গজেব-দুহিতা।

দুশ্ছেদ্য এই জটিলতার সমাধান কী হবে? মোবারক গোবিন্দলাল নন। 'কামবৃত্তি'-র পিছল পথে নেমে গোবিন্দলাল রোহিণীকে রক্ষিতা করে প্রসাদপুরে রেখেছিলেন। মোবারক জেব-উন্নিসাকে বিধি-পূর্বক বিবাহ করেছেন। আবার দরিয়াও সূর্য্যমুখী নয়, যার 'গুণ' শেষপর্যন্ত কুন্দনন্দিনীর থেকে স্বামীকে নিজের কাছে ফিরিয়ে আনতে পারে। তাই রোহিণী-কুন্দনন্দিনীর মৃত্যু আর গোবিন্দলাল-নগেন্দ্রের 'ইন্দ্রিয়সংযম' যত সহজে 'বিষবৃক্ষ'-'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর সমাধান ঘটিয়েছিল, এক্ষেত্রে সে সম্ভাবনাও সুদূর-পরাহত। মোবারক নিঃসন্দেহে 'কামবৃত্তি' সম্পন্ন পুরুষ নন। কিন্তু 'রূপ-বহ্নি-বিবিক্ষু' বটে!—'সৌন্দর্য্যের কি মহিমা! মোবারক জেব-উন্নিসাকে দেখিয়া আবার সব ভুলিয়া গেল। ...মোবারকের পূর্ব্বানুরাগ সম্পূর্ণরূপে ফিরিয়া আসিল। দরিয়া, দরিয়ায় ভাসিয়া গেল।' (পৃ. ১৮৫-১৮৬) 'ধর্মতত্ত্ব' প্রণেতা বঙ্কিমচন্দ্র সঙ্গতভাবেই ধিক্কার জানান মোবারককে—'মনুষ্য স্ত্রীজাতির প্রেমে অন্ধ হইলে, আর তাহার হিতাহিত ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান থাকে না। তাহার মত বিশ্বাসঘাতক, পাপিষ্ঠ আর নাই।' (পৃ. ১৮৬) কিন্তু, যে মোবারক 'মৃত্যু ভিন্ন আমার অন্য গতি নাই' (পৃ. ১৯০) এ'কথা জেনেও 'বিবাহ' করেছিলেন জেব-উন্নিসাকে, তার 'প্রণয়ে আত্মবিসর্জ্জন'-এর মনোবৃত্তি কি আদতেই ধিক্কারযোগ্য? শেষতক্ তাই 'ধর্মতত্ত্ব'-এর পুরো কাঠামোকে

ধ্বস্ত করে দিয়ে 'উন্মাদিনী' দরিয়ার বন্দুকের আঘাতে মোবারকের জীবনাবসান ঘটল, আর 'উদয়সাগরের প্রস্তরকঠিন ভূমির' (পৃ. ১৯০) উপরে পড়ে জেব-উন্নিসা 'চাষার মেয়ের মত মাথা কুটিতে লাগিল।' (পৃ. ১৪১) দম্পতিপ্রীতি-কামবৃত্তির একস্বরিক দ্বান্দ্বিকতা দরিয়া-মোবারক্-জেব-উন্নিসার কাহিনিবৃত্তের সামনে নির্বাক। 'শাস্ত্র এখানে মূক।' (পৃ. ১৩১)

উল্লেখপঞ্জি ঃ

১. গোলাম মুরশিদ, হিন্দু সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ২৮৭-২৯৯।

২. অশোককুমার রায় সম্পাদিত, তারকনাথ বিশ্বাস, বঙ্কিম প্রসঙ্গ, পারুল প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৮ পৃ. ২৬।

৩. সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, নবীনচন্দ্র রচনাবলী, আমার জীবন প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৬৬, পৃ. ৪৫৮।

৪. সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত, বঙ্কিমপ্রসঙ্গ, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৮২, পৃ. ১২০।

৫. জলি মল্লিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমসাহিত্যে প্রেম; সঞ্জীবকুমার বসু সম্পাদিত, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বৈশাখ-আশ্বিন ১৪০৪, পৃ. ২২।

৬. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, বৈষ্ণব পদাবলী, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, মাঘ ১৪০৬, পৃ. ৪১৫।

৭. Sri Aurobindo, Bankim-Tilak-dayananda, Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry, 2006, Pg. 10.

৮. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ভারতীয় দর্শন, প্রথম খণ্ড, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০০৩, পৃ. ১৫।

৯. সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, শনিবারের চিঠি, বঙ্কিম-সংখ্যা, নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা, জানুয়ারী ১৯৯৯, পৃ. ৯৪।

১০. সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত, বঙ্কিমপ্রসঙ্গ, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৮২, পৃ. ৪৫।

১১. নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ২০০০, পৃ. ২২৯-৩০।

১২. ক্ষুদিরাম দাস, বৈষ্ণব-রস-প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল ২০০৯, পৃ. ২০৬-২০৭।

১৩. সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত, বঙ্কিমপ্রসঙ্গ, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৮২, পৃ. ১১৩।

১৪. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বঙ্কিম-উপন্যাসের শেষ পর্ব, এ. মুখার্জি এণ্ড কোং (প্রাঃ) লিমিটেড, কলিকাতা, আশ্বিন, ১৩৮৮, পৃ. ১১০।

১৫. বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত, ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় [দ্বিতীয় ভাগ], অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, আষাঢ় ১৪০৬, পৃ. ৩১-৩৫।

১৬. বরুণকুমার চক্রবর্তী, বাংলা সাহিত্যের বিস্মৃত অধ্যায়, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলিকাতা, সেপ্টেম্বর ২০০২, পৃ. ১৬।

১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৪।

১৮. প্রদীপ বসু, পারিবারিক প্রবন্ধ : বাঙালি পরিবারের সন্দর্ভ বিচার, গাঙচিল, কলকাতা, মার্চ ২০১২, পৃ. ৯৫, ৯৮।

১৯. শান্তনু ব্যানার্জী, ব্রহ্মচর্য : বিকল্প পৌরুষের সন্ধানে জাতীয়তাবাদী বাংলা; অবভাস, সম্পাদক শিবাশিস

দত্ত পার্থ চক্রবর্তী, চতুর্থ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৫, পৃ. ১৭৭।

২০. তপোব্রত ঘোষ, বাংলা সাহিত্যে বন্ধুত্ব; অবভাস, সম্পাদক শিবাশিস দত্ত পার্থ চক্রবর্তী, জানুয়ারী-মার্চ ২০০৩, পৃ. ৩২-৩৪।

২১. সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত, বঙ্কিমপ্রসঙ্গ, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৮২, পৃ. ৪০।

২২. রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত, কালিদাসের গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় ভাগ, বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির, কলিকাতা, প্রকাশকালহীন, পৃ. ৬২।

২৩. তপোব্রত ঘোষ, গোরা আর বিনয়, অবভাস, কলকাতা, মে ২০০২, পৃ. ১১।

২৪. অনিল আচার্য অর্ণব সাহা সম্পাদিত, যৌনতা ও বাঙালি, অনুষ্টুপ, কলকাতা, বইমেলা ২০০৯, পৃ. ১১৫।

২৫. Ruth Vanita and Saleem Kidwai edited, Same-Sex Love in India A Literary History, Penguin Books, New Delhi, 2008, Pg. 221.

২৬. শান্তনু ব্যানার্জি, ব্রহ্মচর্য : বিকল্প পৌরুষের সন্ধানে জাতীয়তাবাদী বাংলা; অবভাস, সম্পাদক শিবাশিস দত্ত. পার্থ চক্রবর্তী, জানুয়ারী-মার্চ ২০০৩, পৃ. ১৭০।

২৭. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বঙ্কিম-উপন্যাসের শেষ পর্ব, এ. মুখার্জি এণ্ড কোং. (প্রাঃ) লিমিটেড, কলিকাতা, আশ্বিন, ১৩৮৮, পৃ. ৬১, ৬৪।

পঞ্চম অধ্যায়

মুখচ্ছদ পুরাণ

পুরাণ-পাঠক বঙ্কিমচন্দ্র ঃ

'ধর্মতত্ত্ব'-এ শিষ্য গুরুর কাছে জানতে চেয়েছিল, 'ঈশ্বর'কে জানা যায় কিসে? গুরুর উত্তর—'হিন্দুশাস্ত্রে। উপনিষদে, দর্শনে, পুরাণে, ইতিহাসে, প্রধানতঃ গীতায়।' (পৃ. ৭৬) এর সবই পড়া ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের। বিশেষ করে তিনি পড়েছিলেন 'পুরাণ'। কেননা তাঁর মতে—'বাস্তবিক বৈদিক ধর্ম্ম অপেক্ষা পৌরাণিক ধর্ম্ম অঙ্কুরের অপেক্ষা বৃক্ষের ন্যায় শ্রেষ্ঠ।' (পৃ. ১৯৯) আর 'ধর্মতত্ত্ব'-এ 'পৌরাণিক উপাখ্যান'-এর গুণকীর্তন করে বঙ্কিম জানান—'পৌরাণিক উপাখ্যানগুলির এইরূপ গূঢ় তাৎপর্য্য অনুভূত করিতে পারিলে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম আর উপধর্ম্মসঙ্কুল বা "Silly" বলিয়া বোধ হইবে না।' (পৃ. ২৫) সেই 'গূঢ় তাৎপর্য্য'পূর্ণ 'পৌরাণিক উপাখ্যান'-কে আজীবন বিভিন্নভাবে তাঁর রচনায় ব্যবহার করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র; বিশেষত উপন্যাসে।

কোথা থেকে অর্জন করেছিলেন বঙ্কিম এই পুরাণ-প্রাজ্ঞতা? তাঁর রচনাবলীর সাক্ষ্যেই আঁচ করা চলে সে-সব উৎসমুখ। Horace Hayman Wilson কৃত লন্ডন থেকে ১৮৪০ সালে মুদ্রিত 'Vishnupurana' ব্যবহার করতেন বঙ্কিম। 'চিত্তশুদ্ধি' প্রবন্ধে জানিয়েছেন ভাগবতের 'শ্রীযুত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন-কৃত অনুবাদ' (পৃ. ১৭৬) ব্যবহারের খবর। 'কৃষ্ণচরিত্র' থেকে জানতে পারি 'ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ'-এর 'বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত সংস্করণ' (পৃ. ৯২) ব্যবহার করার কথা। তবে বঙ্কিমচন্দ্র আরো যে অনেক পুরাণের নাম তাঁর রচনায় উল্লেখ করেছেন, আমাদের অনুমান তার সবই তিনি পড়েছিলেন Muir সংগ্রহ থেকে। John Muir-এর পাঁচ খণ্ডে সম্পাদিত 'Original Sanskrit Texts on the Origin and History of the people of India' (William and Norgate : ১৮৬৯-৭০) বইটির উল্লেখ বঙ্কিমচন্দ্র 'The Study of Hindu Philosophy' (১৮৭২) থেকে শুরু করে গীতা-অনুবাদ (১২৯৩) অবধি করেছেন।

এছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্রের পুরাণ-সম্পর্কিত জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছিল তাঁর সংস্কৃত কাব্য-পাঠের অভ্যাস। কালিদাসের 'কুমারসম্ভবম্' অনুসারে মদনভস্মের 'পৌরাণিক উপাখ্যান'টিকে যেমন একাধিকবার তিনি ব্যবহার করেছেন, তেমনই কৃষ্ণকথার দ্বি-বেণী রচনা করেছেন 'মহাভারত' আর 'গীতগোবিন্দম্' অনুসরণে। বাঙালি কৃত্তিবাস-ভারতচন্দ্রও কখনো কখনো বঙ্কিমচন্দ্রকে সরবরাহ করেছেন কোনো নব্য পৌরাণিক আখ্যান।

বহুপাঠী বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কৃত ও ইংরেজি গ্রন্থপাঠের মধ্যে দিয়ে হিন্দু-পুরাণের যে জগৎ সম্পর্কে কৃতবিদ্য হয়ে উঠেছিলেন, তাঁর উপন্যাসে স্পষ্টই ছায়াপাত ঘটেছে তার। বিশেষ করে রাষ্ট্র-পরিবার-যৌনতা সংক্রান্ত তাঁর ভাবনাকে অনেক সময়েই 'পৌরাণিক উপাখ্যান'-এর মুখচ্ছদে উপস্থিত করেছেন তিনি। আশ্চর্য শিল্পিত তাঁর সেই পৌরাণিক মুখচ্ছদ।

গঙ্গা-ঐরাবত-সংবাদ ঃ

ব্যক্তিগতভাবে 'গঙ্গা' বঙ্কিমচন্দ্রের প্রিয় নদী। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিতে শোনা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের সেই ব্যক্তিগত স্বর—'একদিন বর্ষাকালে গঙ্গাতীরস্থ কোন ভবনে বসিয়াছিলাম। প্রদোষকাল—প্রস্ফূটিত চন্দ্রালোকে বিশাল বিস্তীর্ণ ভাগীরথী লক্ষবীচিবিক্ষেপশালিনী—মৃদু পবনহিল্লোলে তরঙ্গভঙ্গচঞ্চল চন্দ্রকরমালা লক্ষ তারকার মত ফুটিতেছিল ও নিবিতেছিল।... জেলে জাল বাহিতে বাহিতে গাহিতেছে—

''সাধো আছে মা মনে।
দুর্গা ব'লে প্রাণ ত্যজিব,
জাহ্নবী-জীবনে।''

তখন প্রাণ জুড়াইল—মনের সুর মিলিল—বাঙ্গালা ভাষায়—বাঙ্গালীর মনের আশা শুনিতে পাইলাম—এ জাহ্নবীজীবন দুর্গা বলিয়া প্রাণ ত্যজিবারই বটে, তাহা বুঝিলাম।' (পৃ. ১০০-১০১) সঙ্গতভাবেই বঙ্কিম-উপন্যাসে পুনরাবৃত্ত হন 'গঙ্গা'। নগেন্দ্র বা ইন্দিরার কলিকাতা-গমন যেমন গঙ্গা বেয়েই, তেমনি গঙ্গাতেই ডুবে মরতে চায় রজনী। চন্দ্রশেখরের জীবনকাহিনি গঙ্গার বাঁকে-বাঁকেই আবর্তিত হয়, আর কপালকুণ্ডলার জীবনের সমাপ্তি ঘটে গঙ্গাতেই। এহো বাহ্য। গঙ্গা-সংক্রান্ত একটি পৌরাণিক আখ্যানকেই বঙ্কিম ব্যবহার করেন চমৎকারভাবে, 'কামবৃত্তি' 'দম্পতিপ্রীতি'র দ্বৈরথ বোঝানোর জন্য।

'বিষবৃক্ষ'-এ নগেন্দ্র দত্তের অন্দরমহলে মেয়েদের আলোচনার বিষয় ছিল—'ভগীরথ গঙ্গা এনেছেন' (পৃ. ১৮)। এই পৌরাণিক আখ্যানটিই শুনি 'মৃণালিনী' উপন্যাসে মনোরমার মুখে—'ভগীরথ গঙ্গা আনিয়াছিলেন; এক দাম্ভিক মত্ত হস্তী তাহার বেগ সংবরণ করিতে গিয়া ভাসিয়া গিয়াছিল।' (পৃ. ৭২) কোথায় শুনেছে মনোরমা এই পুরাণ-কথা? বাল্মীকি বা বেদব্যাস নন, এই গল্পের জনক কৃত্তিবাস। কৃত্তিবাসের 'শ্রীরামপাঁচালী' অনুসারে 'সুমেরু পর্বত' অতিক্রমণের সময় গঙ্গা 'এক দারুণ গহ্বর'-এ পড়ে 'দ্বাদশ বৎসর' পথ খুঁজে পেলেন না। তখন তাকে মুক্ত করার জন্য দরকার পড়ল ঐরাবতের—'ঐরাবত পর্ব্বত চিরিয়া দেয় দাঁতে।।' কিন্তু ঐরাবত গর্বভরে একখানি কুৎসিত প্রস্তাব পেশ করে ঃ

'হইল যে গর্ব্ব ঐরাবতের অন্তরে।
আমার সম্বাদ নিয়া কহত গঙ্গারে।।
দাসী হয়ে গৃহে মম বঞ্চে এক রাতি।
তবে ত গঙ্গারে আমি করি অব্যাহতি।।'

ভগীরথ 'মলিন' মুখে গঙ্গাকে এই সংবাদ দিলে, পাল্টা শর্ত দিলেন গঙ্গাদেবীও; আর তারপরেই এই কাহিনির চমকপ্রদ সমাপ্তি ঃ

'জাহ্নবী বলেন তার বুঝিলাম তত্ত্ব।
রাজভোগে ঐরাবত হইয়াছে মত্ত।।
যদ্যপি আড়াই ঢেউ সহিতে সে পারে।
দাসী হয়ে সপ্ত রাত্রি রব তার ঘরে।।
... এক ঢেউ মারিলেন ঐরাবত পরে।
নাকে মুখে জল গেল হাঁসফাঁস করে।।
আর ঢেউ মারিলেন প্রায় গতপ্রাণ।
হস্তী বলে গঙ্গামাতা কর পরিত্রাণ।।
মা বলিয়া হস্তী যদি দাঁতে খড় করে।
আর ঢেউ রাখিলেন পর্ব্বত উপরে।।'[১]

এই 'পৌরাণিক উপাখ্যান'টির 'গূঢ় তাৎপর্য্য'ই আমরা শুনি মনোরমার মুখে; সে এই 'গূঢ়ার্থ' শুনেছে, 'পণ্ডিতের নিকট'—'গঙ্গা প্রেমপ্রবাহস্বরূপ; ইহা জগদীশ্বর-পাদ-পদ্ম-নিঃসৃত, ইহা জগতে পবিত্র,—যে ইহাতে অবগাহন করে, সেই পুণ্যময় হয়। ইনি মৃত্যুঞ্জয়-জটা-বিহারিণী; যে মৃত্যুকে জয় করিতে পারে, সেও প্রণয়কে মস্তকে ধারণ করে।... দাম্ভিক হস্তী দম্ভের অবতারস্বরূপ। সে প্রণয়বেগে ভাসিয়া যায়।' (পৃ. ৭২) গঙ্গা 'প্রেমপ্রবাহস্বরূপ'। বলাই বাহুল্য বঙ্কিম-মানসে গঙ্গা আসলে 'দম্পতিপ্রীতি'-রই রূপ। আর 'দাম্ভিক হস্তী' কি শুধুই 'দম্ভের অবতারস্বরূপ'? কৃত্তিবাসের কাহিনিতে ঐরাবত 'কামবৃত্তি'-রও প্রতীক। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবনাতেও নয় কি? অর্থাৎ এই 'পৌরাণিক উপাখ্যান'-এর 'গূঢ়ার্থ' হল 'দম্পতিপ্রীতি'র কাছে 'কামবৃত্তি'র অবশ্যম্ভাবী পরাজয়।

গঙ্গা-ঐরাবত-সংবাদ-এর এই 'গূঢ়ার্থ'-ই আমরা খুঁজে পাই 'ইন্দিরা'য়। যে ইন্দিরার গঙ্গা দেখেই 'আহ্লাদ' হয়েছিল, যে ভেবেছিল 'গঙ্গার প্রশস্ত হৃদয়!... গঙ্গা যথার্থ পুণ্যময়ী' (পৃ. ১০), সেই ইন্দিরাই ক্রমে ক্রমে অনুশীলিত করে তোলে স্বামী উপেন্দ্রের চিত্তবৃত্তিকে—'তাঁহার চিত্তের দুর্দ্দমনীয় বেগ প্রতি

পদে দেখিতে পাইতাম, অথচ আমার ইঙ্গিত মাত্রে স্থির হইতেন।' (পৃ. ৫২) এর পরেই ইন্দিরার পুরাণ-কথন—'হাতীর পায়ে শিকল পরাইয়াছি, ইহা বুঝিলাম।' (পৃ. ৫২) ঐরাবত-রূপী 'কামবৃত্তি'-কে অনুশীলিত করা প্রেমপ্রবাহস্বরূপিণী গঙ্গারই জয়-গাথা বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইন্দিরা'।

'ধর্মতত্ত্ব'-এ লিখেছিলেন বঙ্কিম, যে কখনো কখনো 'কামবৃত্তি' এসে 'দম্পতিপ্রীতিস্থান অধিকার' করে; তখন শুরু হয় অনাবশ্যক সমস্যা। এর একটি অ-পূর্ব চিহ্ন মেলে 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে—'ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরা নিরীহ ভালমানুষের মত আপন মনে গঙ্গাস্তব পড়িতেছেন, পূজা করিতেছেন, এক একবার আকণ্ঠনিমজ্জিতা কোন যুবতীর প্রতি অলক্ষ্যে চাহিয়া লইতেছেন।' (পৃ. ৩) 'প্রণয় প্রবাহ'-এর মধ্যে থেকেও নির্জিত হয়নি 'কামবৃত্তি'। নগেন্দ্রের 'দম্পতিপ্রীতি'-র মধ্যেও 'অলক্ষ্যে' কোন্ বাসনা ক্রমজায়মান, এ ছিল তারই পূর্বাভাস। 'এহো হয় আগে কহ আর।' 'প্রণয় প্রবাহ' যে গঙ্গা, শৈবলিনীর 'কামবৃত্তি'কেই বা সে নির্জিত করতে পারল কই? 'আত্মানুরাগিনী প্রীতি'ই যার সর্বস্ব, সেই শৈবলিনী তাই গঙ্গাবক্ষে 'প্রণয়ে আত্মবিসর্জন'-এ পরাঙ্মুখ। আর কাহিনির মধ্যপর্বে সেই গঙ্গায় সাঁতার দিতে দিতেই শৈবলিনীর 'কামবৃত্তি'কে অনুশীলনের শপথ গ্রহণে বাধ্য করবে প্রতাপ।

গঙ্গা-ঐরাবতের পৌরাণিক আখ্যানটিকেই অবশ্য ভিন্ন 'গূঢ়ার্থে'ও ব্যবহার করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। 'আনন্দমঠ'-এ ভবানন্দ আত্মকৃত পাপ ব্যাখ্যা করে বলেন—'আমি ভাগীরথী জলতরঙ্গসমীপে ক্ষুদ্র গজের মত ইন্দ্রিয়স্রোতে ভাসিয়া গেলাম, ইহাই আমার দুঃখ।' (পৃ. ৮৪) এখানে ভাগীরথীর 'জলতরঙ্গ'ই হয়েছে প্রবল অনিরুদ্ধ 'ইন্দ্রিয়স্রোত' তথা 'কামবৃত্তি' আর অননুশীলিত ভবানন্দ নিজেকে বিবেচনা করেছেন 'ক্ষুদ্র গজ'-এর মতো হীনশক্তি।

হর-পার্বতী ঃ

বাঙালি হিন্দু সংস্কৃতিতে দাম্পত্যের মান্য দেবযুগল কারা, তার একটি সংহত সূচী মেলে বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত'-এ। নিমাই পণ্ডিত আর বিষ্ণুপ্রিয়ার বিবাহে প্রতিবেশিনীদের মন্তব্য স্মরণীয়ঃ

'কেহ বলে বুঝি হেন এই হর-গৌরী।
কেহ বলে হেন জানি কমলা-শ্রীহরি।।
কেহ বলে এই দুই কামদেব-রতি।
কেহ বলে ইন্দ্র-শচী হেন লয় মতি।।
কেহ বলে হেন বুঝি রামচন্দ্র-সীতা।
এই মত বলে সর্ব সুকৃতি বনিতা।।'[২]

হিন্দু সংস্কৃতিতে নিষ্ণাত বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে দাম্পত্যের মুখচ্ছদ রূপে উপরোক্ত সমস্ত দেবদম্পতিকেই খুঁজে পাব আমরা; সবচেয়ে বেশি পাব হর-গৌরীকে। বিশেষত কালিদাসের 'কুমারসম্ভবম্'-এ 'মন্মথ'কে 'ভস্মীভূত' করে শিব যেভাবে নিজেকে অনুশীলিত 'দম্পতিপ্রীতি'র আদর্শ রূপে প্রতিষ্ঠা করেছেন, তা যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের অতি-প্রিয় ছিল, তেমনই বঙ্কিম-মানসে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল 'দম্পতিপ্রীতি'-স্থিতিকামী উমার তপস্যা। চোখ এড়িয়ে যায় আমাদের যে রবীন্দ্রনাথের 'সৌন্দর্যের গান' আর 'সমাজের গান'-এর কত আগে 'Letters on Hinduism'—এই বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণ-কথা আর শিব-কথাকে বিন্যস্ত করে ফেলেছেন দ্বি-ধারায়—'The Radha myths represents the Religion of love; the Sakti myths the Religion of Discipline.' (P. 246)

'মৃণালিনী' উপন্যাসের পশুপতি-মনোরমা স্বরূপত পশুপতি-হৈমবতী। শুধু তাদের নামের মধ্যেই হর-পার্বতীর পুনর্জন্ম ঘটেছে ভাবলে ভুল হবে। 'মৃণালিনী' উপন্যাসে পশুপতি অগ্নিস্বরূপ। মনোরমাই বলে—'তিনি অগ্নিস্বরূপ—আলো করেন, কিন্তু দগ্ধও করেন।' (পৃ. ৭২) শিবই একমাত্র দেবতা যিনি বৈদিক অগ্নিকে আত্মস্থ করেছেন। পুরাণ-বিশেষজ্ঞের মতে ঃ

> 'ঋগ্বেদেই অগ্নিকে রুদ্র বলা হয়েছে। ... রুদ্রেরই অপর নাম শিব। ... শিবের আর এক নাম পশুপতি। কৃষ্ণযর্জুবেদ বলছেন অগ্নিই পশুপতি—''ইমং পশুং পশুপতে তে অদ্য বধ্নাম্যগ্নে সুকৃতস্য মধ্যে।''—হে পশুপতি অগ্নি, অদ্যকার সম্যক অনুষ্ঠিত যজ্ঞে এই পশু বাঁধলাম, তুমি অনুমোদন কর।'[৩]

বঙ্কিমচন্দ্র কি জানতেন পশুপতি-শিবের অগ্নিস্বরূপত্ব? অবশ্যই জানতেন। Muir-সংগ্রহ থেকেই জেনেছিলেন তিনি। লিখেছেনও সে-কথা 'দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম্ম'-এ—'অগ্নি রুদ্রে মিশিয়া গিয়াছে।' (পৃ. ১৯৩) এহো বাহ্য। পশুপতি-মনোরমা যে আসলে 'কুমারসম্ভবম্'-এর উমা-মহেশ্বর তার আরেকটি অব্যর্থ প্রমাণ দাখিল করা যাক। মনোরমার সঙ্গে পশুপতির উপন্যাসে প্রথম সাক্ষাৎ দেবী-মন্দিরে—'সেই রত্নপ্রদীপ্তদীপ্ত দেবীমন্দিরে, চন্দ্রালোক বিভাসিত দ্বারদেশে, মনোরমাকে দেখিয়া, পশুপতির হৃদয় উচ্ছ্বাসোন্মুখ সমুদ্রের ন্যায় স্ফীত হইয়া উঠিল।' (পৃ. ৫০) স্পষ্টতই এ-বর্ণনা 'কুমারসম্ভবম্'-এ হরধ্যানভঙ্গের পর শিবের প্রথম পার্বতী-সন্দর্শনের প্রাক্-মুহূর্তের ঃ

> 'হরস্তু কিঞ্চিৎপরিবৃত্ত ধৈর্য্যশ্চন্দ্রোদয়ারম্ভে ইবাম্বুরাশিঃ।.. কন্দর্পের এই বাণ সন্ধানের ফলে, চন্দ্রোদয়ের প্রারম্ভকালে, অম্বুরাশি যেমন ঈষৎ চঞ্চল হইবার মতো হয়, মহাদেবেরও ধৈর্য্য সেইরূপ কিঞ্চিৎ চঞ্চল হইল।'[৪]

আর এভাবে ভাবতে পারলে মনোরমার সহমরণও 'সতীদাহ'-এর পৌরাণিক ব্যঞ্জনাকেই আভাসিত করে তোলে।

হর-গৌরী আবারও আভাসিত হয়ে উঠবেন রাজসিংহ-চঞ্চলকুমারীর মধ্যে। নির্মলকুমারীর প্রশ্নের উত্তরে চঞ্চলকুমারীর গাওয়া প্রণয়গীতের প্রথম পংক্তিতেই তাঁদের আবির্ভাব—'গৌরী সম্‌ঝে ভসম্‌ভার।' (পৃ. ৩৫) রাজসিংহ শিবের ন্যায় জিতেন্দ্রিয়। তাই যুদ্ধক্ষেত্রে—'চঞ্চলকুমারী হাসিল—অতিশয় প্রণয়প্রফুল্ল, ভক্তিপ্রণোদিত, সাক্ষাৎ মহাদেবের অনিবার্য্য এক কটাক্ষবাণ রাজসিংহর উপর ত্যাগ করিল।' (পৃ. ৯৭) এই অতিশয়োক্তির আড়ালে আসলে রাজসিংহকেই 'মহাদেব' বলা হল। অনুরূপ ঘটনা দেখি 'রজনী'তেও। অমরনাথের জিতেন্দ্রিয়তা বুঝতে পেরেই তাকে 'মহাদেব'-এর সঙ্গে তুলনা করেন লবঙ্গলতা—'যে আমার স্বামী না হইয়া একবার আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়াছিল, তিনি স্বয়ং মহাদেব হইলেও তাঁহার জন্য আমার হৃদয়ে এতটুকু স্থান নাই।' (পৃ. ৮১) দাম্পত্যের দেবতা শিব একপত্নীক, অনন্যব্রত। তাই 'দুর্গেশনন্দিনী'-তে 'শৈলেশ্বর' শিবের মন্দিরেই প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে তিলোত্তমা-জগৎসিংহের আর বিমলার সঙ্গে দ্বিতীয় সাক্ষাতে জগৎসিংহের শপথ—'এই শৈলেশ্বর সাক্ষাৎ সত্য করিতেছি যে, তিলোত্তমা ব্যতীত অন্য কাহাকেও ভালবাসিব না।' (পৃ. ৪৫)

শিবের ধ্যানগম্ভীর জিতেন্দ্রিয় মূর্তি যেমন, তেমনই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রিয় উমার তপস্বিনী মূর্তি। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের শীর্ষে পাই 'কুমারসম্ভবম্'-এর পঞ্চম সর্গের শ্লোক—'কিমিত্যপাস্যাভরণানি যৌবনে' যা আসলে তপস্বিনী উমার বর্ণনা। 'দম্পতিপ্রীতি'-তে অধিষ্ঠিত হওয়ার বাসনায় নারীর অনুশীলনের 'গূঢ়ার্থ' বঙ্কিম খুঁজে পেয়েছিলেন পার্বতীর তপস্যার মধ্যে। ফলে আমরা দেখবো 'কামবৃত্তি'-কে পরাজিত করার জন্য শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত হোক অথবা প্রফুল্লর অনুশীলন, সবই আসলে উমার তপস্যার রূপভেদ মাত্র। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'দেবী চৌধুরাণী' তাঁর সামগ্রিক অনুশীলিত সত্তা নিয়ে শেষতক্ 'দম্পতিপ্রীতি'-তেই পুনঃপ্রতিষ্ঠা পাবেন।

একটি সারণির সহায়তার দেখানো যাক শৈবলিনী, প্রফুল্ল আর উমার অনুশীলন-তপস্যার সামীপ্যঃ

	উমার তপস্যা। ‘কুমারসম্ভবম্’। কালিদাস।	শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত। ‘চন্দ্রশেখর’।		প্রফুল্লর অনুশীলন। ‘দেবী চৌধুরাণী’।
বসন	‘তাপসীবেশা উমা ব্রতের জন্য, তপস্যার জন্য, তিনগুণ করিয়া অর্থাৎ তিন লহর—মুঞ্জ-রচিত মেখলা ধারণ করিলেন। একদিন যে নিতম্বে মণিময় রসনা পরিতেন, আজ কঠিন মুঞ্জ-রচিত মেখলার প্রথম বন্ধনে সেই নিতম্বদেশ লাল হইয়া উঠিল এবং উহার কঠিনতার সংস্পর্শে ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার কলেবর রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল।’[৫]	‘তোমার ও চীনবাস পরিত্যাগ করিয়া, আমি যে বসন দিই, তাই পর।’ (পৃ. ৮২)	প্রথম বছর	‘চারিখানা কাপড়’। (পৃ. ৫০)
			দ্বিতীয় বছর	‘দুইখানা’। (পৃ. ৫০)
			তৃতীয় বছর	গ্রীষ্মকালে ‘মোটা গড়া’। শীতকালে ‘ঢাকাই মলমল।’ (পৃ. ৫০)
			চতুর্থ বছর	‘পাট কাপড়’। (পৃ. ৫০)
			পঞ্চম বছর	‘ইচ্ছামত।’ ‘প্রফুল্ল মোটা গড়াই বাহাল রাখিল।’ (পৃ. ৫০)
ভূষণ	‘গৌরীর সেই আগুল্‌ফবিলম্বী কেশপাশে তাঁহার মুখখানিকে যেমন সুন্দর দেখাইত, আজ জটাভারেও তাহা তেমনই মধুর মনে হইল।’[৬]	‘জটাধারণ করিবে।’ (পৃ. ৮২)	প্রথম বছর	‘তৈল নিষেধ’। (পৃ.৫০)
			দ্বিতীয় বছর	‘চুল বাঁধাও নিষেধ।’ (পৃ. ৫০)
			তৃতীয় বছর	‘মাথা মুড়াইল’। (পৃ. ৫০)
			চতুর্থ বছর	‘কেশ গন্ধ তৈল দ্বারা নিষিক্ত’ করা। (পৃ. ৫০)
			পঞ্চম বছর	‘স্বেচ্ছাচার।’ প্রফুল্ল ‘চুলে হাতও দিল না।’ (পৃ. ৫০)

	উমার তপস্যা। 'কুমারসম্ভবম্'। কালিদাস।	শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত। 'চন্দ্রশেখর'।	প্রফুল্লর অনুশীলন। 'দেবী চৌধুরাণী'।	
শয়ন	'আহা! কত অমূল্য দুগ্ধফেননিভ শয্যায় যে রাজনন্দিনী গৌরী শয়ন করিতেন এবং পার্শ্বপরিবর্ত্তনের সময়ে, স্বীয় কবরীবিগলিত একটি ফুলের আঘাতেও কত ব্যথা পাইতেন, আজ তিনি, সেই নবনীত কোমল উমা অনাবৃত ভূমিতলে বসিয়া বসিয়া, যদি কখনো একটু ক্লান্তি বোধ হইত, নিজের ভুজলতায় মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক ভূমিতেই শুইয়া পড়েন।'[৭]	'ভূতলে শয়ন করিবে।' (পৃ. ৮২)	প্রথম বছর	'তূলার তোষকে তূলার বালিশে।' (পৃ. ৫০)
			দ্বিতীয় বছর	'বিচালীর বালিশ, বিচালীর বিছানা।' (পৃ. ৫০)
			তৃতীয় বছর	'ভূমি-শয্যা'। (পৃ. ৫০)
			চতুর্থ বছর	'কোমল দুগ্ধফেননিভ শয্যা।' (পৃ. ৫০)
			পঞ্চম বছর	'স্বেচ্ছাচার'। 'প্রফুল্ল যেখানে পাইত, সেখানে শুইত।' (পৃ. ৫০)
ভোজন	'ব্রতের সময়-শিলোঞ্ছবৃত্তি করিতে হয়, জীবন ধারণের তাহাই একমাত্র উপায়, কিন্তু উমাত' কিছুই খাইতেন না।'[৮]	'ফলমূলপত্র ভিন্ন ভোজন করিবে না।' (পৃ. ৮২)	প্রথম বছর	'মোটা চাল, সৈন্ধব, ঘি ও কাঁচা কলা।' (পৃ. ৪৯)
			দ্বিতীয় বছর	'নুন লঙ্কা ভাত'। (পৃ. ৪৯)
			তৃতীয় বছর	'নুন লঙ্কা ভাত'। (পৃ. ৪৯)
			চতুর্থ বছর	'উপাদেয়' খাদ্য। (পৃ. ৫০)
			পঞ্চম বছর	'যথেচ্ছ ভোজনের উপদেশ।' 'প্রফুল্ল প্রথম বৎসরের মত খাইল।' (পৃ.৫০)

শৈবলিনী আর প্রফুল্লর উমা-সারূপ্য দেখানোর জন্য আরো দুটি বিষয়ের অবতারণা করা যাক। প্রথমে শৈবলিনী। 'শ্রান্ত, বিকৃতবুদ্ধি' শৈবলিনী চন্দ্রশেখরকে মনে করেছে 'পর্ব্বতের দেবতা' (পৃ.৮২)। মনে পড়বে আমাদের জগৎসিংহ-তিলোত্তমার মিলনের সাক্ষী দেবতাটির নাম 'শৈলেশ্বর'। এহো বাহ্য। প্রফুল্লর অনুশীলন যে উমার তপস্যারই নামান্তর, তার ফলস্বরূপই ঘটবে তার ব্রজেশ্বর-দর্শন। নিশি দেবীকে বহুমূল্য রত্নালঙ্কারে ভূষিত করে স্বামীসন্দর্শনে পাঠাতে চেয়েছিল, কিন্তু—'প্রথমে নিশির বুদ্ধিতে দেবী ভ্রমে পড়িয়াছিলেন; শেষে বুঝিতে পারিয়া আপনা আপনি তিরস্কার করিয়াছিল; ''ছি! ছি! ছি! কি করিয়াছি! ঐশ্বর্য্যের ফাঁদ পাতিয়াছি!'' তাই এ বেশ পরিবর্তন।' (পৃ.৭৮) 'রূপে তোমায় ভোলাবো না'—এতো বঙ্কিমচন্দ্রের 'দম্পতিপ্রীতি'র মর্মকথা। কালিদাসের 'কুমারসম্ভবম্'-এরও নয় কি? স্মরণীয় পঞ্চম সর্গের শ্লোকার্থ ঃ

> 'হিমাদ্রি-তনয়া উমা, চোখের উপর, পিনাকী কর্ত্তৃক কন্দর্প ভস্মীভূত হওয়ায় বুঝিয়াছেন যে তাঁহার রূপের দাম কত, দৈহিক সৌন্দর্য্য কত অকিঞ্চিৎকর, তিনি মনে মনে নিজের রূপের শতসহস্র ধিক্কার দিতে লাগিলেন।....পার্ব্বতীর নশ্বর রূপের উপর একটা কেমন ঘোর বিতৃষ্ণা জন্মিল। যে রূপে হৃদয়বল্লভের মন আকৃষ্ট হয় না, সে কি আবার রূপ?'[৯]

উমা-মহেশ্বরের দাম্পত্যে বিচ্ছেদ আছে, কিন্তু তা পুনর্মিলনের সম্ভাবনায় উজ্জ্বল। 'সতী'র মৃত্যুতে ছেদ পড়ে না এই দৈবী দাম্পত্যে। 'উমা'র পুনর্জন্মে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তা। রসশাস্ত্রের ভাষায় স্থায়িভাব 'শোক' নয়, রসপরিণতি 'করুণ' নয়; স্থায়িভাব 'রতি', রসপরিণতি 'করুণ বিপ্রলম্ভাখ্য শৃঙ্গার'-এ। হর-গৌরীর এই বিচ্ছেদ-পুনর্মিলনের পালা বঙ্কিম-উপন্যাসের দাম্পত্যেও ছায়া ফেলেছে। তবে উমা-শঙ্করের এই হারিয়ে-পাওয়ার লীলা বঙ্কিম-উপন্যাসে আশ্রয় করেছে হর-গৌরীর অধিষ্ঠান-ভূমি 'কাশী'কে। শিবের শহর 'কাশী'তেই হর-পার্বতীর নিত্য অধিষ্ঠান। তাই 'মৃণালিনী' উপন্যাসে পশুপতি যৌবনে 'কাশীধামে' (পৃ.৪৩)-ই থাকতেন। সেখানেই 'অষ্টমবর্ষীয়া' 'হৈমবতী'-র (পৃ.৪৩) সঙ্গে তার বিবাহ সম্পন্ন হয়। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে 'দম্পতিপ্রীতি'-চ্যুতা শৈবলিনীর মঙ্গলার্থে তাকে 'কাশী'তেই পাঠাতে চান রমানন্দ স্বামী। আর পত্নী-পরিত্যক্ত নগেন্দ্র 'বিষবৃক্ষ'-এ 'কাশীধামে' (পৃ. ১০০) 'ভুবনসুন্দরী বারাণসি' (পৃ.১০১)-তে পৌঁছেই জানতে পারেন সূর্য্যমুখীর সংবাদ।

মদনভস্ম ও রতিবিলাপ ঃ

হর-পার্বতী যদি হন 'দম্পতিপ্রীতি'র পরাকাষ্ঠা, তবে এই দাম্পত্যে আঘাত-হানা 'কামবৃত্তি'-র বঙ্কিমচন্দ্রের পছন্দের রূপকল্পটি হল মদনের হরধ্যানভঙ্গ। তারই চরম পরিণতি 'মদনভস্ম'। আজীবন

বঙ্কিম কতবার যে এই পুরাকথাকে কত ভাবে ব্যবহার করেছেন তা বলাই বাহুল্য। প্রথম যৌবনের কবিতায় বঙ্কিমচন্দ্র এই পৌরাণিক উপাখ্যানকে রীতিমতো চাপল্যের সঙ্গেই ব্যবহার করেছেন। মদনভস্মের কাহিনি সেই যুবক বঙ্কিমের দাম্পত্যান্তর্গত 'কামবৃত্তি'-রই এক রূপ। দ্রষ্টব্য ১৮ মার্চ ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে 'সংবাদ প্রভাকর'-এ মুদ্রিত 'কামিনীর প্রতি উক্তি। তোমাতে লো ষড় ঋতু' কবিতাটি ঃ

'বুঝেছি কারণ সখি, যাহে নাহি স্মর
পলায়েছে মনসিজ, হেরে কুচ হর।।
শক্ত নহে শিব সহ, করিবারে রণ।
ধনুর্ব্বাণ ফেলে দিয়ে, পলালো মদন।।' (পৃ.৩১)

প্রথম বাংলা উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' থেকেই আমরা দেখবো, 'কামবৃত্তি'র প্রতীক রূপে 'মদনদেব'-এর আনাগোনা শুরু হয়েছে। শৈলেশ্বর মন্দিরে দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারে তাই বিমলাকে জগৎসিংহ বলবে—'স্বয়ং মহাদেব তপোবনে মন্মথ শত্রুকে ভস্মরাশি করিয়াছিলেন; অদ্য পক্ষমাত্র হইল, সেই মন্মথ তাঁহার এই মন্দির মধ্যেই বড় দৌরাত্ম্য করিয়াছে।' (পৃ.৪২-৪৩)

মদনের হরধ্যানভঙ্গের 'গূঢ়ার্থ' বঙ্কিমচন্দ্র একাধিকবার তাঁর পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছেন। 'ধর্মতত্ত্ব'-এ শিষ্য যখন দাবি করে পশুদেরও 'দম্পতিপ্রীতি' আছে এবং স্বপক্ষে উদ্ধার করে 'মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈক পাত্রে' শ্লোকটি, সঙ্গে সঙ্গে গুরু দেখিয়ে দেন—'রতি সহিত মন্মথ সেখানে উপস্থিত, তাই এই পাশব অনুরাগের বিকাশ। কবি নিজেই বলিয়া দিয়াছেন যে, এই অনুরাগ স্মরজ। ইহা পশুদিগেরও আছে, মনুষ্যেরও আছে। ইহাকে কামবৃত্তি বলিয়া পূর্বে নির্দিষ্ট করিয়াছি।' (পৃ.১২০) 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে হরদেব ঘোষাল তাঁর চিঠিতে 'কুমারসম্ভবম্'-এর ঠিক এই অংশটুকুর কথাই উল্লেখ করে বলেন—'যে বৃত্তির কল্পিত অবতার বসন্তসহায় হইয়া, মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ করিতে গিয়াছিলেন, যাঁহার প্রসাদে কবির বর্ণনায় মৃগেরা মৃগীদিগের গাত্রে গাত্রকণ্ডূয়ন করিতেছে, করিগণ করিণীদিগকে পদ্মমৃণাল ভাঙ্গিয়া দিতেছে, সে এই রূপজ মোহমাত্র।' (পৃ.৮৯-৯০) অথচ নগেন্দ্র-সূর্য্যমুখীর দাম্পত্য মন্দিরে, তাদের শয়নকক্ষে কুমারসম্ভবের ঠিক এই মুহূর্তটিরই ছবি আঁকানো আছে—'একখানি চিত্র কুমারসম্ভব হইতে নীত। মহাদেব পর্ব্বতশিখরে বেদির উপর বসিয়া তপশ্চরণ করিতেছেন। লতাগৃহদ্বারে নন্দী, বামপ্রকোষ্ঠার্পিতহেমবেত্র—মুখে এক অঙ্গুলি দিয়া কাননশব্দ নিবারণ করিতেছেন। কানন স্থির—ভ্রমরেরা পাতার ভিতর লুকাইয়াছে—মৃগেরা শয়ন করিয়া আছে। সেই কালে হরধ্যানভঙ্গের জন্য মদনের অধিষ্ঠান। সঙ্গে সঙ্গে বসন্তের উদয়। অগ্রে বসন্তপুষ্পাভরণময়ী পার্ব্বতী, মহাদেবকে প্রণাম করিতে আসিয়াছেন। উমা যখন শম্ভুসম্মুখে প্রণামজন্য নত হইতেছেন, এক জানু ভূমিস্পৃষ্ট করিয়াছেন, আর এক জানু ভূমিস্পর্শ করিতেছে, স্কন্ধসহিত মস্তক নমিত হইয়াছে, সেই

অবস্থা চিত্রে চিত্রিতা। মস্তক নমিত হওয়াতে অলকবন্ধ হইতে দুই একটি কর্ণবিলম্বী কুরুবক কুসুম খসিয়া পড়িতেছে; বক্ষ হইতে বসন ঈষৎ ত্রস্ত্র হইতেছে, দূর হইতে মন্মথ সেই সময়ে, বসন্তপ্রফুল্লবনমধ্যে অর্দ্ধলুক্কায়িত হইয়া এক জানু ভূমিতে রাখিয়া, চারু ধনু চক্রাকার করিয়া, পুষ্পধনুতে পুষ্পশর সংযোজিত করিতেছেন।' (পৃ. ১২১) 'সূর্য্যমুখী নগেন্দ্র উভয়ে মিলিত হইয়া' যে-সব 'চিত্রের বিষয় মনোনীত' করেছিল, তার মধ্যে এই ছবিটি কেন? তবে কি 'অনন্যব্রত' এই দম্পতির অগোচরেই এই চিত্রের নির্বাচনের মধ্যেই উঠে এসেছিল, এই সত্য, যে 'রূপজ মোহ'-এর ছিদ্রপথে এর পর এই সম্পর্কে আঘাত হানবে 'কামবৃত্তি?'

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে 'কামবৃত্তি' সম্পন্ন নর-নারীর প্রসঙ্গে সরাসরিই চলে আসে কন্দর্পের কথা। 'সীতারাম' উপন্যাসে বঙ্কিম একেবারে কুমারসম্ভবের শ্লোক উদ্ধার করেই বুঝিয়ে দেবেন রমার প্রতি গঙ্গারামের প্রণয়ের স্বরূপ—'গঙ্গারামের যদি তেমন চক্ষু থাকিত, তবে গঙ্গারাম ইহার ভিতর আর একজন লুকাইয়া আছে দেখিতে পাইতেন। সে মনুষ্য নহে—দেখিতেন—

* দক্ষিণাপাঙ্গনিবিষ্টমুষ্টিং নতাং সমাকুঞ্চিতসব্যপাদম্।
*** চক্রীকৃতচারুচাপং প্রহর্ত্তুমভ্যুদ্যতমাত্মযোনিম্।।' (পৃ. ৭৭)

আরো স্পষ্ট অক্ষরে এর ব্যাখ্যা করেই এরপর বঙ্কিমচন্দ্র লিখবেন—'আসল কথা, গঙ্গারামের মাথামুণ্ড তখন কিছুই ছিল না, সেই ধনুর্দ্ধর ঠাকুর ফুলের বাণ মারিয়া তাহা উড়াইয়া লইয়া গিয়াছিলেন।' (পৃ. ৭৮) শুধু গঙ্গারাম নয়, সীতারামও 'কামবৃত্তি'র দ্বারা গ্রস্ত। ফলে জয়ন্তী সীতারাম সম্পর্কে অনায়াসে মন্তব্য করে—'পুষ্পশরাহতের প্রলাপ!' (পৃ. ১৪০) আর 'বিষবৃক্ষ'-এর হীরা সম্পর্কে স্বয়ং লেখকের টিপ্পনী—'প্রাচীন কবিগণ যে শক্তিকে জিতেন্দ্রিয় মৃত্যুঞ্জয়ের সমাধিভঙ্গে ক্ষমতাশালিনী বলিয়া কীর্ত্তিত করিয়াছেন, সেই শক্তির প্রভাবে হীরার বুদ্ধি লোপ হইল।' (পৃ. ১০২) 'রাজসিংহ'-এ আবারও ফিরে আসেন মন্মথ। ঔরঙ্গজেব সম্বন্ধে কাহিনির কথকের মন্তব্য—'এই কপটাচারী সম্রাট্ জিতেন্দ্রিয়তার ভাণ করিতেন—কিন্তু অন্তঃপুর অসংখ্য সুন্দরীরাজিতে মধুমক্ষিকাপরিপূর্ণ মধুচক্রের ন্যায় দিবারাত্র আনন্দধ্বনিতে ধ্বনিত হইত। তাঁহার মহিষীও অসংখ্য—আর সরার বিধানের সঙ্গে সম্বন্ধশূন্য বেতনভাগিনী বিলাসিনীও অসংখ্য।' (পৃ. ৫৩) এ হেন সম্রাট ঔরঙ্গজেবের বাসস্থান যে আগ্রার দূর্গ, তাকে 'কুবের ও কন্দর্পের রাজ্য' (পৃ. ৪৫) ছাড়া আর কী-ই বা বলতেন বঙ্কিমচন্দ্র?

সীতারামের 'কামবৃত্তি' ধ্বংস করেছে তার 'দম্পতিপ্রীতি'কে। সীতারাম কন্দর্পের দ্বারা বিজিত হয়েছেন। আর ইন্দিরা? সে কন্দর্প-বিজয়িনী। আত্মকথনে যদিও সে বলেছে—'যে ঠাকুরটির অঙ্গ নাই, অথচ ধনুর্ব্বাণ আছে,—মা বাপ নাই, অথচ স্ত্রী আছে—ফুলের বাণ, অথচ তাহাতে পর্ব্বতও বিদীর্ণ হয়; সেই দেবতা স্ত্রীজাতির গর্ব্বখর্ব্বকারী।' (পৃ. ৫১) আসলে কিন্তু সে-ই কন্দর্প-গর্ব-খর্বকারিণী। আত্ম-অনুশীলিতা ইন্দিরা তাই অনায়াসে জয় করেছে মন্মথকে; দাম্পত্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠ হয়েছে সগৌরবে। আর বলেছে—'যে

দেবতা, ইহার সঙ্গে দেহের সম্বন্ধ ঘটাইয়াছে, তাহার নিজের দেহ যে ছাই হইয়া গিয়াছে, খুব হইয়াছে।' (পৃ. ৫২)

'ধর্মতত্ত্ব'-এর গুরুই বলেছিলেন 'দম্পতিপ্রীতি'র মধ্যেও পর্যাপ্ত পরিমাণে 'কামবৃত্তি' থাকে। এই পর্যাপ্ত 'কামবৃত্তি' যে 'দম্পতিপ্রীতি'কে কতদূর সার্থক করে তুলতে পারে তার উদাহরণ শ্রীশচন্দ্র-কমলমণি আর তাদের সন্তান সতীশচন্দ্রের পরিপূর্ণ পারিবারিক চিত্রের মধ্যে ধরা আছে। এহো বাহ্য। 'আনন্দমঠ'-এর শান্তি-জীবানন্দের প্রথম মিলনদৃশ্য 'দম্পতিপ্রীতি'র অন্তর্গত পর্যাপ্ত 'কামবৃত্তি'-র অ-পূর্ব রূপায়ণ—'অপ্সরোগণের ভ্রূবিলাসযুক্ত কটাক্ষের জ্যোতি লইয়া অতি যত্নে নির্ম্মিত যে সম্মোহন শর, পুষ্পধন্বা তাহা পরিণীত দম্পতির প্রতি অপব্যয় করেন না।... কিন্তু আজ বোধ হয় পুষ্পধন্বার কোন কাজ ছিল না—হঠাৎ দুইটা ফুলবাণ অপব্যয় করিলেন। একটা আসিয়া জীবানন্দের হৃদয় ভেদ করিল—আর একটা আসিয়া শান্তির বুকে পড়িয়া, প্রথম শান্তিকে জানাইল যে, সে বুক মেয়েমানুষের বুক—বড় নরম জিনিস।' (পৃ. ৫২-৫৩) ফল? 'শান্তির অধরে অধর দিয়া সুধাপান' (পৃ. ৫৩) করে জীবানন্দ তাদের 'সুখস্বপ্নের মত' দাম্পত্যের শুভসূচনা করলেন। এই সূত্রেই ফিরিয়ে পড়া যাক 'রজনী' উপন্যাসটিকেও। রজনী সম্পর্কে শচীন্দ্রের স্বীকারোক্তি—'যাহাকে ''পঞ্চবাণ'' বলে, রজনীর রূপের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। নাই কি?' (পৃ. ৪৫) শেষের কাকুবক্রোক্তিময় প্রশ্নের মধ্যেই বুঝিয়ে দেন বঙ্কিমচন্দ্র, 'দম্পতিপ্রীতির' মধ্যে 'কামবৃত্তি' অবশ্যই আছে; থাকতেই হবে। নচেৎ, রজনী, কপালকুণ্ডলা হয়ে থেকে যেত, অমরপ্রসাদের মা হওয়ার সৌভাগ্য তার হত না।

'মদনভস্ম'-এর পাশাপাশিই 'রতিবিলাপ'-এর 'পৌরাণিক উপাখ্যান'-এরও গূঢ়ার্থ নির্ধারণ করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। 'ধর্মতত্ত্ব'-এ তিনি লেখেন—'মহাদেব, মন্মথের অনুচিত স্ফূর্তি দেখিয়া তাহাকে ধ্বংস করিয়াছিলেন, কিন্তু লোকহিতার্থ আবার তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করিতে হইল।' (পৃ. ২৫) এরই পাদটীকায় বঙ্কিমচন্দ্র 'রতি'-র পৃথক তাৎপর্য সন্ধান করেন—'মন্মথ ধ্বংস হইল, অথচ রতি হইতে জীবলোক রক্ষা পাইতে পারে না, এ জন্য মন্মথের পুনর্জ্জীবন। পক্ষান্তরে আবার রতি কর্ত্তৃক পুনর্জ্জন্মলব্ধ কাম প্রতিপালিত হইলেন। এ কথাটাও যেন মনে থাকে। অনুচিত অনুশীলনেই অনুচিত স্ফূর্ত্তি।' (পৃ. ২৫) অর্থাৎ, বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা অনুসারে মন্মথ 'কামবৃত্তি' আর রতি 'অনুরাগ'। রতি 'প্রণয়প্রবাহ' আর কন্দর্প 'রূপজ মোহ'। রতি-মন্মথ সম্পর্কে বঙ্কিম-পরিকল্পনার এই দ্বৈততাকে স্মরণে রাখলে 'রাজসিংহ' উপন্যাসে 'কুমারসম্ভবম্'-এর 'রতিবিলাপ'-এর ব্যবহারের তাৎপর্য আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে—'যুদ্ধের পর জেব-উন্নিসা শুনিল, মোবারক যুদ্ধে মরিয়াছে। তখন সে বেশভূষা দূরে নিক্ষেপ করিল, উদয়সাগরের প্রস্তরকঠিন ভূমির উপর পড়িয়া কাঁদিয়া—

বসুধালিঙ্গন ধূসরস্তনী
বিললাপ বিকীর্ণমূর্দ্ধজা।' (পৃ. ১৯০)

'কন্দর্পের রাজ্য'-এ বসবাসকারী শাহজাদী আজ স্বয়ং মূর্তিমতী অনুরাগ-স্বরূপিণী 'রতি'।

লক্ষ্মী-নারায়ণ ঃ

'চৈতন্যভাগবত' উদ্ধার করে আগেই দেখিয়েছি আমরা হর-পার্বতীর মতো লক্ষ্মী-নারায়ণও আরেক দেবদম্পতি, যারা বাঙালি ঐতিহ্যে সুখী দাম্পত্যের দৈবী উপমান। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের কমলমণি-শ্রীশচন্দ্রের মধ্যে ধরা পড়ে সেই ঐতিহ্যানুগত ভাবনা। ফলে সূর্য্যমুখীর দ্বিতীয় চিঠিতেই কমলমণি লক্ষ্মীস্বরূপা হয়ে ওঠে—'কমলমণির আসন টলিল।' (পৃ. ৩৬) আর কমলমণি গোবিন্দপুর চলে গেলে আক্ষেপরত শ্রীশচন্দ্রের উক্তি—'আমি তখন লক্ষ্মীছাড়া হইয়াছিলাম।' (পৃ. ৩৯) বিষ্ণু-লক্ষ্মীর স্বর্গীয় দাম্পত্যও ঋষিশাপে খণ্ডিত। শেষপর্যন্ত অবশ্য পুনর্মিলিত হন তারা ঃ

> 'পুরাণের মতানুসারে মহর্ষি ভৃগুর ঔরসে ও তাঁর স্ত্রী দক্ষকন্যা খ্যাতির গর্ভে লক্ষ্মীর জন্ম হয়। ইনি নারায়ণের স্ত্রীরূপে অঙ্কশায়িনী হন। দুর্বাসার অভিশাপে ইন্দ্র ত্রিভুবন জয় থেকে বঞ্চিত ও শ্রীহীন হলে সর্বসৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী সমুদ্রে প্রবেশ করেন। তারপর সমুদ্র মন্থনের সময়ে ঘৃত থেকে লক্ষ্মী উত্থিত হয়ে দেবগণের কাছে যান।... বিষ্ণু মায়া বিস্তার করে আপন স্ত্রীকে গ্রহণ করেন।'[১০]

লক্ষ্মী-নারায়ণের দৈবী-দাম্পত্যের ঋষিশাপের দ্বারা খণ্ডিত হওয়া ও তাদের পুনর্মিলনের আখ্যানই কি শোনাননি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'ইন্দিরা' উপন্যাসে? ঋষিশাপের আধিদৈবিকতা সেখানে পর্যবসিত হয়েছে বাস্তবসম্মত কালাদীঘির ডাকাতিতে আর বিষ্ণু-লক্ষ্মীই নামান্তরে হয়েছেন 'উপেন্দ্র' আর 'ইন্দিরা'।

লক্ষ্মী-জনার্দনের স্বর্গীয় দাম্পত্যের আভাস ফিরে আসে প্রফুল্ল-ব্রজেশ্বর আর সূর্য্যমুখী-নগেন্দ্রের মধ্যেও। 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে প্রফুল্লকে দেখেই তার শাশুড়ি বলেন—'তা মেয়েটি লক্ষ্মী, রূপেও বটে, কথায়ও বটে।' (পৃ. ১০) সাগর-বৌও নয়ানকে প্রফুল্ল সম্বন্ধে জানায়—'কাল উনি আমাকে তাড়াইয়া আমার পালঙ্কে, বিষ্ণুর লক্ষ্মী হইয়াছিলেন।' (পৃ. ২৩) আর 'বিষবৃক্ষ'-এ সূর্য্যমুখীর দত্তবাড়ি পরিত্যাগের পর বাড়ির দুর্দশার বর্ণনা দিয়ে বঙ্কিম লেখেন—'গৃহে লক্ষ্মী নাই। লক্ষ্মী বিনা বৈকুণ্ঠও লক্ষ্মীছাড়া হয়।' (পৃ. ১১৭) সূর্য্যমুখীর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে নগেন্দ্রও ভাবে, সে ছিল 'গৃহে লক্ষ্মী' (পৃ. ১০৭) আর সূর্য্যমুখী ফেরার পর পরিচারিকা কৌশল্যাও তাঁকে সম্বোধন করে 'আমাদের ঘরের লক্ষ্মী' (পৃ. ১৩২) বলেই।

দুর্বাসার শাপে লক্ষ্মী সমুদ্র-তলশায়িনী হয়েছিলেন। পরে সমুদ্রমন্থনের মাধ্যমে পুনর্জাতা হন তিনি।

লক্ষ্মীস্বরূপিণী যে সূর্য্যমুখী, তাই তার অন্তর্ধানের পর বঙ্কিম লেখেন—'যেমন অনন্ত সাগরে অতল জলে মণিখণ্ড ডুবিলে আর দেখা যায় না, সূর্য্যমুখী তেমনি দুষ্প্রাপনীয়া হইলেন।' (পৃ. ১৯২) সমুদ্রমন্থনজাতা লক্ষ্মীকে হরণ করতে চেয়েছিল অসুরেরাও। সফল হয়নি তারা। 'সীতারাম' উপন্যাসের রমা নামতই লক্ষ্মী। 'কামবৃত্তি' সম্পন্ন আসুরিক গঙ্গারাম ভাবে—'তিনি চক্ষু বুজিয়া সমুদ্রমধ্যে ঝাঁপ দিতেছেন, সমুদ্রতলে রত্ন মিলিবে কি?'(পৃ. ৯১) দেবী লক্ষ্মীর ললাটলিপিতে পতিবিচ্ছেদের শাপ আছে, অসুর-করলগ্না হওয়ার অভিশাপ নেই। ফলে গঙ্গারামের ষড়যন্ত্র সফল হয় না, কিন্তু মৃত্যু এসে রমাকে চিরতরে স্বামীর থেকে ছিন্ন করে দিয়ে যায়।

সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগের পর কমলমণি শ্রীশচন্দ্রকে বলে—'এ বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী ত বৈকুণ্ঠ ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। তাই বোলে দাদাবাবু বৈকুণ্ঠে এসে কি বটপত্রে শোবেন?' (পৃ. ১২০) বটপত্রে বিষ্ণুর অবস্থানের কল্পনাটি বঙ্কিমচন্দ্র পেয়েছেন 'মহাভারতে'র 'বনপর্ব'-এ। মার্কণ্ডেয় ঋষি যুধিষ্ঠিরকে শোনান ঃ

> 'একদা প্রলয়কালে আমি নিরাশ্রয় হয়ে সমুদ্রজলে ভাসছিলাম এমন সময়ে দেখলাম, এক বিশাল বটবৃক্ষের শাখার তলে দিব্য-আস্তরণযুক্ত পর্যঙ্কে একটি চন্দ্রবদন পদ্মলোচন বালক শুয়ে আছে, তার বর্ণ অতসী পুষ্পের ন্যায়, বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ন।... সেই পীতবাস দ্যুতিমান বালক বটবৃক্ষের শাখায় বসে আছেন। ... সেই দেব বললেন, পুরাকালে আমি জলের নাম 'নারা' দিয়েছিলাম, প্রলয়কালে সেই জলই আমার অয়ন বা আশ্রয় সেজন্য আমি নারায়ণ।'[১১]

'বটপত্র'-এ উপবেশনের সামীপ্যেই 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের জগৎসিংহও হয়ে ওঠে বিষ্ণু—'আমি আসিতেছি, আপনাকে ক্ষণেক এই পালঙ্কের উপর বসিতে হইবে। যদি অন্য চিন্তা না থাকে, তবে ভাবিয়া দেখুন যে, ভগবানের আসন বটপত্র মাত্র।' (পৃ. ৫১) এই পুরাণ-বাচনেই আশ্চর্য সম্ভাবনাময় হয়ে ওঠে জগৎসিংহ আর আয়েষার সম্পর্ক। জগৎসিংহ বিষ্ণু; আর তাঁর বক্ষলগ্ন কৌস্তুভমণি আয়েষা—'আয়েষার সৌন্দর্য্যসার, সে সমুদ্রের কৌস্তুভরত্ন, তাহার ধীর কটাক্ষ।' (পৃ. ৬৮)

তবে এ-সবের বাইরে লক্ষ্মী-নারায়ণের দৈবী-দাম্পত্যের আভাসে বঙ্কিম যেভাবে তার পরিবার সংক্রান্ত অভিনব ধারণাকে তুলে ধরেন, তা আশ্চর্য করে দেওয়ার মতো। 'ধর্মতত্ত্ব'-এর গুরুর কথা মনে পড়বে—'হিন্দুধর্ম্মে ইহাও বলে যে, স্ত্রীরও স্বামীর ভক্তির পাত্র হওয়া উচিত, কেন না, হিন্দুধর্ম্ম বলে যে, স্ত্রীকে লক্ষ্মীরূপা মনে করিবে।' (পৃ. ৫৪) দাম্পত্যে স্ত্রীকে 'লক্ষ্মীরূপা' মনে করতে বাধা নেই। কিন্তু তাই বলে কি বদলে যাবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ স্বীকৃত লক্ষ্মী-নারায়ণের দাসী-প্রভুর সম্পর্ক? 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে সাগর আর ব্রজেশ্বরের বিচ্ছেদ-মুহূর্তে সাগর প্রতিজ্ঞা করে—'আমার পা কোলে লইয়া চাকরের মত টিপিয়া দিবে।' (পৃ. ৫৯) তারপর ত্রিস্রোতার বুকে বজরার মধ্যে অর্ধশায়িতা এক

নারীর সন্ধান পান ব্রজেশ্বর—'স্ত্রীলোকটি শুইয়া আছে—ঘুমায় নাই।' (পৃ. ৭০) উপায়ান্তর না দেখে তাঁর পদসেবাতেই রত হন ব্রজেশ্বর—'ব্রজেশ্বর কাজেই দুই হাতে পা টিপিতে আরম্ভ করিলেন।' (পৃ. ৭৩) হিন্দু দাম্পত্যের মহত্তম চিত্র সম্ভবত ক্ষীরোদসাগরে অনন্তশয্যায় অর্ধশায়িত নারায়ণের পদসেবারত লক্ষ্মীর। সেই ক্ষীরোদসাগরই বঙ্কিম-উপন্যাসে হয়েছে ত্রিস্রোতা, অনন্তনাগের স্থান নিয়েছে দেবীরাণীর বজরা, অর্ধশায়িত নারায়ণকে প্রতিস্থাপিত করেছেন অর্ধশায়িতা লক্ষ্মী, আর বিষ্ণু-ব্রজেশ্বরকে করতে হয়েছে স্ত্রী-র পদসেবা। নব্য-দাম্পত্যে স্বামী-স্ত্রীর সমানাধিকারের কথা আমরা 'প্রাচীনা এবং নবীনা'-র মতো প্রবন্ধে বলতে শুনব বঙ্কিমচন্দ্রকে। কিন্তু 'দেবী চৌধুরাণী'-র এই উল্‌টে যাওয়া 'পৌরাণিক উপাখ্যান'-টির মতো এত মারাত্মক সম্ভাবনা আর কখনো বঙ্কিম-উপন্যাসে দেখা গেছে কি?

সীতা-রাম ঃ

অনন্যব্রত দাম্পত্যের আরেক দৃষ্টান্ত, বঙ্কিম-সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা করেছেন রাম-সীতা। কালিদাসের 'রঘুবংশম্' আর ভবভূতির 'উত্তররামচরিতম্' পাঠের অভিজ্ঞতা বঙ্কিম-মানসকে আচ্ছন্ন করেছিল। সেই অভিজ্ঞতার নির্যাস ইতস্তত সহজলভ্য। প্রথম সমুদ্র-দর্শনের অভিঘাতে 'কপালকুণ্ডলা'-র নবকুমারের মুখে উচ্চারিত হয়েছিল 'রঘুবংশম্'-এর রামচন্দ্রের মুখনিঃসৃত শ্লোক ঃ

'দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তথ্বী
তমালতালীবনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে—
র্দ্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা।।' (পৃ. ১২)

আর নগেন্দ্র-সূর্য্যমুখীর দাম্পত্যের শ্রেষ্ঠ উপমান রূপে তাদের শয়নকক্ষে লম্বিত হয় 'রঘুবংশম্'-এর ওই অংশ থেকেই নির্মিত চিত্র—'আর এক চিত্রে শ্রীরাম জানকীকে লইয়া লঙ্কা হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন; উভয়ে এক রত্নমণ্ডিত বিমানে বসিয়া, শূন্যমার্গে চলিতেছেন। শ্রীরাম জানকীর স্কন্ধে এক হস্ত রাখিয়া, আর এক হস্তের অঙ্গুলির দ্বারা নিম্নে পৃথিবীর শোভা দেখাইতেছেন। বিমানচতুষ্পার্শে নানাবর্ণের মেঘ, —নীল, লোহিত, শ্বেত,—ধূমতরঙ্গোৎক্ষেপ করিয়া বেড়াইতেছে। নিম্নে আবার বিশাল নীল সমুদ্রে তরঙ্গভঙ্গ হইতেছে—সূর্য্যকরে তরঙ্গসকল হীরকরাশির মত জ্বলিতেছে। একপারে অতিদূরে ''সৌধকিরীটিনী লঙ্কা—'' তাহার প্রাসাদাবলীর স্বর্ণমণ্ডিত চূড়া সকল সূর্য্যকরে জ্বলিতেছে। অপর পারে শ্যামশোভাময়ী ''তমালতালীবনরাজিনীলা'' সমুদ্রবেলা। মধ্যে শূন্যে হংসশ্রেণী সকল উড়িয়া যাইতেছে।' (পৃ. ১২১) শ্রীরাম-জানকীর অন্যোন্যনির্ভর দাম্পত্য প্রকারান্তরে অনন্যব্রত সূর্য্যমুখী-নগেন্দ্রর 'দম্পতিপ্রীতি'-কেই

চিহ্নিত করছে। মৃণালিনী-হেমচন্দ্রও স্বরূপে রামচন্দ্র-সীতাদেবী। গিরিজায়ার গানে আভাসিত হয় তাদের সেই অন্তর্স্বরূপ—'যো দিন জানকী, রঘুবীর নিরখি—'(পৃ. ২১)। ব্রজেশ্বর সম্পর্কে নিশির বাচনেও ফিরে এসেছে রাম-কথার ইঙ্গিত—'শ্বশুরের ছেলে সমস্ত রাত্রি বাহিরে বসিয়া আছে, মনে নাই? বাছাধন সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কায় আসিতে পারিতেছে না, দেখিতেছ না?' (পৃ. ১২৪) প্রথম সংস্করণে আরো প্রত্যক্ষ ছিল রামকথা; 'লঙ্কায়'-এর বদলে ছিল 'সীতা দেবীর উদ্দেশে' (পৃ. ১৪০)। তবে বঙ্কিম-উপন্যাসের সব পুরুষই রামচন্দ্র নয়; প্রত্যক্ষ উল্লিখন সত্ত্বেও। তাই রমা সম্পর্কে যখন সীতারাম বলে—'প্রথামত কাজ করিতে হইলে এত কাণ্ড না করিয়া, সীতার ন্যায় রমাকে আমার ত্যাগ করাই শ্রেয়।' (পৃ. ১০৩) তখন মুহূর্তের মধ্যে প্রতিবাদ জানায় নন্দা—'রামচন্দ্র করিয়াছেন বলিয়া কি তুমিও করিবে? যিনি পূর্ণ ব্রহ্ম, তাঁর আর ত্যাগই কি, গ্রহণই বা কি? তোমার কি তা সাজে মহারাজ?' (পৃ. ১০৪) সীতারাম যে রামচন্দ্রের গুণাবলীতে ভূষিত নয়, অনুশীলিত চারিত্রিকতায় রামচন্দ্রের অণুমাত্র নয়, তা কি আর বুঝতে বাকি আছে নন্দার?

প্রত্যক্ষ নয়, তবে সীতার জীবন-কাহিনির পরোক্ষ ছায়াপাতেও মহনীয় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নায়িকারা। সীতার মতো করেই অগ্নিপরীক্ষা দিতে চেয়েছেন তিলোত্তমা—'আগে আগুনে পরীক্ষা হইত; কলিতে তাহা হয় না; না হউক, আমি না হয় তাঁহার সম্মুখে আগুনে প্রাণত্যাগই করিব।' (পৃ. ১০৯) এই অগ্নিপরীক্ষাই আশ্চর্য তির্যকতায় ফিরে এসেছে 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে। বৈদ্য রামকৃষ্ণ রায়ের থেকে নগেন্দ্র খবর পান গৃহদাহের—'হরবৈষ্ণবীর গৃহদাহে ঐ স্ত্রীলোকটি পুড়িয়া মরিল!' (পৃ. ১০৫) সীতা-সূর্য্যমুখী অগ্নিস্নাতা, অগ্নিশুদ্ধা হয়েই এরপর স্বামী-সমাগমে পুনর্গমন করবেন।

অগ্নিপরীক্ষা যেমন, তেমনই স্বর্ণসীতার প্রসঙ্গও একাধিকবার ফিরে এসেছে বঙ্কিম-উপন্যাসে। দাম্পত্যে নারীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্যই এই অনুষঙ্গের ব্যবহার। 'দেবী চৌধুরাণী'-তে তাই প্রফুল্ল পরিত্যাগের প্রসঙ্গে আসে স্বর্ণসীতার স্মৃতি—'সেই সোনার প্রতিমাকে তাহার অধিকারে বঞ্চিত করিয়া, অপমান করিয়া, মিথ্যা অপবাদ দিয়া, চিরকাল জন্য বহিষ্কৃত করিয়া দিতে হইয়াছে।' (পৃ. ৪৭) এই স্বর্ণসীতাই ফিরে আসে প্রফুল্ল-ব্রজেশ্বরের তৃতীয় সাক্ষাতে, আরো প্রত্যক্ষভাবে—'মনের মন্দিরের ভিতর সোনার প্রতিমা গড়িয়া রাখিয়াছিলাম—' (পৃ. ১০০)। আর যে জমিদার পুঙ্গবের জমিদারির বার্ষিক আয় তিন লক্ষ টাকা, তার ক্ষেত্রে? তার বেলায় স্ত্রীর স্বর্ণ-প্রতিমা ঠাঁই পায় উদ্যান-মধ্যস্থ মন্দিরে। বাবু গোবিন্দলাল রায়ের প্রমোদ-উদ্যানে গড়া ভ্রমর দাসীর সুবর্ণময়ী মূর্তি আসলে কি স্বর্ণসীতারই অনুষঙ্গবাহী নয়?

বঙ্কিমচন্দ্রের রাম-কথা সংক্রান্ত ধারণার সবচেয়ে স্বচ্ছ অভিব্যক্তি পাওয়া সম্ভব 'উত্তরচরিত' নামের

সমালোচনা-প্রবন্ধটি থেকে। লক্ষণীয়, এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পূর্ণ ঝোঁক সীতা-বিসর্জনের 'মর্ম্মভেদী ঘটনাটির উপর—'সীতার নির্ব্বাসন সামান্য স্ত্রীবিয়োগ নহে। স্ত্রীবিসর্জ্জন মাত্রই ক্লেশকর-মর্ম্মভেদী। ... আর যে ভালোবাসে, পত্নী বিসর্জ্জন তাহার পক্ষে কি ভয়ানক দুর্ঘটনা! আবার যে রামের ন্যায় ভালবাসে? ... তাহার কি কষ্ট, কি সর্ব্বনাশ, কি জীবনসর্ব্বস্বধ্বংসাধিক যন্ত্রণা!.. রামচন্দ্রও অনেক নিন্দনীয় কর্ম্ম করিয়াছেন। ... কিন্তু তিনি যে সকল অপরাধে অপরাধী, তন্মধ্যে এই সীতা-বিসর্জ্জনাপরাধ সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর।' (পৃ. ৪-৮) ফলে বঙ্কিম-উপন্যাসে সবসময়ই স্ত্রী-পরিত্যাগ হয়ে ওঠে 'সীতা-বিসর্জ্জন'। তিলোত্তমা-মৃন্ময়ী-মৃণালিনী-সূর্য্যমুখী-কুন্দনন্দিনী-ভ্রমর-প্রফুল্ল-ইন্দিরা, পতি-পরিত্যক্তা সীতা-স্বরূপিণী নারীর ভিড় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-জগতে। খুব সঙ্গতভাবেই লক্ষ করেছেন শ্রীবীতশোক ভট্টাচার্য, 'কপালকুণ্ডলা : কথার কাব্যতত্ত্ব' প্রবন্ধে ঃ

> 'পরিত্যক্ত পত্নীদের আখ্যান রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র অক্লিষ্ট, দুর্গেশনন্দিনী থেকে সীতারাম পর্যন্ত তাঁর কথাসমগ্র পত্নীপরিত্যাগের পুনরাবৃত্তিতে পরিপূর্ণ, তাঁর রচনাবলিতে এভাবে নির্বাসিতা সীতার আদ্যকল্পচিত্রের বিন্যাস।'[১২]

'দেবী চৌধুরাণী'তে ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে বলে—'অকারণে তোমায় ত্যাগ করিয়া, আমি কি অধর্ম্মে পতিত হইব?' (পৃ. ২২) সীতার মতোই লোকাপবাদে মৃণালিনীকে ত্যাগ করেন হেমচন্দ্র। মৃণালিনীর মুখে শুনি—'যদি তাঁহার নিজ মুখে শুনি যে, তিনি মৃণালিনীকে কুলটা ভাবিয়া ত্যাগ করিলেন...।' (পৃ. ৭৮) ইন্দিরা-উপেন্দ্রের দাম্পত্যেও হানা দেয় 'সীতা-বিসর্জ্জনে'র ছায়া—'সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ''যদি এখন তাঁহার দেখা পান, তবে কি করিবেন?" তিনি অম্লানবদনে বলিলেন, ''তাকে ত্যাগ করিব।" কি নির্দ্দয়!' (পৃ. ৪৭)

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের পতি-পরিত্যক্তা নারীরা যে স্বরূপত সীতা, তার আরেক রকমের অ-প্রত্যক্ষ প্রমাণ দাখিল করা যাক। রবীন্দ্র-রচনায় অপমানিতা নারীর মাতৃক্রোড়ে আশ্রয়-লাভের বাসনাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অধ্যাপক দেবদাস জোয়ারদার তাঁর 'রবীন্দ্রদৃষ্টিতে রামসীতা' প্রবন্ধে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সীতার পাতালপ্রবেশের তাৎপর্যের দিকে ঃ

> 'পৃথিবী বিদীর্ণ হয়ে তাঁকে আশ্রয় দেন। ভূতল থেকে উঠে আসে এক দিব্য সিংহাসন, আর তাতে ব'সে সীতা রসাতলে প্রবেশ করেন। এভাবে পৃথিবীকন্যা পৃথিবীর কোলে ঠাঁই পেলেন। ... সীতার বিদায়ও স্বেচ্ছাকৃত। বলতে পারি, পুরুষ শাসিত পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এ তাঁর আহতচিত্তের নীরব প্রতিবাদ।...বেদনাতপ্ত জীবনের শেষমুহূর্তে মাকে দেখতে চাওয়ার আর মাতৃগর্ভের স্নিগ্ধ অন্ধকারে আশ্রয় পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা সীতারও। তাই তাঁর পাতালে প্রবেশ।'[১৩]

স্বামী-কর্তৃক অপমানিতা 'বেদনাতপ্ত' নারীর শেষ আশ্রয় তাঁর মাতৃক্রোড় বা মাতৃগর্ভ—সীতার জীবন নাট্যের এই করুণ সমাপ্তি বারংবার ফিরে এসেছে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নায়িকাদের মধ্যে; স্বরূপত তাদের করে তুলেছে সীতা। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে নগেন্দ্র যখন স্বীকার করে সে কুন্দকে ভালবাসে, সূর্য্যমুখীকে ত্যাগ করতে চায়, তখন সূর্য্যমুখী—'কয়েক মুহূর্ত প্রস্তরময়ী মূর্তিবৎ পৃথিবীপানে চাহিয়া রহিলেন।' (পৃ. ৬৬) এহো বাহ্য। মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য' থেকে 'চতুর্থ সর্গ'-এর অংশবিশেষ 'সীতা ও সরমা' নামে সংকলন করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮৯৫-এর প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করা 'Bengali Selection' বইটিতে।[১৪] নির্বাচিত অংশেই সরমার প্রশ্নের উত্তরে সীতা স্মরণ করেন তাঁর পূর্বকথা ঃ

'অচেতন হৈনু পুনঃ। শুন লো ললনে,
মনঃ দিয়া শুন, সই, অপূর্ব কাহিনী।—
দেখিনু স্বপনে আমি বসুন্ধরা সতী
মা আমার! দাসী-পাশে আসি দয়াময়ী
কহিলা, লইয়া কোলে, সুমধুর বাণী,—
...ভবিতব্য-দ্বার আমি খুলি; দেখ চেয়ে।'[১৫]

এই স্বপ্নদৃশ্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই বঙ্কিমচন্দ্র রচনা করেন কুন্দনন্দিনীর প্রথম স্বপ্নদৃশ্য, যেখানে স্বপ্নে কুন্দর মাতৃদর্শন ঘটে—'... তখন কুন্দ সভয়ে সানন্দে চিনিল যে, সেই করুণাময়ী তাহার বহুকাল-মৃতা প্রসূতির অবয়ব ধারণ করিয়াছে। আলোকময়ী সস্নেহাননে কুন্দকে ভূতল হইতে উত্থিতা করিয়া ক্রোড়ে লইলেন।' (পৃ. ৮) চার বছর পর যখন স্বামী-পরিত্যক্তা অবহেলিতা কুন্দনন্দিনী আবারও স্বপ্নে মাতৃ-দর্শন করল, তখন তার আকাঙ্ক্ষা 'তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি'-র সঙ্গে সমান্তরাল—'তখন কুন্দ কাঁদিয়া কহিল ''মা, তুমি আমাকে সঙ্গে লইয়া চল। আমি আর এখানে থাকিতে চাহি না।'' ' (পৃ. ১২৯)

সীতাকে আত্মস্থ করেই প্রফুল্লর বেড়ে ওঠা। তাই প্রফুল্লর মৃত্যু সম্পর্কে প্রতিবেশীদের সেই আশ্চর্য রটনা—'কাল তার মা এসে তাকে নিয়ে গেছে।... ফুলমণি প্রফুল্লের বিছানায় রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময়ে তার মাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিল।' (পৃ. ৩৫) স্বামী-পরিত্যক্তা অবহেলিতা অপমানিতা নারীর শেষ আশ্রয় সবসময়ই বঙ্কিম-কল্পনায় মাতৃক্রোড়। তাই গোবিন্দলালের পৌঁছ-সংবাদ আসার পর যার স্বামীর প্রতি আর 'ভক্তিও নাই, বিশ্বাসও নাই', যার স্বামীর দর্শনে 'আর সুখ নাই', সেই অপমানিতা ভ্রমর দাসী শেষ আশ্রয় খোঁজে মায়ের কাছেই—'ভ্রমর শুনিলেন, স্বামী আসিতেছেন। ভ্রমর তখনই আবার পত্র লিখিতে বসিলেন।... এ পত্রে মাতাকে লিখিলেন যে 'আমার বড় পীড়া হইয়াছে। তোমরা যদি একবার আমাকে লইয়া যাও, তবে আরাম হইয়া আসিতে পারি...।' (পৃ. ৪৬)

আগেই বলেছি আমরা, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে যেখানে 'গুরু' হওয়ার অধিকার মুখ্যত পুরুষের, সেখানে দাম্পত্য-সম্পর্কে নারী-কেই 'গুরু' হওয়ার অধিকার দেন বঙ্কিমচন্দ্র। আর তারই ফলে কখনো কখনো হিন্দু সংস্কৃতির মান্য দেবদম্পতিদের আচরণে আশ্চর্য 'উলটপুরাণ' দেখা দেয়। লক্ষ্মী-নারায়ণের সূত্রে তেমন একটি প্রমাণ দাখিল করেছি আমরা। এবার পালা রাম-সীতার। উত্তরকাণ্ডে সীতার সেই বিখ্যাত আর্তি আমাদের সকলেরই মনে আছে ঃ

> 'যদি আমি কায়মনোবাক্যে রামকে অর্চনা করিয়া থাকি তবে সেই পুণ্যের বলে দেবী পৃথিবী বিদীর্ণ হউন, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি।'[১৬]

আশ্চর্য এই বাচনটিই বঙ্কিম ব্যবহার করেন, 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে। না, সূর্য্যমুখী বা কুন্দনন্দিনীর জন্য নয়, নগেন্দ্রের জন্য!—'কেন পৃথিবী বিদীর্ণা হইয়া নগেন্দ্রকে শিবিকাসমেত গ্রাস করিল না?' (পৃ. ১০৬) প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে দিয়ে পুরুষ যে নারীর তুল্য 'অনন্যব্রত' হয়ে উঠছে, রামায়ণোক্ত বাচনের লিঙ্গ-বিপর্যাস কি তারই ইঙ্গিত নয়?

দুর্গা ঃ

বঙ্কিমচন্দ্রের রাষ্ট্র-ভাবনার অণু-একক যে পরিবার তাকে বঙ্কিম লক্ষ্মী-নারায়ণের বিচরণক্ষেত্র ভেবেছেন। 'স্ত্রীকে লক্ষ্মীরূপা মনে করিবে' (পৃ. ৫৪)—'ধর্মতত্ত্ব'-এ এমন আদেশও দিয়েছেন গুরু। 'স্ত্রী'দের মুখ্যত দাম্পত্য-পরিবারের ঘেরাটোপে রেখে দেখতেই পছন্দ করেছেন তিনি। তাঁর পরিবার-কল্পনার কেন্দ্রীয় প্রতিমাই 'লক্ষ্মীরূপা' নারী, বিশেষত 'স্ত্রী'। ফলত, নারীজাতির রাষ্ট্র-গঠনে অন্যতর ক্রিয়াশীলতা, অর্থাৎ রাষ্ট্রনীতি-রাজনীতি বা যুদ্ধনীতির চর্চার কথা বঙ্কিমচন্দ্র ভাবেননি। 'ধর্মতত্ত্ব'-এ গুরু আপত্তি করে বলবেনও—'স্ত্রীলোকের পল্‌টন লইয়া লড়াই চলে কি?' (পৃ. ১২১) আর 'আনন্দমঠ'-এর প্রথম সংস্করণে একথা মেনে নিয়েই শান্তি ভাববে—'ছি! কি করিতেছি? স্ত্রীলোক হইয়া যুদ্ধে যাই কেন? আমার ধর্ম্ম ত এ নয়!' (পৃ. ১৩৯) খুবই আশ্চর্যজনকভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের এই ধারণার পরিবর্তন ঘটতে থাকে ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ থেকে, 'প্রচার' পত্রিকায় 'কৃষ্ণচরিত্র' ও 'সীতারাম' রচনার সমকালে। কী সেই পরিবর্তন?

'ধর্মতত্ত্ব'-এর শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করবে, যদি যুদ্ধ করার প্রয়োজন না থাকে, তবে কি 'স্ত্রীলোক' 'শারীরিকী বৃত্তি'র অনুশীলন করবে না? উত্তরে গুরু বলেন—'যাহার যে শক্তি আছে, সে তাহার অনুশীলন করিবে। স্ত্রীলোকের যুদ্ধ করিবার শক্তি থাকে, তাহা অনুশীলিত করুক।' (পৃ. ১২২) মোদ্দা কথা, সকল স্ত্রীজাতির জন্য না-হোক, অন্ততপক্ষে যার 'শক্তি' আছে, তার জন্য 'শারীরিকী বৃত্তি'-র অনুশীলন, প্রকারান্তরে যুদ্ধ-করবার অধিকারটুকুও মেনে নিলেন বঙ্কিম। এর পর থেকেই 'সীতারাম', 'দেবী চৌধুরাণী',

‘রাজসিংহ’ আর সংস্কৃত ‘আনন্দমঠ’-এ আমরা খুঁজে পাব এমন কয়েকজন নারীকে যাদের ‘শারীরিকী বৃত্তি’-ও অনুশীলিত; ফলে গৃহের চার দেওয়ালে আবদ্ধ ‘লক্ষ্মীরূপা’ নয় তারা, বরং অনেক বেশি করে তারা আত্মসাৎ করে নিয়েছে ‘অসুর-ঘাতিনি’, ‘সমর রঙ্গিনি’ দুর্গার স্বরূপ।

‘আনন্দমঠ’-এ সত্যানন্দ প্রশ্ন করে—‘রণ-ক্ষেত্রে কোন্ বীর জায়া লইয়া আইসে?’ (পৃ. ৬৫) উত্তরে শান্তির অকুণ্ঠ ভাষণ পুরাণ-নিষ্ণাত—‘অর্জুন যখন যাদবী সেনার সহিত অন্তরীক্ষ হইতে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কে তাঁহার রথ চালাইয়াছিল?’ (পৃ. ৬৫) রাষ্ট্রগঠনে, যুদ্ধক্ষেত্রে পুরুষের সহায়ক শক্তি হয়ে উঠছে শক্তিরূপিনী স্ত্রী—বঙ্কিমচন্দ্রের এই অভিনব পরিকল্পনার রূপায়ণ আমরা দেখবো ‘সীতারাম’ উপন্যাসে। শ্রী গঙ্গারামের দণ্ডপ্রাপ্তির মুহূর্তে সাক্ষাৎ দুর্গাপ্রতিমা—‘মূর্ত্তিমতী বনদেবী’ (পৃ. ৩৭) যাঁকে—‘প্রতিমার ঠাঁটের মত, চারিদিকে বৃক্ষশাখা, বৃক্ষপত্র ঘেরিয়া রহিয়াছে;’ (পৃ. ৩৭)। একটু পরেই—‘গঙ্গারাম দেখিলেন, মহামহীরুহের শ্যামলপল্লবরাশি-মণ্ডিতা চণ্ডীমূর্তি’ (পৃ. ৪২) আর কিছু পরেই ‘চণ্ডী’ রূপান্তরিতা হলেন মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গায়—‘যেন সিংহবাহিনী সিংহপৃষ্ঠে দাঁড়াইয়া রণরঙ্গে নাচিতেছে। যেন মা অসুর-বধে মত্ত হইয়া ডাকিতেছেন, ‘‘মার্! মার্! শত্রু মার্!’’ ’ (পৃ. ৪২) উপস্থিত হিন্দুরা ‘জয় মা চণ্ডিকে!’ (পৃ. ৪৩) বলে শ্রী-র প্রণোদনায় যুদ্ধে চালিত হল এবং—‘এই চণ্ডীর উৎসাহে হিন্দুর রণজয় হইল।’ (পৃ. ৪৩) রাষ্ট্র-নির্মাতা সীতারামের মনেও দৃঢ়বদ্ধ হয়ে রইল এই মূর্তিই—‘কিন্তু সেই সিংহবাহিনী মূর্ত্তি! আ মরি মরি —এমন কি আর হয়!’ (পৃ. ৪৮) রাষ্ট্র-প্রধানের মনে যে অনুশীলিতা ‘স্ত্রী’-র মূর্তি ছিল, তা তো শুধু গৃহলক্ষ্মীর নয়; তা তো সমরে রণরঙ্গিনী চণ্ডীরও! তাই সীতারামের মনে হল—‘যে বৃক্ষারূঢ়া মহিষমর্দিনী অঞ্চলসঙ্কেতে সৈন্যসঞ্চালন করিয়া রণজয় করিয়াছিল, যদি সেই শ্রী সহায় হয়, তবে সীতারাম কি না করিতে পারেন?’ (পৃ. ৪৯) সীতারাম ‘রাজ্যস্থাপন’কামী, ফলে তাঁর চাই ‘মহিষী’। নন্দা-রমা, সে শূন্যস্থান পূরণ করতে পারে না। সীতারামের মনে হয়—‘বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী ভাল, কিন্তু সমরে সিংহবাহিনী কই?’ (পৃ. ৫৪) ‘গৃহলক্ষ্মী’-র মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ না করেও, বঙ্কিমচন্দ্র নারীর জন্য পুরাণের বাচনে ভিন্ন এক পরিসর তৈরি করছেন, তা লক্ষ করার মতো।

সীতারাম যে ‘সমরে সিংহবাহিনী’কে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন, তাকেই বঙ্কিম পাবেন ‘রাজসিংহ’-এর চঞ্চলকুমারীর মধ্যে। তবে তার আগে বঙ্কিম অন্য আরেকজনের কথাও বলেছেন, ‘বঙ্গদর্শন’-এর পাতায়। বৈশাখ, ১২৮৫-র সংখ্যায় মুদ্রিত হয় বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতা ‘আকবর শাহের খোষ রোজ’। ‘চিতোরসম্ভবা কমলকলি’ এসেছে আগ্রা দুর্গের মীনাবাজারে। সেখানেই তার রাস্তা রুদ্ধ করে অলজ্জ কামবাসনা প্রকাশ করে আকবর—‘চল চল ধনি/আমার মন্দিরে/আজি খোষ রোজ সুখের দিন।’ (পৃ. ৪৭) এই বলে চিতোরের রাণীর উপর বলপ্রয়োগ করে আকবর। কাতরা সতী ‘ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি মে দুর্গে’ (পৃ. ৪৮) বলে প্রার্থনা

করলে 'অনন্ত শূন্যেতে' দেখা দেন 'সমররঙ্গিনি' 'অসুর ঘাতিনি' দুর্গা। দুর্গা-প্রদত্ত সাহসে বিজয়িনী হয় হিন্দু-সতী; কামুক বাদশা ক্ষমা চেয়ে 'ভগিনী' (পৃ. ৫০) সম্বোধন করে চিতোর-কুল-ললনাকে সম্মান জানান। এই কবিতাটিতে লক্ষণীয় বিষয় দু'টি। এক, অনুশীলিতা নারীকে অস্ত্রধারণে অন্তঃপ্রেরণা যুগিয়েছেন দেবী দুর্গা। বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী নায়িকারা স্বরূপতই দুর্গা হয়ে উঠবেন। আর দুই, দুর্গা 'কামবৃত্তি'-রও বিরুদ্ধাচারী। এই দু'টি কথাকে স্মরণে রেখে ফিরে যাই 'রাজসিংহ'-এ।

চঞ্চলকুমারী প্রথম দর্শনেই 'দেবীপ্রতিমা' (পৃ. ৩১)। কোন্ দেবী? চঞ্চলকুমারী দুর্গা। মহিষাসুরমর্দিনী। স্মরণ করুন 'চিত্রদলন'-এর ঘটনাটি—'চঞ্চলকুমারী ধীরে ধীরে অলঙ্কারশোভিত বামচরণখানি ঔরঙ্গজেবের চিত্রের উপরে সংস্থাপিত করিলেন—চিত্রের শোভা বুঝি বাড়িয়া গেল। চঞ্চলকুমারী একটু হেলিলেন—মড়মড় শব্দ হইল—ঔরঙ্গজেব বাদশাহের প্রতিমূর্ত্তি রাজপুতকুমারীর চরণতলে ভাঙ্গিয়া গেল।'[১৭] (পৃ. ৩৩) রাজসিংহের রাজ্যলক্ষ্মী চঞ্চলকুমারী শুধুমাত্র রাষ্ট্রের শত্রু 'অসুর' ঔরঙ্গজেবের চিত্রকেই মর্দন করলেন না, সেইসঙ্গে 'কামবৃত্তি'কেও নির্জিত করলেন, তা স্মরণে রাখতে হবে।

উপন্যাসে এরপর সরাসরি সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন চঞ্চলকুমারী। রাজপুতদের চোখে, তিনি তাদের আরাধ্যা দেবী দুর্গা—'রাজপুতেরা মনে করিল, চিতোরাধিষ্ঠাত্রী রাজপুতকুলরক্ষিনী ভগবতী এ সঙ্কটে রাজপুতকে রক্ষা করিতে স্বয়ং রণে অবতীর্ণ হইয়াছেন।' (পৃ. ৯৬) অনুশীলিতা নারী, যারা রাষ্ট্র-নির্মাণে পুরুষের সহায়ক এমনকি বিকল্প হয়ে-ওঠার ক্ষমতা রাখেন, তাদেরকে বারবার বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গা-ভগবতী-চণ্ডী প্রভৃতি শক্তিস্বরূপিণী কল্পনা করেছেন তা আমরা আগেই লক্ষ করেছি। তাই, দরবার সাজিয়ে 'পরিত্রাণায় সাধুনাং' করতে-বসা দেবী চৌধুরাণী সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য—'দেবী আজ শরৎকালে প্রকৃত দেবীপ্রতিমা মত সাজিয়াছে।' (পৃ. ৮৯) আর ব্রজেশ্বরকে রঙ্গরাজ বলে—'আমাদের মা ভগবতীর তুল্য।' (পৃ. ৫৯)

সন্তানের চোখে 'মা ভগবতীর তুল্য'। আর যদি 'দেশ'ই 'মা' হয়ে ওঠে? তখন সেই 'দেশ-মা'ও কি 'ভগবতীর তুল্য'-ই নয়? উত্তর মিলবে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'-এ। ১২৮১-র কার্তিক সংখ্যা 'বঙ্গদর্শন'-এ কমলাকান্ত চক্রবর্তী লিখেছিলেন 'আমার দুর্গোৎসব'। তাতেই প্রথম আমরা দেখি বঙ্কিম-কল্পনায় 'কমলাকান্ত-প্রসূতি বঙ্গভূমি' হয়ে দাঁড়িয়েছে 'দশপ্রহরণধারিণী' 'নগাঙ্কশোভিনি নগেন্দ্রবালিকে!' (পৃ. ৪১) 'আনন্দমঠ'-এ ফিরে এসেছে এই দুর্গাপ্রতিমা, কিন্তু তার সঙ্গে এসেছে আরো তিনটি প্রতিমা। বঙ্কিমচন্দ্রের রাষ্ট্র-পরিবার-সংক্রান্ত ধারণার ক্ষেত্রে তাদের গুরুত্ব অপরিসীম। রাষ্ট্রকে মাতৃমূর্তিতে কল্পনা করেন বঙ্কিমচন্দ্র। তার চারটি রূপভেদ। 'মা—যা ছিলেন', 'মা যা হইয়াছেন' আর 'মা যা হইবেন' দেশের

ত্রিকালিক অবস্থা; অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ ভেদে দেশের ত্রিমূর্তি। আর এর বাইরে রয়েছে আরো এক মূর্তি যা 'আনন্দমঠ'-এর সন্তানকুলের 'অর্চা' মূর্তি। প্রথমে ত্রিকালিক স্বদেশ-প্রতিমার ব্যাখ্যা ঃ

বঙ্কিম-বাচন	ব্যাখ্যা
(ক) **'মা যা ছিলেন'** 'এক অপরূপ সর্ব্বাঙ্গসম্পন্না সর্ব্বাভরণভূষিতা জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি।' (পৃ.২৬)	'মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্ন মনে করেন যে জগদ্ধাত্রী পূজা শূলপাণিরও পূর্ববর্তী—কেনোপনিষদের উমা-হৈমবতীই জগদ্ধাত্রী।'[১৮] বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গোৎসব' (বঙ্গদর্শন, ভাদ্র, ১২৮৫) কবিতাটিও স্মরণীয়—'এসো এসো জগন্মাতা, জগদ্ধাত্রী উমে!' (পৃ. ৬৩) অর্থাৎ, বঙ্কিম-কল্পনায় দেশমাতৃকার অতীত রূপ জগদ্ধাত্রী-উমার। স্মরণীয় 'কুমারসম্ভবম্' মতে উমা কুমারী।
(খ) **'মা যা হইয়াছেন'** 'কালী—অন্ধকারসমাচ্ছন্না কালিমাময়ী। হৃতসর্বস্বা, এইজন্য নগ্নিকা।... মা কঙ্কালমালিনী। আপনার শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন।' (পৃ. ২৬)	ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে 'আনন্দমঠ' উপন্যাসটি রচিত। তাই দেশের 'বর্তমান' রূপ 'হৃতসর্বস্বা' 'নগ্নিকা'। এহো বাহ্য। লক্ষণীয়, মাতৃমূর্তি আর কুমারী নয়; মনে পড়বে আমাদের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে কালীমূর্তি দেখিয়ে কপালকুণ্ডলাকে বলা অধিকারীর কথাগুলি—'জগন্মাতাও শিবের বিবাহিতা।' (পৃ. ৩০)
(গ) **'মা যা হইবেন'** 'দিগ্‌ভুজা-নানাপ্রহরণধারিণী শত্রুবিমর্দ্দিনী—বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী---দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিনী—বামে বাণী বিদ্যা- বিজ্ঞান-দায়িনী---সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ'। (পৃ. ২৭)	দেশমাতৃকার ভবিষ্যৎ রূপ। স-সন্তান মা দুর্গা। লক্ষ করে দেখুন 'বন্দেমাতরম্' গানে দেশমাতৃকা একাই দুর্গা-লক্ষ্মী- সরস্বতী এই তিনটি রূপকে নিজের মধ্যে সংহরণ করে নিয়েছেন—'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী/ কমলা কমল-দলবিহারিণী/বাণী বিদ্যাদায়িনী'। (পৃ. ২২)

অর্থাৎ, লক্ষ করলে দেখা যাবে, বঙ্কিম দেশমাতৃকার যে ত্রিকালিক মূর্তি কল্পনা করছেন, অতীত থেকে ভবিষ্যতের দিকে দেশ যেখানে পরিপূর্ণতার দিকে এগোচ্ছে, আসলে সেই মূর্তির পরিবর্তনের সমান্তরালে এক নারীর পরিপূর্ণতাও সাধিত হচ্ছে; মুখ্যত দাম্পত্যের চৌহদ্দির মধ্যে। অর্থাৎ, আমরা বলতে চাইছি—রাষ্ট্রের ত্রিধাবিন্যস্ত রূপের পরিবর্তন আসলে তার অণু-একক পরিবারেরও রূপান্তরের ইশারা নিয়ে আসছে 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে।

এই তিনটি মূর্তির বাইরে আরেকটি মূর্তি আছে, যাকে আমরা আনন্দমঠের সন্তানদের 'অর্চা' মূর্তি বলতে পারি—'এক প্রকাণ্ড চতুর্ভুজ মূর্ত্তি, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, কৌস্তুভশোভিতহৃদয়, সম্মুখে সুদর্শনচক্র

ঘূর্ণ্যমানপ্রায় স্থাপিত। মধুকৈটভস্বরূপ দুইটি প্রকাণ্ড ছিন্নমস্ত মূর্তি রুধিরপ্লাবিতবৎ চিত্রিত হইয়া সম্মুখে রহিয়াছে। বামে লক্ষ্মী আলুলায়িতকুন্তলা শতদলমালামণ্ডিতা ভয়ত্রস্তার ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন। দক্ষিণে সরস্বতী, পুস্তক, বাদ্যযন্ত্র, মূর্ত্তিমান্ রাগরাগিনী প্রভৃতি পরিবেষ্টিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। বিষ্ণুর অঙ্কোপরি এক মোহিনী মূর্ত্তি—লক্ষ্মী সরস্বতীর অধিক সুন্দরী, লক্ষ্মী সরস্বতীর অধিক ঐশ্বর্য্যান্বিতা।' (পৃ. ২৫-২৬) এই অ-পূর্ব মূর্তি সম্পর্কে কোনো আলোচনায় প্রবিষ্ট হওয়ার আগে রমাকান্ত চক্রবর্তীর 'বঙ্কিমচন্দ্র ও বৈষ্ণবধর্ম' নামক প্রবন্ধের ব্যাখ্যায় চোখ বুলিয়ে নেওয়া প্রয়োজনঃ

> 'এই মূর্তিতত্ত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য বৈষ্ণব-শাক্ত সমন্বয়।...এই মূর্তিতত্ত্বে পুরুষের প্রাধান্য ঘোষিত হয়েছে ; ... যে বঙ্কিমচন্দ্র পৌরাণিক দেবতাদের লাম্পট্যের নিন্দা করেছেন, তিনি যে কোন্ বুদ্ধিতে লক্ষ্মী-সরস্বতীর উপস্থিতিতেই দৈত্যনিসূদন ভীষণ বিষ্ণুর অঙ্কে এক ''মা''-কে বসিয়ে রাখলেন, তা বোঝা যায় না।... কিন্তু 'মহাবিষ্ণু'র কোলে 'মোহিনী' যে কীভাবে বন্দনীয়া দেশমাতা হয়ে উঠলেন, তা এই উপন্যাসে স্পষ্ট নয়।'[১৯]

'মহাবিষ্ণু'-র কোলে 'মোহিনী'কে নিয়ে বেশ সমস্যায় পড়েছেন শ্রীচক্রবর্তীর মতো অনেকেই। এই মূর্তির তাৎপর্য অনুসন্ধানে 'গৌরদাস বাবাজির ভিক্ষার ঝুলি' (প্রচার ১২৯১, পৌষ) ঘেঁটে দেখা যাক—'বিষ্ণুর হাতে যে পদ্ম, তাহা সৃষ্টিক্রিয়ার প্রতিমা।... গদা লয়ক্রিয়ার প্রতিমা। শঙ্খ ও চক্র স্থিতিক্রিয়ার প্রতিমা। জগতের স্থিতি স্থানে ও কালে। স্থান, আকাশ। ... শব্দময় শঙ্খ আকাশের প্রতিমাস্বরূপ বিষ্ণুহস্তে স্থাপিত হইয়াছে। ... কাল ঈশ্বরহস্তে চক্রাকারে আছে। আকাশ, কাল, শক্তি ও সৃষ্টি, জগদীশ্বর চারিভুজে এই চারটি ধারণ করিতেছেন।' (পৃ. ১৭৯) অর্থাৎ, বিষ্ণুমূর্তি স্বয়ং জগদীশ্বর; তাই 'মোহিনী' দেশমাতৃকা তার ক্রোড়ে স্থিতা। বিষ্ণুমূর্তির এই তাৎপর্যকে স্মরণে রাখলেই বোঝা যায়, কেন প্রথম সংস্করণের—'বিষ্ণুর মাথার উপরে উচ্চ মঞ্চে বহুল রত্নমণ্ডিত আসনোপবিষ্টা' (পৃ. ১২৬) দেশমাতা পরবর্তী সংস্করণে নেমে আসেন 'জগদীশ্বর' 'বিষ্ণুর অঙ্কোপরি'।

ঠিক একই সঙ্গে লক্ষ করা যাক রমাকান্ত চক্রবর্তীর আরেকটি মন্তব্য—'এই মূর্তিতত্ত্বে পুরুষের প্রাধান্য ঘোষিত হয়েছে।' খুবই সঠিক লক্ষ করেছেন শ্রীচক্রবর্তী। 'দেশমাতৃকা'কে আগলে রেখেছেন 'জগৎপিতা'। কেন? স্মরণ করুন 'ধর্মতত্ত্ব'-এ পুরুষের কর্তব্য—'স্ত্রীর প্রতিপালন ও রক্ষণের ভার তোমার উপর। স্ত্রী নিজে আত্মরক্ষণে ও প্রতিপালনে অক্ষম। ...স্ত্রীর পালন ও রক্ষা ব্যতীত প্রজার বিলোপ সম্ভাবনা। এ জন্য তৎপালন ও রক্ষণ জন্য স্বামীর প্রাণপাত করাও ধর্ম্মসঙ্গত।' (পৃ. ১১৯) কিন্তু, স্ত্রী-পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্কে নিরিখে যে-সব দৈবী যুগলের কথা মনে পড়ে, তার ক্ষেত্রেও বিষ্ণু এবং প্রায় শারদপ্রতিমা দুর্গার ন্যায় এক 'মোহিনী' মাতৃমূর্তির এই আশ্চর্য সহাবস্থান খটকা জাগাতে পারে বৈকি! এই মূর্তিতত্ত্বে যেভাবে

বৈষ্ণব দেবতা এবং শাক্ত দেবীর মিলন ঘটেছে, ভারতীয় ঐতিহ্যে তার কোনো সমর্থন আছে কি? আমাদের উত্তর 'হ্যাঁ'। লক্ষ করা যেতে পারে, বঙ্কিম-কল্পিত এই মাতৃমূর্তির সামনে 'মধুকৈটভস্বরূপ দুইটি প্রকাণ্ড ছিন্নমস্ত মূর্তি'র উপস্থিতি। এই সামান্য ইঙ্গিতটুকুকেই প্রসারিত করা যাক সমালোচকের ভাষ্যে ঃ

> 'মার্কণ্ডেয়পুরাণে মধুকৈটভবধ উপাখ্যানে দেবী বিষ্ণুর যোগনিদ্রা। প্রলয়পয়োধিজলে অনন্তশয্যায় যোগনিদ্রামগ্ন বিষ্ণুর নাভিকমলস্থিত ব্রহ্মাকে বিষ্ণুবর্ণমলোদ্ভূত মধু ও কৈটভ নামক দানবদ্বয় আক্রমণ করলে ব্রহ্মা বিষ্ণুর যোগনিদ্রাকে স্তবের দ্বারা প্রসন্ন করেছিলেন।.... মধুকৈটভবধাখ্যানে দেবী বিষ্ণুর যোগনিদ্রা,—শুম্ভনিশুম্ভ বধকালে তিনি বিষ্ণুমায়া।'[২০]

'মহাবিষ্ণু'র কোলে 'মোহিনী' দেশমাতৃকার অবস্থান নিয়ে শ্রীচক্রবর্তীর আপত্তি থাকলেও আমরা দেখলাম তা হিন্দু ঐতিহ্যানুগত। একই সঙ্গে শ্রীচক্রবর্তীর আরেকটি অভিযোগ—লক্ষ্মী-সরস্বতীর উপস্থিতিতে বিষ্ণুর 'লাম্পট্যের', তাও আশা করি খণ্ডিত হল।

বিষ্ণু-কৃষ্ণ ঃ

'বঙ্গদর্শন'-এর জ্যৈষ্ঠ ১২৮০ সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন 'দুর্গা' নামের এক প্রবন্ধ। তার কিছু অংশ ফিরিয়ে পড়া যাক—'শ্রীকৃষ্ণ এবং দুর্গা এই বঙ্গদেশের প্রধান আরাধ্য দেবতা। ইঁহাদিগের পূজা না করে, এমন ত হিন্দু প্রায় বঙ্গদেশে নাই। কেবল পূজা নহে, কৃষ্ণভক্তি ও দুর্গাভক্তি এ দেশের লোকের সর্ব্বকর্ম্মব্যাপী হইয়াছে।'(পৃ. ৩১৮) কৃষ্ণ আর দুর্গা—উভয়ত যে ভক্তির আবেশ, তা-ই কীভাবে 'আনন্দমঠ'-এর অর্চা মূর্তিটি গড়ে তুলেছে, তা আশা করি বোঝা যাচ্ছে। ব্যক্তিগতভাবে অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের ঝোঁক ছিল 'কৃষ্ণভক্তি'তেই। গৃহদেবতা 'রাধাবল্লভজীউ'-এর প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের ভক্তিপ্রণত মনোভাব লক্ষ করে চন্দ্রনাথ বসু তাঁর 'বন্ধুবৎসল বঙ্কিমচন্দ্র' রচনায় লিখেছেন ঃ

> 'বঙ্কিমচন্দ্র এই বিগ্রহের কথা কহিতে বড় ভালবাসিতেন, বলিতেন, ''উনি আমাদের বংশের সর্বপ্রকার মঙ্গল বিধান করেন, সমস্ত দুর্গতি নাশ করেন। আমাদের সকল কথা শুনেন, সব আবদার রক্ষা করেন, রোগ শোকে বিপদে আমরা উহারই মুখ চাহিয়া থাকি, উঁহাকেই ধরি, উনি আমাদিগকে বড় ভালবাসেন।'' এমন সরলভাবে এমন ভক্তি ভরে রাধানাথের কথা কহিতেন যে শুনিতে শুনিতে আমার চক্ষে জল আসিত।'[২১]

তবে কৃষ্ণ-বিষ্ণু সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মতামত একদিনে গঠিত হয়নি। ১২৮১ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যা 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা প্রবন্ধ 'কৃষ্ণচরিত্র'। অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত

'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ' বইয়ের সমালোচনা এটি। 'বিবিধ সমালোচন' বইতে সংকলিত হলেও, পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র এটি আর কোনো প্রবন্ধ-পুস্তকে পুনর্মুদ্রিত করেননি। কৃষ্ণ-সংক্রান্ত বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন-যুগের মনোভাব এতে বিধৃত— '...গীতগোবিন্দের শ্রীকৃষ্ণ কেবল বিলাসরসে রসিক কিশোর নায়ক। সেই কিশোর নায়কের মূর্ত্তি অপূর্ব্ব মোহন মূর্ত্তি; শব্দভাণ্ডারে যত সুকুমার কুসুম আছে, সকলগুলি বাছিয়া বাছিয়া চতুর গোস্বামী এই কিশোর কিশোরী রচিয়াছেন; আদিরসের ভাণ্ডারে যতগুলি স্নিগ্ধোজ্জ্বল রত্ন আছে, সকলগুলিতে ইহা সাজাইয়াছেন; ... ইন্দ্রিয়পরতার অন্ধকার ছায়া আসিয়া প্রখর সুখতৃষাতপ্ত আর্য্য পাঠককে শীতল করিতেছে।' (পৃ. ৩৭৯) লক্ষণীয়, বঙ্গদর্শন পর্বে বঙ্কিমচন্দ্র 'গীতগোবিন্দ'-এর কৃষ্ণের মধ্যে 'ইন্দ্রিয়পরতার' ছায়া লক্ষ করেছেন। সঙ্গতভাবেই এই পর্বের উপন্যাসেও ব্যাপ্ত গীতগোবিন্দময় কৃষ্ণকথার 'ইন্দ্রিয়পরতার অন্ধকার ছায়া।' রাষ্ট্র এবং পরিবারে ভাঙন ধরায় যে 'কামবৃত্তি' তারই প্রতীক হয়ে ওঠেন 'গীতগোবিন্দ'-এর কৃষ্ণ।

কমলাকান্ত 'পতঙ্গ' রচনায় বলেছিলেন 'গীতগোবিন্দ'-এ 'ইন্দ্রিয়বহ্নি জ্বলিতেছে।' (পৃ. ১২) আর 'বিষবৃক্ষ'-এ হরদেব ঘোষালের বেনামীতে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠিতে আবারও 'রূপবতীর রূপভোগ-লালসা' যে 'কামাতুরের চিত্তচাঞ্চল্য' তারই কবি রূপে 'জয়দেব'-এর নাম উচ্চারিত হয় (পৃ. ৮৯-৯০)। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাস জুড়েই 'কামবৃত্তি' সম্পন্ন চরিত্র হীরা আর দেবেন্দ্রকে তাই সর্বক্ষণ আবৃত করে রাখে 'গীতগোবিন্দ'-এর পদলালিত্য। হরিদাসী বৈষ্ণবীর বেশে নগেন্দ্রের অন্দরমহলে এসে দেবেন্দ্র গায় ঃ

'শ্রীমুখপঙ্কজ—দেখ্‌বো বলে হে,
তাই এসেছিলাম এ গোকুলে
আমায় স্থান দিও রাই চরণতলে।
মানের দায়ে তুই মানিনী,
তাই সেজেছি বিদেশিনী,
এখন বাঁচাও রাধে কথা কোয়ে,
ঘরে যাই হে চরণ ছুঁয়ে।' (পৃ. ২৪)

'মানের দায়ে তুই মানিনী' যেমন 'মাধবে মা কুরু মানিনি মানময়ে'[২২]-র ছায়ার রচিত, তেমনই 'ঘরে যাই হে চরণ ছুঁয়ে' বা 'আমায় স্থান দিও রাই চরণতলে'-র মতো পদে ফিরে আসে 'দেহি পদপল্লবমুদারম্'-[২৩]এর ছায়া। আবারও আমরা দেবেন্দ্রকে দেখবো 'বেহালা হস্তে' হীরার ঘরে 'মধুর স্বরে মধুর ভাবযুক্ত মধুর পদ মধুরভাবে গায়িলেন।' (পৃ.৭২) এই অত্যধিক মাধুর্য স্পষ্টতই 'গীতগোবিন্দম্'-কে

নির্দেশ করে। উপন্যাসের শেষে হীরা স্পষ্টই উচ্চারণ করে—'এখন তোমার মনে পড়ে না, কিন্তু এক দিন এই ঘরে বসিয়া আমার এই পা ধরিয়া (এই বলিয়া হীরা খাটের উপর পা রাখিল) গাহিয়াছিলেন—

স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লব মুদারং। ' (পৃ. ১৩৬)

জয়দেবের এই কৃষ্ণকথার সূত্রেই ফিরিয়ে পড়া চলে 'রজনী' উপন্যাসের রামসদয় মিত্র ও তাঁর স্ত্রী লবঙ্গলতার দাম্পত্যকে। ৬৩ বছর বয়স্ক রামসদয় বিবাহ করেছেন ১৯ বছরের লবঙ্গলতাকে। যে রামসদয় স্বয়ং 'প্রাচীন'—প্রথমা স্ত্রী ও দু'টি পুত্রসন্তান বর্তমান, উপন্যাসের ইঙ্গিত অনুযায়ী যার জ্যৈষ্ঠ পুত্র বিবাহিত এবং কনিষ্ঠ বিপত্নীক শচীন্দ্র পুনর্বিবাহযোগ্য, তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ, তাও আবার ১৯ বৎসর বয়স্ক 'রূপসী' লবঙ্গলতাকে, নিঃসন্দেহে তা যে 'কামজ' দোষদুষ্ট, তা বঙ্কিম স্পষ্ট করে দেন, লবঙ্গলতাকে রামসদয়ের জয়দেবীয় ভাষায় 'আদর'-এর আহ্বানের মধ্যে দিয়ে—'ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন -কোমল-মলয়-সমীরে।' (পৃ. ১১) 'গীতগোবিন্দ'-এর ১ম সর্গ 'সামোদ-দামোদর'-এর ২৮ সংখ্যক শ্লোকের প্রথম চরণ এটি।[২৪] 'গীতগোবিন্দ'-এর ব্যবহার রামসদয়ের সংগুপ্ত কামুকতা আর লবঙ্গলতার প্রচ্ছন্ন প্রণয়জনিত অতৃপ্তিকে নির্দেশ করে অমরনাথ-লবঙ্গলতার শেষ কথোপকথনকে এক ভিন্ন মাত্রা দান করে।

'গীতগোবিন্দ'-এর পর 'ভাগবত' আর 'মহাভারত'-এর পালা। এই দুই বইকে মিলিয়ে বঙ্কিম গড়ে তোলেন তাঁর 'আদর্শ' কৃষ্ণকে; রাষ্ট্রনায়ক শ্রীকৃষ্ণকে এবং তাঁর আশ্চর্য পরিমিত অনুশীলিত যৌনজীবন তথা দাম্পত্যকেও। বঙ্কিমচন্দ্রের 'প্রচার'-পর্বের উপন্যাসে আমরা কৃষ্ণকথার ছায়াপাত দেখবো ঘন-ঘন। প্রথমে 'সীতারাম'-এর কথা। 'আদর্শ' রাষ্ট্রপ্রণেতা হলেও-হতে-পারতেন যে সীতারাম তার উপরে সঙ্গতভাবেই কৃষ্ণের ছায়াপাত ঘটে। ঐতিহাসিকের মতে ঃ

> 'সীতারামের তিনটি বিবাহের বিশেষ উল্লেখ দেখা যায়।... অতি অল্প বয়সে সীতারামের সহিত ভূষণার অন্তর্গত ইদিলপুর-নিবাসী এক মৌলিক কায়স্থের কন্যার বিবাহ হইয়াছিল। এ পত্নীর কোন সন্তানাদি হয় নাই।... তিনি বীরভূম জেলার অন্তর্গত দাস-পলশা গ্রামে সৌকালীন গোত্রীয় প্রসিদ্ধ কুলীন সরল খাঁ ঘোষের কন্যা কমলাকে বিবাহ করেন।... সীতারাম তৃতীয়বার বর্দ্ধমানের অন্তর্গত পাটুলী গ্রামে বিবাহ করেন। এই স্ত্রীর নাম বা অন্য পরিচয় জানা যায় নাই।'[২৫]

বঙ্কিম-উপন্যাসে মাথা-গুণতিতে ঠিক থাকলেও, নাম বদলেছে সীতারামের প্রত্যেক স্ত্রী-ই। হয়েছে—শ্রী, নন্দা আর রমা। এই নামকরণের তাৎপর্য ধরা পড়ে গৌরদাস বাবাজির ভাষ্যে—'... লক্ষ্মী অর্থে সৌন্দর্য্য।

শ্রী, রমা প্রভৃতি লক্ষ্মীর আর নামেরও সেই অর্থ।' (পৃ. ১৮০) অর্থাৎ, 'শ্রী' ও 'রমা'—স্বরূপত 'বিষ্ণু'-সীতারামের 'লক্ষ্মী'। কিন্তু নন্দা? বাবাজির মতে—'... লক্ষ্মী আনন্দ।' আর 'যাহাকে আনন্দ বলি, তাই নন্দ।' (পৃ. ১৮৮) অর্থাৎ, স্ত্রীলিঙ্গে 'নন্দা'-ও আদিরূপে সেই লক্ষ্মীই।

'সীতারাম'-এ যেমন, তেমনই বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র'-এর ছায়াপাত ঘটেছে 'দেবী চৌধুরাণী'তেও। বঙ্কিম লেখেন—'ঈশ্বর অনন্ত জানি। কিন্তু অনন্তকে ক্ষুদ্র হৃদয়পিঞ্জরে পূরিতে পারি না। সান্তকে পারি। তাই অনন্ত জগদীশ্বর হিন্দুর হৃৎপিঞ্জরে সান্ত শ্রীকৃষ্ণ! স্বামী আরও পরিষ্কাররূপে সান্ত। এই জন্য প্রেম পবিত্র হইলে, স্বামী ঈশ্বরে আরোহণের প্রথম সোপান। তাই হিন্দুর মেয়ের পতিই দেবতা।' (পৃ. ৪৫) বোঝা যায়, অনুশীলন ধর্মের সম্পূর্ণ প্রতিপালনেই প্রফুল্লর মত 'হিন্দুর মেয়ের' 'দেবতা'-সম 'পতি'প্রাপ্তি ঘটেছে, যিনি নামতই 'ব্রজেশ্বর'।

'কামবৃত্তি'-র বিরুদ্ধাচারী দাম্পত্যের দেবতা, বঙ্কিম-কল্পনায় যে শ্রীকৃষ্ণ তার ভাগবতীয় জীবনকথার ছায়াপাত ঘটে 'চন্দ্রশেখর'-এ। উপন্যাসের ৪র্থ খণ্ডে শৈবলিনী ধ্যানরত অবস্থায় চন্দ্রশেখরকে দেখেছে—'এই যে সুন্দর, সুকুমার, বলিষ্ঠ দেহ—... অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য অর্দ্ধেক শক্তি—... আধ রাধা আধ শ্যাম...।' (পৃ. ৮৪) শৈবলিনী স্বামী চন্দ্রশেখরের মধ্যে ঐশ্বর্যময় কৃষ্ণকে কল্পনা করেছে বলেই কৃচ্ছ্রসাধনের সময় সে স্বপ্ন দেখেছে— '... সে ভয়ঙ্কর নরকে ডুবিয়াছে, অগণিত, শতহস্তপরিমিত, সর্পগণ অযুত ফণা বিস্তার করিয়া শৈবলিনীকে জড়াইয়া ধরিয়াছে;... চন্দ্রশেখর আসিয়া, এক বৃহৎ সর্পের ফণায় চরণ স্থাপন করিয়া দাঁড়াইলেন; তখন সর্পসকল বন্যার জলের ন্যায় সরিয়া গেল।' (পৃ.৮৫) এই স্বপ্ন স্পষ্টতই কৃষ্ণের 'কালিয়দমন'-এর স্মৃতিবাহী। তাই, 'কৃষ্ণচরিত্র'-এর ভাষ্যেই উদ্ধার করা যায় এর নিহিত তাৎপর্য—'... আমাদের ইন্দ্রিয়রতিই সকল অনর্থের মূল, তাহা হইলে পঞ্চেন্দ্রিয় ভেদে ইহার পাঁচটি ফণা; এবং আমাদের অমঙ্গলের অসংখ্য কারণ আছে, ইহা ভাবিলে, ইহার সহস্রফণা। আমরা ঘোর বিপদাবর্ত্তে এই ভুজঙ্গমের বশীভূত হইলে জগদীশ্বরের পাদপদ্ম ব্যতীত, আমাদের উদ্ধারের উপায়ান্তর নাই। কৃপাপরবশ হইলে তিনি এই বিষধরকে পদদলিত করিয়া মনোহর মূর্তি বিকাশপূর্ব্বক অভয়বংশী বাদন করেন...।' (পৃ. ৬৫)

কৃষ্ণকথার সবচেয়ে চর্চিত অংশ যে রাধা-কৃষ্ণের সম্পর্ক সে-বিষয়ে কী ভাবতেন বঙ্কিমচন্দ্র? 'গীতগোবিন্দ'কে বিশেষভাবে 'ইন্দ্রিয়-বহ্নি'-র কাব্য বললেও, মুখ্যত রাধা-কৃষ্ণের সম্পর্ককে 'বিলাসপ্রিয়তা' শূন্য পবিত্র দাম্পত্য ভাবতেই অভ্যস্ত ছিলেন তিনি। 'কৃষ্ণচরিত্র'-এ তিনি লেখেন—'যিনি কৃষ্ণের আরাধিকা, তিনিই রাধা বা রাধিকা।' (পৃ. ৯৬) জগৎসিংহের কৃষ্ণ-বিষ্ণুত্ব আগেই লক্ষ করেছি আমরা। এবার লক্ষ করতে পারি তিলোত্তমার রাধিকা-স্বরূপত্ব। জগৎসিংহকে প্রথম দর্শনের পর 'পূর্বরাগ' আক্রান্ত তিলোত্তমার বর্ণনা—'তিলোত্তমা নিজে আহার করে না; রাত্রে নিদ্রা যায় না; তিলোত্তমা বেশভূষা করে

না; তিলোত্তমা কখন চিন্তা করে না, এক্ষণে দিবানিশি অন্যমনে থাকে।' (পৃ. ২১) স্পষ্টতই তিলোত্তমা এখন চণ্ডীদাসের রাধা ঃ

'রাধার কি হলো অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহার কথা।।
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়ান-তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে
যেমন যোগিনী পারা।।'[২৬]

লক্ষণীয় বঙ্গীয় বৈষ্ণবতায় স্বীকৃত রাধা-কৃষ্ণের পরকীয়া সম্পর্ক। কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভাষায় ঃ

'পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনু ইহার অন্যত্র নাহি বাস।।
ব্রজ বধূগণে এই ভাব নিরবধি।
তার মধ্যে শ্রীরাধিকা ভাবের অবধি।।'[২৭]

একে অস্বীকার করে রাধা-কৃষ্ণের স্বকীয়া সম্পর্কের উপরেই জোর দিয়েছিলেন 'দম্পতিপ্রীতি'র শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র। 'কৃষ্ণচরিত্র'-এ লিখেছিলেন—'তবে ব্রহ্মবৈবর্ত্তকার কথিত একটা বড় মূল কথা বাঙ্গালার বৈষ্ণবেরা গ্রহণ করেন নাই, অন্ততঃ সেটা বাঙ্গালীর বৈষ্ণবধর্ম্মে তাদৃশ পরিস্ফুট হয় নাই—রাধিকা রায়াণপত্নী বলিয়া পরিচিতা, কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তের মতে তিনি বিধিবিধানানুসারে কৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী।' (পৃ. ৮৮) রাধা-কৃষ্ণের বঙ্কিম-নির্ধারিত এই দাম্পত্যকে স্মরণে রাখলে বোঝা যায়, কেন চঞ্চলকুমারী, রাজসিংহের প্রতি তার পূর্বরাগকে প্রকাশ করতে গিয়ে, গানের পংক্তিতে রাধা-কৃষ্ণকেও স্থাপন করেন অন্যান্য দেব-দম্পতির মধ্যেই ঃ

'গৌরী সম্‌ঝে ভসমভার
পিয়ারী সম্‌ঝে কালা।
শচী সম্‌ঝে সহস্রলোচন
বীর সম্‌ঝে বীরবালা।' (পৃ. ৩৫)

অবশ্য 'কৃষ্ণচরিত্র'-এর বহু পূর্বেই রাধা-কৃষ্ণের সম্পর্ক যে বাহ্যত পরকীয়া, স্বরূপত স্বকীয়া এবং 'বিলাস-প্রিয়তা দোষ' শূন্য, তার ইঙ্গিত বঙ্কিমচন্দ্র রেখে গেছেন 'মৃণালিনী' উপন্যাসের মধ্যে। বৈষ্ণবী

গিরিজায়ার গানে গানেই রচিত হয়েছে এই উপন্যাসের ভিন্নতর এক মাত্রা। মৃণালিনী-হেমচন্দ্রের সম্পর্কের সমান্তরালে তৈরি হয়েছে কৃষ্ণকথার এক অভিনব ভাষ্য! লক্ষ করা যাক গিরিজায়ার ক্রমিক গানগুলি আর বঙ্কিম-রচিত কৃষ্ণকথার সেই নব্য-ভাষ্য ঃ

প্রথম গান	
'মথুরাবাসিনি, মধুরহাসিনি, শ্যামবিলাসিনি—রে। কহ লো নাগরি, গেহ পরিহরি, কাহে বিবাসিনী—রে।। বৃন্দাবনধন, গোপিনীমোহন, কাহে তু তেয়াগী—রে। দেশ দেশ পর, সো শ্যামসুন্দর, ফিরে তুয়া লাগি—রে।।' (পৃ. ১৩) প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গানটি হেমচন্দ্র, গিরিজায়াকে শিখিয়ে দিয়েছে। 'মথুরা' থেকে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া মৃণালিনীকে সে দেশে দেশে খুঁজে বেড়াচ্ছে, একথা গানের ব্যঙ্গ্য।	গানটির বাচ্য কী? 'মথুরাবাসিনি' রাধা, না-জানি কেন 'বিবাসিনী' হয়ে মথুরা এবং 'শ্যামসুন্দর' উভয়কেই ত্যাগ করেছে। তারই সন্ধানে দেশে দেশে ভ্রমণ করছেন মথুরানাথ। গৃহত্যাগিনী রাধিকার অনুসন্ধানে কৃষ্ণের দেশভ্রমণ বঙ্কিমচন্দ্রের অভিনব পরিকল্পনা।
দ্বিতীয় গান	
'যমুনার জলে মোর, কি নিধি মিলল। ঝাঁপ দিয়া পশি জলে, যতনে তুলিয়া গলে পরেছিনু কুতূহলে, যে রতনে। নিদ্রার আবেশে মোর, গৃহেতে পশিল চোর, কণ্ঠের কাটিল ডোর, মণি হরে নিল।' (পৃ. ১৫) যমুনায় নৌকাডুবি থেকে হেমচন্দ্র মৃণালিনীকে উদ্ধার করেছিল, এ-গান তারই সাক্ষী। আর গুরু মাধবাচার্য্যই যে মৃণালিনীকে চুরি করা 'চোর', এ-গান সে-কথাও বলতে চেয়েছে।	কৃষ্ণ বলছেন, তার 'নিধি' যমুনার জল থেকে তুলে এনেছিলেন তিনি। 'যতনে' গলায় পরেও ছিলেন সেই অমূল্য রত্ন। কিন্তু, না জানি কখন 'নিদ্রার আবেশে' ঘরে চোর এসে সেই 'মণি' হরণ করে নিয়ে গেল। আবার অভিনবত্ব! কৃষ্ণকথার সঙ্গে দাম্পত্যের টানেই মিশে গেছে রামকথা। কণ্ঠলগ্না রত্ন-স্বরূপা স্ত্রীকে স্বামীর অজান্তে হরণ করেছে কেউ।
তৃতীয় গান	
'ঘাট বাট তট মাঠ ফিরি ফিরিনু বহু দেশ। কাঁহা মেরে কান্ত বরণ, কাঁহা রাজবেশ।। হিয়া পর রোপনু পঙ্কজ, কৈনু যতন ভারি। সোহি পঙ্কজ কাঁহা মোর, কাঁহা মৃণাল হামারি।।' (পৃ. ১৫) শেষ দু'টি পংক্তিতে মৃণালিনীকে সন্ধানরত হেমচন্দ্রের আকুলতা স্পষ্ট!	কৃষ্ণকথার ভাষ্যে এ-গানের অর্থ, মথুরার রাজা কৃষ্ণ তাঁর 'রাজবেশ' ত্যাগ করে 'বিবাগিনী' রাধিকাকে 'ঘাট বাট তট মাঠ'-এ সন্ধান করে ফিরছেন।

চতুর্থ গান	
‘কাহে সই জীয়ত মরত কি বিধান? ব্রজকি কিশোর সই, কাঁহা গেল ভাগই, ব্রজজন টুটায়ল পরাণ। ... মিলি গেই নাগরী, ভুলি গেই মাধব, রূপবিহীন গোপকুঙারী। কো জানে পিয় সই, রসময় প্রেমিক, হেন বঁধু রূপকি ভিখারী।। ...আগে নাহি বুঝনু, রূপ দেখি ভুলনু, হৃদি ধৈনু চরণ যুগল। যমুনা-সলিলে সই, অব তনু ডারব, আন সখি ভখিব গরল।। ... কিবা কাননবল্লরী, গল বেঢ়ি বাঁধই, নবীন তমালে দিব ফাঁস। ...নহে—শ্যাম শ্যাম শ্যাম শ্যাম, শ্যাম নাম জপয়ি, ছার তনু করব বিনাশ।’ (পৃ. ৬৫-৬৬) হেমচন্দ্র আর মনোরমাকে একসঙ্গে দেখে গিরিজায়ার আশঙ্কা ‘ঠাকুরাণীর কপাল ভাঙ্গিয়াছে।’ সেই আশঙ্কারই রূপ এই গান।	প্রথম তিনটি গান কৃষ্ণের ভাষ্য। চতুর্থ গানে গিরিজায়া রাধার কথা বলছে। ‘নাগরী’-কে পেয়ে ‘মাধব’ ভুলে গেছে ‘রূপবিহীন গোপকুঙারী’-কে। কৃষ্ণ ‘রূপজ মোহ’-এ পড়েছে এটাই গানের অভিযোগ—‘হেন বঁধু রূপকি ভিখারী।।’ তাহলে এবার রাধা কী করবে? রাধা মৃত্যু কামনা করছে। জলে ডুবে, বিষ খেয়ে অথবা উদ্বন্ধনে মারা যেতে চায় সে। আর তা না হলে কৃষ্ণনাম জপ করতে করতে সে মরতে পারে। দু’টি বিষয় লক্ষণীয় এ’গানে। এক, রাধাকৃষ্ণের মধ্যে ‘রূপজ মোহ’ বা ‘কামবৃত্তি’-র প্রবেশ-আশঙ্কা করেছে সখী। আর দুই, তার গানের তৃতীয় পংক্তির একটি পাঠান্তর আছে—‘ব্রজবধূ’, যা রাধা-কৃষ্ণের দাম্পত্যকেই দৃঢ়বদ্ধ ভাবে সূচিত করে।
পঞ্চম গান	
‘পরাণ না গেলো। যো দিন পেখনু সই যমুনাকি তীরে, গায়ত নাচত সুন্দর ধীরে ধীরে, ওঁহি পর পিয় সই, কাহে কালো নীরে, জীবন না গেলো?... ধায়নু পিয় সই, সোহি উপকূলে, লুটায়নু কাঁদি সই শ্যামপদমূলে, সোহি পদমূলে রই, কাহে লো হামারি, মরণ না ভেল?’ (পৃ. ৭৭-৭৮) ‘কুলটা’ বলে যে-মৃণালিনীকে মিথ্যা অপবাদে ত্যাগ করেছেন হেমচন্দ্র, এ-গানে তারই মনের কথা গেয়েছে গিরিজায়া। সম্পূর্ণ গান জুড়ে ব্যথিতা মৃণালিনীর মৃত্যুবাসনা ব্যপ্ত রয়েছে। পূর্ববর্তী গানেরই অনুষঙ্গবাহী এটি।	কৃষ্ণের সঙ্গে অতিবাহিত তার সুখময় মুহূর্তগুলি মনে করে রাধা ভাবছে,সেই সুখের মুহূর্তেই কেন মৃত্যু এসে কেড়ে নেয়নি তাকে। তাতে অন্তত আজকের এই বিরহ সহ্য করতে হতো না! ‘নাগরী’কে পেয়ে ‘ব্রজকি কিশোর’ যাকে অবহেলা করছে সেই রাধা আসলে ‘প্রণয়ে আত্মবিসর্জ্জন’ করতে চেয়েছে। কে না জানে ‘বিষবৃক্ষ’ মতে ‘প্রণয়ে আত্মবিসর্জ্জন’-ই ‘দম্পতিপ্রীতি’-র পরাকাষ্ঠা? রাধিকার এই মৃত্যুযাচ্ঞা তাই তাঁর ‘দম্পতিপ্রীতি’-রই অমলিন স্বাক্ষর।

মৃণালিনী-হেমচন্দ্রের মাধ্যমে রাধা-কৃষ্ণের যে দাম্পত্যের কল্পনা বঙ্কিম সম্পূর্ণ 'মৃণালিনী' উপন্যাস জুড়ে করেছিলেন, তারই তত্ত্বভাষ্য পরবর্তীকালে রচিত হল 'কৃষ্ণচরিত্র'-এ—'রাধা ঈশ্বরের শক্তি, উভয়ের বিধিসম্পাদিত পরিণয়' (পৃ. ৯৫)। 'এহো হয় আগে কহ আর।' 'ধর্মতত্ত্ব'-এ বঙ্কিমচন্দ্র 'অনুশীলন ধর্ম', অনুশীলিত নারী-পুরুষ এবং অনুশীলন-ধর্মভিত্তিক সমাজ তথা রাষ্ট্র-ব্যবস্থার কথা বলেছিলেন। সেই আদর্শ রাষ্ট্রনায়ক এবং রাষ্ট্রের সন্ধান তিনি পেলেন কৃষ্ণ এবং তাঁর 'ধর্মরাজ্য'-সংস্থাপনের মধ্যে; রচিত হল 'কৃষ্ণচরিত্র'। বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের মতে—'অনুশীলনে যে আদর্শে উপস্থিত হইতে হয়, কৃষ্ণচরিত্র কর্ম্মক্ষেত্রস্থ সেই আদর্শ। আগে তত্ত্ব বুঝাইয়া, তার পর উদাহরণের দ্বারা তাহা স্পষ্টীকৃত করিতে হয়। কৃষ্ণচরিত্র সেই উদাহরণ।' (পৃ. ৯) শেষ নয় এখানেই। বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ রাষ্ট্রনায়ক সন্ধানের পৌরাণিক ফল যদি হন কৃষ্ণ, তবে ঐতিহাসিক ফলাফল নিঃসন্দেহে রাজসিংহ। 'ধর্মতত্ত্ব'-কে মান্য করে 'কৃষ্ণচরিত্র' আর 'রাজসিংহ' কীভাবে বঙ্কিম-কল্পনার যুক্তবেণী হয়ে উঠেছে, তা সামান্য মিলিয়ে নেওয়া দরকারঃ

ধর্মতত্ত্ব	কৃষ্ণচরিত্র	রাজসিংহ
(ক) 'মানুষের সমুদয় শক্তি-গুলিকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা গেল। (১) শারীরিকী, (২) জ্ঞানার্জ্জনী, (৩) কার্য্যকারিণী, (৪) চিত্তরঞ্জিনী। এই চতুর্ব্বিধ বৃত্তিগুলির উপযুক্ত স্ফূর্ত্তি,পরিণতি ও সামঞ্জস্যই মনুষ্যত্ব।' (পৃ. ২০)	কৃষ্ণ কি আদর্শ মনুষ্য? তাঁর কি এই চারটি বৃত্তি উপযুক্ত রূপে অনুশীলিত? বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরঃ (১) **শারীরিকী বৃত্তি** 'কৃষ্ণ যেমন বেদে বা যুদ্ধবিদ্যায় সুপণ্ডিত, শারীরিক ব্যায়ামেও তদ্রূপ সুপারগ। ... অতএব কালযবন কৃষ্ণকে ধরিতে পারিলেন না।' (পৃ. ১০৬) (২) **জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি** 'মহাভারতের সভাপর্ব্বে অর্ঘাভিহরণ পর্ব্বাধ্যায়ে কৃষ্ণের পূজ্যতা বিষয়ে ভীষ্ম একটি হেতু এই নির্দ্দেশ করিতেছেন যে, কৃষ্ণ নিখিল বেদবেদাঙ্গপারদর্শী।' (পৃ. ১০৩-১০৪) (৩) **কার্য্যকারিণী বৃত্তি** 'রাজশাসনের মূলসূত্র এই যে, প্রজারক্ষার্থ দুষ্কৃতকারীকে দণ্ডিত করিবে।... তিনি নিজে, সমস্ত যদুবংশের রক্ষার্থ, কংস মাতুল হইলেও তাহাকে বধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।' (পৃ. ১৯২) (৪) **চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি** 'এই রাসলীলা কৃষ্ণ এবং গোপীগণ-কৃত সেই চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি অনুশীলনের উদাহরণ।' (পৃ. ৭৪)	এবার পালা রাজসিংহের। 'রাজসিংহ' কৃষ্ণের মতোই আদর্শ মনুষ্য কিনা, তার খতিয়ান নেওয়া যাক। (১) **শারীরিকী বৃত্তি** '...রাজপুত দৃঢ়মুষ্টিধৃত তরবারি দলপতির মস্তকে আঘাত করিলেন। তাঁহার হস্তে এত বল যে, এক আঘাতেই মস্তক দ্বিখণ্ড হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।' (পৃ. ৭০) (২) **জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি** 'শুনিয়াছি যে, শাস্ত্রে আছে, রূপবতী ভার্য্যা শত্রুস্বরূপ—''ঋণকারী পিতা শত্রুর্মাতা চ..." (পৃ. ১১১) 'হিতোপদেশ' ইস্তক যাঁর পড়া আছে, তাঁর জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি অবশ্যই অনুশীলিত। (৩) **কার্য্যকারিণী বৃত্তি** 'রাজসিংহের সেনাস্থাপনের গুণে (এইটিই সেনাপতির প্রধান কার্য্য) বাঙ্গালার সেনা ও দাক্ষিণাত্যের সেনা, বৃষ্টিকালে কপিদলের মত—কেবল জড়সড় হইয়া বসিয়া রহিল।' (পৃ. ১৪৪) (৪) **চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি** 'ধর্ম্মতত্ত্ব' মতে 'কাব্যই চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলনের শ্রেষ্ঠ উপায়।' (পৃ. ১৩৪) চঞ্চলকুমারীর পত্রে এবং কথোপকথনে যথাক্রমে

ধর্মতত্ত্ব	কৃষ্ণচরিত্র	রাজসিংহ
		'ভাগবত' ও 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'-এর ইঙ্গিত এসেছে। কাব্যপাঠে 'চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি' অনুশীলিত না হলে, রাজসিংহ এর অর্থোদ্ধার করতে পারতেন কি?
(খ) 'অনুশীলিত' 'আদর্শ মনুষ্য'-এর কাজ কী? 'মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলি অনুশীলিত হইয়া যখন ঈশ্বরানুবর্ত্তিনী হইবে, মনের সেই অবস্থাই ভক্তি। এই ভক্তির ফল জাগতিক প্রীতি।' (পৃ. ১২৬)	'কৃষ্ণ স্বজীবনে দুইটি কার্য্য উদ্দিষ্ট করিয়াছিলেন—ধর্ম্মপ্রচার এবং ধর্ম্মরাজ্যসংস্থাপন।' (পৃ. ১৪২) 'ধর্ম' বলতে কী বুঝতেন কৃষ্ণ? বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তর—'যাহাতে লোকের হিত, তাহাই ধর্ম্ম।' (পৃ. ২২৮) মোদ্দা কথা 'জাগতিক প্রীতি'।	আর রাজসিংহ কি করতেন?—'কখন কখন অনুচরবর্গকে দূরে রাখিয়া একাকী অশ্বারোহণ করিয়া ছদ্মবেশে প্রজাদিগের অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া বেড়াইতেন। সেই জন্য তাঁহার রাজ্যে প্রজা অত্যন্ত সুখী হইয়া উঠিয়াছিল; স্বচক্ষে সকল দেখিতেন স্বহস্তে সকল দুঃখ নিবারণ করিতেন।' (পৃ. ৭৬)
(গ) 'জাগতিক প্রীতি'র অর্থ যদি হয় সকলের প্রতি ভালোবাসা, তবে কি শত্রুকেও ভালবাসতে হবে? গুরুর উত্তর---'যে আক্রমণকারী, তাহা হইতে আত্মরক্ষা করিব, কিন্তু তাহার প্রতি প্রীতিশূন্য কেন হইব?' (পৃ. ১২৫)	'জরাসন্ধ রাজগণকে ছাড়িয়া দিলে, কৃষ্ণ তাহাকে নিষ্কৃতি দিতেন। জরাসন্ধ তাহাতে সম্মত না হইয়া যুদ্ধ করিতে চাহিলেন, সুতরাং যুদ্ধই হইল।' (পৃ. ১৫৫) অর্থাৎ কৃষ্ণ শত্রুর প্রতিও 'প্রীতিশূন্য' নন।	ঔরঙ্গজেবকে খাদ্য সরবরাহ করার প্রসঙ্গে—'রাজসিংহ এ প্রস্তাবে সম্মত ও স্বীকৃত হইলেন। উপবাসে এত মানুষ মারাও তাঁহার ইচ্ছা নহে।' (পৃ. ১৭৬)
(ঘ) এহেন 'আদর্শ মনুষ্য'-এর জীবনের লক্ষ্য কী হবে? 'ধর্মতত্ত্ব'-কারের উত্তর—'সকল ধর্ম্মের উপর স্বদেশপ্রীতি, ইহা বিস্মৃত হইও না।' (পৃ. ১৪১) দেশকে ভালোবাসতে হবে, 'জননী জন্মভূমি'-কে রক্ষা করতে হবে, প্রয়োজনে নিজের 'দেশ' নিজেকে গড়তে হবে।	কৃষ্ণ 'ধর্ম্মরাজ্যসংস্থাপন' করলেন পান্ডবদের সহায়তায়। আর 'রণজয়' করে তার শাসনের জন্য 'বিধি ব্যবহার' নির্মাণ করালেন ভীষ্মের মাধ্যমে।	আর রাজসিংহ? 'অনেক স্থান অধিকার' করে 'সৌরাষ্ট্র পর্য্যন্ত' নিজের রাজ্য স্থাপন করলেন।

এ'হেন 'আদর্শ মনুষ্য' তথা আদর্শ রাষ্ট্রনায়ক যে রাজসিংহ, তাঁর জীবনের প্রতিটি কর্মকেই বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণকথার মহাভারতীয় ও ভাগবতীয় প্রেক্ষিতের সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে চেয়েছেন। বিশেষত 'দম্পতিপ্রীতি'-র প্রশ্নে। 'রাজসিংহ' উপন্যাসে চঞ্চলকুমারী-রাজসিংহের সম্পর্ককে তাই প্রত্যক্ষতই রুক্মিণীহরণের পৌরাণিক আখ্যানের সমান্তরালে রাখেন বঙ্কিম। তাই, নির্মলকুমারী চঞ্চলকে বলে—'তুমি যদি রুক্মিণী হতে পার, যদুপতি আসিয়া অবশ্য উদ্ধার করিতে পারেন।' (পৃ. ৬২) আর পুরোহিত অনন্ত মিশ্রের মুখে শুনি—'... বুঝেছি, রুক্মিণীর বিয়ে, তাই পুরোহিত বুড়াকেই দ্বারকায় যেতে হবে।' (পৃ. ৬৪) রুক্মিণীকে উপলক্ষ করেই শিশুপালের সঙ্গে কৃষ্ণের শত্রুতার সূত্রপাত, যা শেষ হয় রাজসূয় যজ্ঞের সমাপ্তিতে। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়—'... রাজসূয় যজ্ঞের মহাসভায় কৃষ্ণ কর্ত্তৃক শিশুপাল নামে প্রবল পরাক্রান্ত মহারাজা নিহত হয়েন। পাণ্ডবদিগের সংশ্লেষমাত্রে থাকিয়া কৃষ্ণের এই একমাত্র অস্ত্রধারণ বলিলেও হয়।' (পৃ. ১৬১) কৃষ্ণের স্মৃতিবাহী রাজসিংহের যুদ্ধ বর্ণনাতেও তাই ছায়া ফেলে রাজসূয় যজ্ঞ। উপন্যাসের পঞ্চম থেকে অষ্টম খণ্ডের নামগুলি লক্ষণীয় ঃ

পঞ্চম খণ্ড—'অগ্নির আয়োজন'
ষষ্ঠ খণ্ড —'অগ্নির উৎপাদন'
সপ্তম খণ্ড—'অগ্নি জ্বলিল'
অষ্টম খণ্ড—'আগুনে কে কে পুড়িল'

এই খণ্ডের শেষ পরিচ্ছেদ 'পূর্ণাহুতি-ইষ্টলাভ।'

এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, 'রাজসিংহ' (ক্ষুদ্র কথা)-এর শেষ পংক্তিটি—'ঔরঙ্গজেব শিশুপালের দশা প্রাপ্ত হইয়া দেবীরের ক্ষেত্রে রাজসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন। সেখানেও শিশুপালের দশান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।' (পৃ. ২৩২) 'ক্ষুদ্র কথা'-র পাঠের প্রত্যক্ষ 'উপমান' পরিণত গ্রন্থপাঠে ব্যপ্ত হয়ে গেছে উপন্যাসের শরীরে। কৃষ্ণ-রাজসিংহের কাছে ঔরঙ্গজেব-শিশুপালের পরাজয় কি আসলে এক অর্থে 'দম্পতিপ্রীতি'-র নিকট 'কামবৃত্তি'-রই পরাজয় নয়?

বিবিধ ঃ

রাধা-কৃষ্ণ, দুর্গা, লক্ষ্মী-নারায়ণ বা হর-পার্বতীর মতো পুরাণ-প্রসিদ্ধ চরিত্রদের মুখচ্ছদ করে অনেক সময়ই বঙ্কিম পৌঁছতে চেয়েছেন, তাঁর অভিপ্রেত রাষ্ট্র-পরিবার-যৌনতা-সংক্রান্ত ধারণায়। পুনরাবৃত্ত এই সব পুরাণকথা ছাড়াও কখনো কখনো বঙ্কিমচন্দ্র অন্য জাতীয় 'পৌরাণিক উপাখ্যান'ও ব্যবহার করেছেন তাঁর উপন্যাসে। সেরকমই কয়েকটির তাৎপর্য সন্ধান করা যাক।

'মৃণালিনী' উপন্যাসে নিতান্তই কামুক, দুশ্চরিত্র, ব্যোমকেশকে মাত্র বার দুয়েক বঙ্কিম এনেছেন, গল্পের উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে। তার মধ্যে প্রথমবার, ব্যোমকেশ যখন মৃণালিনীকে 'হস্তদ্বারা আকর্ষণ' করে, তখন তাঁরই মুখে শুনি এক পৌরাণিক বাচন—'সুন্দরি! তুমি আমার দ্রৌপদী—আমি তোমার জয়দ্রথ।' (পৃ. ২৫) মহাভারতের 'বনপর্ব'-এ আমরা জয়দ্রথকে দেখি দ্রৌপদীকে কাম-তাড়িত হয়ে হরণ করতে ঃ

> 'দ্রৌপদীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে তিনি তাঁর সঙ্গী রাজা কোটিকাস্যকে বললেন, এই অনবদ্যাঙ্গী কে? এঁকে পেলে আমার আর বিবাহের প্রয়োজন নেই।... জয়দ্রথ ভূমি থেকে উঠে দ্রৌপদীকে সবলে রথে তুললেন।'[২৮]

'কামবৃত্তি'-র প্রতীক-রূপে জয়দ্রথকে নির্বাচন করা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাজ্ঞতার পরিচয়।

বৈয়াসকি মহাভারত থেকে যেমন বঙ্কিমচন্দ্র খুঁজে পেয়েছেন 'কামবৃত্তি'-র প্রতীক, তেমনই 'কাশীদাসী মহাভারত' থেকে তিনি উদ্ধার করেছেন 'দম্পতিপ্রীতি'-র আশ্চর্য এক চিত্র। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে নগেন্দ্র-সূর্য্যমুখীর শয়নকক্ষে লম্বিত চিত্রগুলির মধ্যেই একটি—'সত্যভামার তুলাব্রত'। ব্রত-উদ্‌যাপনে সত্যভামা কৃষ্ণকে নারদকে দান করে দিলে, তাকে ফেরত পাওয়ার জন্য তুলাদণ্ডে পরিমাপ করে সমপরিমাণ ধন-রত্ন দানের অঙ্গীকার করতে হয়। কিন্তু, 'পর্বত-সমান' ধনদান করেও কৃষ্ণকে তুলিত করতে পারেন না সত্যভামা। বুঝতে পারেন ঃ

> 'একৈক ব্রহ্মাণ্ড যাঁর এক লোমকূপে।
> কোন্ দ্রব্য সম করি তৌলিবা তাঁহাকে।।'[২৯]

এই চিত্রটিই আঁকানো থাকে সূর্য্যমুখীর দাম্পত্য-মন্দিরে, যার নিচে সে স্বহস্তে লিখে রাখে—'স্বামীর সঙ্গে, সোনা রূপার তুলা?' (পৃ. ১২৩) 'অনন্যব্রত' সূর্য্যমুখীর কাছে তার স্বামীর যে কোনো বিনিময়মূল্য নেই, তা বোঝা যায়। আর এই জন্যই কুন্দনন্দিনীর হাতে স্বামীকে সমর্পণ করেই গৃহত্যাগ করেন সূর্য্যমুখী; স্বামীকে ভাগ করে নেওয়া 'দম্পতিপ্রীতি'র অন্তরায়।[৩০]

'দম্পতিপ্রীতি' আর 'কামবৃত্তি' যুগবৎ দুইকেই একসঙ্গে বঙ্কিম পুরাণ-প্রতীকে চিহ্নিত করেন 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে। গোবিন্দলাল ভাবেন—'রোহিণীকে গ্রহণ করিয়াই জানিয়াছিলেন যে, এ রোহিণী, ভ্রমর নহে—এ রূপতৃষ্ণা, এ স্নেহ নহে—এ ভোগ, এ সুখ নহে—এ মন্দারঘর্ষণপীড়িত বাসুকিনিশ্বাসনির্গত হলাহল এ ধন্বন্তরি ভাণ্ডনিঃসৃত সুধা নহে।' (পৃ. ৮৭) 'সমুদ্রমন্থনের' পৌরাণিক আখ্যানের এ হেন অভিনব প্রয়োগ বঙ্কিমচন্দ্রের পুরাণী প্রজ্ঞার পরিচায়ক।

মহাভারতীয় পুরাণকথা ব্যবহারের একটি আশ্চর্য উদাহরণ খুঁজে পাই 'সীতারাম' উপন্যাসে।

'কৃষ্ণচরিত্র'-এ বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন—-'দ্যূতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে হারিলেন। তারপর দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ, এবং সভামধ্যে বস্ত্রহরণ। মহাভারতের এই ভাগের মত, কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট রচনা জগতের সাহিত্যে বড় দুর্লভ।' (পৃ. ১৭০) সেই 'দুর্লভ' 'কাব্যাংশ'কেই বঙ্কিম ব্যবহার করেছিলেন 'সীতারাম' উপন্যাসে, কিঞ্চিৎ পরিবর্তনসহ। 'পুষ্পশরাহত' রাজা সীতারাম 'শ্রী'কে কাছে পেতে চাইলেন, কিন্তু পেলেন না। গীতার ভাষ্যে বঙ্কিম সীতারামের তৎকালীন অবস্থারই ব্যাখ্যা দেবেন—'যাহাকে মনে পুনঃ পুনঃ স্থান দিবে, তাহারই প্রতি আসক্তি জন্মিবে। আসক্তি জন্মিলে তাহা পাইতে ইচ্ছা করে, অর্থাৎ কামনা জন্মে। না পাইলেই, প্রতিরোধক বিষয়ের প্রতি ক্রোধের উৎপত্তি হয়। ক্রোধে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞানশূন্যতা বা মূঢ়তা জন্মে। এরূপ মোহ হইতে কার্য্য-কারণ-পরস্পর-সম্বন্ধ বিস্মৃত হইতে হয়। কার্য্যকারণসম্বন্ধ ভুলিলেই বুদ্ধিনাশ হইল। বুদ্ধিনাশে বিনাশ।' (পৃ. ১০১) ঠিক এমনটাই ঘটে সীতারামের। তাঁর 'কামবৃত্তি' প্রতিহত হয়ে ক্রোধের জন্ম দেয়। সেই ক্রোধের বশেই বুদ্ধিনাশ; ফলে সন্ন্যাসিনী জয়ন্তীর 'বস্ত্রহরণে'র আদেশ—'রাজ্যে ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে যে, তাহাকে বিবস্ত্রা করিয়া বেত্রাঘাত করা হইবে।' (পৃ. ১৪৪) এই পর্যন্ত মহাভারতকেই অনুসরণ করেন বঙ্কিমচন্দ্র। কিন্তু এরপর? 'মহাভারত' মতে ঃ

> 'দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্র ধ'রে সবলে টেনে নেবার উপক্রম করলেন। লজ্জা থেকে ত্রাণ পাবার জন্য দ্রৌপদী কৃষ্ণ বিষ্ণু হরিকে ডাকতে লাগলেন। তখন স্বয়ং ধর্ম বস্ত্রের রূপ ধ'রে তাঁকে আবৃত করলেন। দুঃশাসন আকর্ষণ করলে নানা বর্ণে রঞ্জিত এবং শুভ্র শত শত বসন আবির্ভূত হতে লাগল।'[৩১]

মহাভারতীয় বস্ত্রদান ও লজ্জা নিবারণের মধ্যে যেমন একদিকে দৈবিকতা রয়েছে, তেমনি অন্যদিকে রয়েছে পুরুষ-সাপেক্ষতাও। বঙ্কিমচন্দ্রের অভিনব ভাষ্যে দুই-ই অপসৃত হয়। 'দম্পতিপ্রীতি'র তথা পরিবারের সারভূতা 'লক্ষ্মীরূপা' যে পত্নী, সে-ই জানে নারীর মর্যাদা; পুরুষের 'কামবৃত্তি'র 'সর্ব্বগ্রাসক' ভূমিকাকে প্রতিহত করার ক্ষমতাও তারই—'তখন জয়ন্তী মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, সমস্ত পৌরস্ত্রী সঙ্গে করিয়া, মহারাণী নন্দা মঞ্চোপরি আরোহণ করিতেছেন।... সেই সমস্ত পৌরস্ত্রী জয়ন্তীকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। মহারাণী নিজে জয়ন্তীকে আড়াল করিয়া, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন।' (পৃ. ১৪৯)

মহারাজ সীতারামের 'কামবৃত্তি'-পরায়ণ চরিত্রের প্রতীক হিসেবেই উপন্যাসে আসে 'রঘুবংশ'-এর এক কামাসক্ত রাজার আখ্যানও। জয়ন্তীর মুখে শুনি—'টোলে টোলে শুনিয়া আসিলাম, ছাত্রেরা সব রঘুর ঊনবিংশের শ্লোক আওড়াইতেছে।' (পৃ. ১৩৯) কী আছে 'রঘুবংশম্'-এর ঊনবিংশ সর্গে? আছে অগ্নিবর্ণ রাজার কথা। আদ্যন্ত কামাসক্ত সেই রাজা ঃ

‘অগ্নিবর্ণ কামুক ছিলেন। তিনি কতিপয় বৎসর স্বয়ং সেই কুলোচিত অধিকার পালন করিয়া, পরে মন্ত্রিগণে ন্যস্ত করত, স্ত্রীগণের একান্ত বশংবদ হইয়া, নবযৌবনযাপনে প্রবৃত্ত হইলেন।... কদাচিৎ মন্ত্রিগণের প্রতি গৌরববশতঃ প্রজাদিগকে যদি বা তাহাদের অভিলষিত দর্শন দান করিতেন, তাহাও আবার মুখাবলোকনপ্রদান দ্বারা নহে; গবাক্ষবিবরসহযোগে কেবল আপনার চরণ বাহির করিয়া দিয়া, তাহা সম্পন্ন করিতেন।’[৩২]

মহান রঘুবংশের ধ্বংসসাধন কামুক অগ্নিবর্ণের হাতেই। রাজ্য-সংস্থাপন-কামী সীতারামের রাষ্ট্রও তাঁর ‘কামবৃত্তি’-র দ্বারাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হল।

উল্লেখপঞ্জি ঃ

১. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরচিত, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, আগস্ট ২০১১, পৃ. ১৯-২০।
২. সুকুমার সেন সম্পাদিত, বৃন্দাবনদাস বিরচিত চৈতন্যভাগবত, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি, ২০০৩, পৃ. ৬৪।
৩. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, হিন্দুদের দেবদেবী : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, দ্বিতীয় পর্ব, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ২০০৩, পৃ. ১৫-১৯।
৪. রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত, কালিদাসের গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় ভাগ, বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির, কলকাতা, প্রকাশকালহীন, পৃ. ৫৬।
৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫।
৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪।
৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫।
৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫।
৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২।
১০. সুধীরচন্দ্র সরকার সংকলিত, পৌরাণিক অভিধান, এম.সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রা. লি., কলিকাতা, পৌষ ১৪১২, পৃ. ৪৮৪।
১১. রাজশেখর বসু-কৃত সারানুবাদ, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস-কৃত মহাভারত, এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লি., কলিকাতা, ১৪২০, পৃ. ২১৮-১৯।
১২. বীতশোক ভট্টাচার্য, কথাজিজ্ঞাসা, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৪, পৃ. ১০।
১৩. অরুণকুমার বসু ও অন্যান্য সম্পাদিত, দেবদাস জোয়ারদার রচনাসমগ্র ১, টেগোর রিসার্চ ইন্সটিটিউট, কলকাতা, নভেম্বর ১৯৯৯, পৃ. ৮৭-৮৮।
১৪. দীনেশচন্দ্র সিংহ, প্রসঙ্গ : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ৭৫।
১৫. ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত, মধুসূদন রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ২০০৪, পৃ. ৬৯।
১৬. হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য-কর্তৃক অনুবাদিত, বাল্মীকি রামায়ণ, ভারবি, কলকাতা, নভেম্বর ১৯৯৭, পৃ. ৯৩৪।
১৭. 'চিত্রদলন'-এর সাক্ষ্যে চঞ্চলকুমারীর মধ্যে যে 'মহিষাসুরমর্দিনী' আভাসিত হয়ে উঠছেন, তা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন অধ্যাপক শ্রীঅচিন্ত্য বিশ্বাস।
১৮. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, হিন্দুদের দেবদেবী : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, তৃতীয় পর্ব, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ৩০৮।
১৯. রমাকান্ত চক্রবর্তী, বাঙালির ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ১১৪-১১৬।
২০. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, হিন্দুদের দেবদেবী : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, তৃতীয় পর্ব, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭০।
২১. সোমেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, কাছের মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলিকাতা, মে ১৯৮৯, পৃ. ১০৫।
২২. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, শ্রাবণ, ১৪০৭, পৃ. ২৪০।
২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৫।

২৪. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৬।
২৫. সতীশচন্দ্র মিত্র, যশোহর্-খুল্নার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা, ১৩২৯, পৃ. ৫৩৭।
২৬. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, বৈষ্ণব পদাবলী, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, মাঘ ১৪০৬, পৃ. ৪৯।
২৭. সুকুমার সেন তারাপদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, কৃষ্ণদাস বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ভাদ্র ১৪১০, পৃ. ২০।
২৮. রাজশেখর বসু-কৃত সারানুবাদ, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস-কৃত মহাভারত, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৩-৪৫।
২৯. দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, কাশীদাসী মহাভারত, কাশীখণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, জানুয়ারি ১৯৯২, পৃ. ২২১।
৩০. এক্ষেত্রে অবশ্য উল্লেখ্য যে সাতের দশক লেখা উপন্যাসে বঙ্কিম যতটা সোচ্চারভাবে তাঁর যৌনতা-দাম্পত্যের ধারণাকে লিঙ্গনিরপেক্ষ রাখতে পারেন, আট বা নয়ের দশকে পৌঁছে আমরা দেখি, তাঁর সেই ধারণায় ঈষৎ-বিস্তর পরিবর্তন ঘটে গেছে। 'পজিটিভিজম্'-এ বিশ্বাসী বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে নারী-পুরুষ কারোরই 'বহুবিবাহ' একদা সমর্থন করেননি, হিন্দু জাতীয়তাবাদের উত্থান পর্বে আমরা দেখি সেই বঙ্কিম তাত্ত্বিকভাবে 'ধর্মতত্ত্ব'-এর নির্মাণ করেও, প্রয়োগক্ষেত্রে পিছু হটছেন। সনাতন ভারতীয় হিন্দু ঐতিহ্যে সহজস্বীকৃত যে পুরুষের 'বহুবিবাহ', শেষপর্বের উপন্যাসে ব্রজেশ্বর-সীতারাম-রাজসিংহদের মাধ্যমে তা-ই বারবার ফিরে আসছিল বঙ্কিম-রচনায়।
৩১. রাজশেখর বসু-কৃত সারানুবাদ, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস-কৃত মহাভারত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৪।
৩২. বহু পণ্ডিতমন্ডলীর সাহায্যে অনূদিত মহাকবি কালিদাসের গ্রন্থাবলী, শ্রীনবকুমার বসু এণ্ড কোম্পানী দ্বারা প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৩০২ সাল, পৃ. ৭৪৬-৪৭।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভাষাশরীর ও প্রতীক-ব্যবহার

সাহিত্যতত্ত্ব ও ভাষা-চিন্তা ঃ

১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয় বঙ্কিমচন্দ্রের 'সহজ রচনাশিক্ষা' নামের ছাত্রপাঠ্য বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ। গার্হস্থ্য আর রাষ্ট্রের ভাবনা সেখানেও পিছু ছাড়েনি বঙ্কিমচন্দ্রের। 'বিষয়' ও 'বক্তব্য' বোঝাতে গিয়ে, তাই পড়ুয়াদের সামনে তিনি উপস্থিত করেন এইরকম একটি কাঠামো ঃ

'বিষয়	**বক্তব্য**
রাজা	প্রজাপালন করা।
স্ত্রী	স্বামীর সেবা করা।' (পৃ. ১৬৬)

এই বইতেই বঙ্কিম লেখেন ভাষা ব্যবহারের চারটি দোষের কথা—'বর্ণাশুদ্ধি, সংক্ষিপ্তি, প্রাদেশিকতা ও গ্রাম্যতা' (পৃ. ১৭০)। এখানে যাকে 'গ্রাম্যতা' বলেছেন বঙ্কিম, ভাষান্তরে তাই-ই 'অশ্লীলতা'। 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাসংগ্রহ'-এর 'ভূমিকা'য় পাই, বঙ্কিমচন্দ্রের অশ্লীলতা-বিষয় গুরুত্বপূর্ণ মতামত— 'যাহা ইন্দ্রিয়াদির উদ্দীপনার্থ, বা গ্রন্থকারের হৃদয়স্থিত কদর্য্যভাবের অভিব্যক্তি জন্য লিখিত হয়, তাহাই অশ্লীলতা। তাহা পবিত্র সভ্যভাষায় লিখিত হইলেও অশ্লীল। আর যাহার উদ্দেশ্য সেরূপ নহে, কেবল পাপকে তিরস্কৃত বা উপহসিত করা যাহার উদ্দেশ্য, তাহার ভাষা রুচি এবং সভ্যতার বিরুদ্ধ হইলেও অশ্লীল নহে।' (পৃ. ১২৮)

বিষয়গত অশ্লীলতা যেমন, তেমনই ভাষাগত অশ্লীলতার কথাও বঙ্কিম বলেন 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত 'বাঙ্গালা ভাষা' (জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৫) নামক প্রবন্ধে। 'হুতোমি ভাষা' তাঁর সম্পর্কে অভিযোগ —'হুতোমি ভাষা অসুন্দর এবং যেখানে অশ্লীল নয়, সেখানে পবিত্রতাশূন্য।' (পৃ. ৩৫৯) অর্থাৎ ভাষা-ব্যবহারে একরকমের নৈতিক ধারণা পোষণ করতেন বঙ্কিমচন্দ্র। লক্ষ করলেই বোঝা যাবে, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যতত্ত্বের মধ্যেই যে নৈতিকতার স্থান ছিল, তাঁর ভাষা ভাবনাকেও তা-ই প্রভাবিত করেছে। পূর্বোক্ত প্রবন্ধ থেকেই একটু দেখে নেওয়া যাক বরং, তাঁর নৈতিক সাহিত্যতত্ত্বের কাঠামোটি—'... সাহিত্য কি জন্য?... যিনি যথার্থ গ্রন্থকার, তিনি জানেন যে, পরোপকার ভিন্ন গ্রন্থ-প্রণয়নের উদ্দেশ্য নাই; জনসাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধি বা চিত্তোন্নতি ভিন্ন রচনার অন্য উদ্দেশ্য নাই'। (পৃ. ৩৫৯) এই নৈতিক ধারণা থেকেই ভাষা-ব্যবহারে স্পর্শকাতর হয়ে উঠেছিলেন বঙ্কিম। মনে পড়বে আমাদের, 'অশ্লীল' বা 'পবিত্রতাশূন্য' শব্দব্যবহারের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের তীব্র অনীহার সেই ছবিটি, যা রবীন্দ্রস্মৃতিতে আজীবন অমলিন ছিল ঃ

‘একটি ঘরে একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত স্বদেশ সম্বন্ধে তাঁহার কয়েকটি স্বরচিত শ্লোক পড়িয়া শ্রোতাদের কাছে তাহার বাংলা ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। বঙ্কিমবাবু ঘরে ঢুকিয়া এক প্রান্তে দাঁড়াইলেন। পণ্ডিতের কবিতার একস্থলে, অশ্লীল নহে, কিন্তু ইতর একটি উপমা ছিল। পণ্ডিতমহাশয় যেমন সেটিকে ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন অমনি বঙ্কিমবাবু হাত দিয়া মুখ চাপিয়া তাড়াতাড়ি সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। দরজার কাছ হইতে তাঁহার সেই দৌড়িয়া পালানোর দৃশ্যটি যেন আমি চোখে দেখিতে পাইতেছি।’[১]

শব্দের নৈতিক ও শালীন ব্যবহার সম্পর্কে সদাজাগ্রত বঙ্কিমচন্দ্রকে এই ঘটনা থেকে অনায়াসেই আঁচ করা চলে। শব্দ-সচেতন শিল্পী বঙ্কিমের এই নৈতিকতার আভাস মেলে তাঁর উপন্যাসের পাঠান্তরেও। একটি উদাহরণ লক্ষ করা যাক। প্রথম সংস্করণ (১৮৬৫) ‘দুর্গেশনন্দিনী’তে বিমলার চোখের বিশেষণ ছিল—‘মদনরসলালসাপরিপূর্ণা’ (পৃ. ১৪১)। অন্তিম সংস্করণে (১৮৯৩) ‘দম্পতিপ্রীতি’-র প্রাণ-প্রতিমা বিমলার ক্ষেত্রে এই বিশেষণ বদলে হয়েছে ‘সুখলালসাপরিপূর্ণা’ (পৃ. ২৪)। বিশেষত যৌনতা বা দাম্পত্য-কেন্দ্রিক শব্দ-নির্বাচনে বঙ্কিমচন্দ্রের এই সমাজনৈতিক ধারণা অধিকরূপে ক্রিয়াশীল ছিল বলে মনে হয়। সর্বাগ্রে তাকেই দেখতে চাইবো আমরা।

শব্দপ্রয়োগ ঃ

সুরুচি, নৈতিকতা ইত্যাদি বিষয় যে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যতত্ত্বের মর্মে বাসা বেধেছিল এবং তার দ্বারাই যে বঙ্কিমচন্দ্রের শব্দ-ব্যবহারও নিয়ন্ত্রিত হতো, তা আমরা বলেছি। বিশেষভাবে দাম্পত্য এবং যৌনতার ক্ষেত্রেই যে এই নিয়ন্ত্রণ এবং নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ তা বলাই বাহুল্য। এই একটি বিশেষ ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের শব্দ-ব্যবহারের অব্যর্থতার দিকে ইতঃপূর্বেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন অধ্যাপিকা সুমিতা চক্রবর্তী তাঁর ‘শব্দসরণিতে কপালকুণ্ডলা’ নামের সুলিখিত প্রবন্ধে। ‘গোধূলি লগ্নে নবকুমারের সহিত কাপালিক পালিতা সন্ন্যাসিনীর বিবাহ হইল।’—‘কপালকুণ্ডলা’ থেকে এই পংক্তিটি উদ্ধার করে অধ্যাপিকা চক্রবর্তীর প্রাসঙ্গিক মন্তব্য ঃ

‘কপালকুণ্ডলা সংসারে প্রবিষ্ট হবে না—তারই ইঙ্গিত ঐ সন্ন্যাসিনী শব্দে। মৃন্ময়ী ও শ্যামাসুন্দরীর সংলাপে একাধিকবার কপালকুণ্ডলাকে ‘তপস্বিনী’ ও ‘যোগিনী’ বলা হয়েছে।’[২]

অব্যর্থ এবং অদ্ব্যর্থ শব্দ-নির্বাচনের মাধ্যমে আজীবন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসমালায় ভাস্বর করে তুলেছেন দাম্পত্য-যৌনতার বহুবিধ মুহূর্ত।

শুরুতেই আমরা লক্ষ করতে চাইবো, বঙ্কিমচন্দ্রের দুই নায়িকার নাম নির্বাচন। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের পতিগতপ্রাণা সূর্য্যমুখীর নামকরণে, সম্ভবত ক্রিয়াশীল ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের প্রিয় কবি মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা' কাব্য-পাঠের স্মৃতি। মনে করা যাক 'লক্ষ্মণের প্রতি শূর্পণখা'র অংশবিশেষ ঃ

'দাঁড়াইয়া উহার আড়ালে,
গতিহীনা লজ্জাভয়ে, কত যে চেয়েছি
তব পানে, নরবর—হায়! সূর্যমুখী
চাহে যথা স্থির-আঁখি সে সূর্যের পানে!—
কি আর কহিব তার?'[৩]

সূর্যের পানে অবিচল নিরীক্ষণরত সূর্যমুখীর স্মৃতিই বঙ্কিমচন্দ্র আভাসিত করে তোলেন 'বিষবৃক্ষ'-এর 'অনন্যব্রত' নায়িকার নামকরণে। এই প্রসঙ্গেই স্মরণীয় আরেকটি নাম—'রোহিণী'। অভিধান মতে 'রোহিণী' নক্ষত্রের জাতক 'স্মরোদ্দীপক' হয়।[৪] জ্যোতিষবিদ্যা-পারঙ্গম বঙ্কিমচন্দ্রের শব্দপ্রয়োগ-কুশলতার এ-ও আরেক আশ্চর্য উদাহরণ।

'কামবৃত্তি' বা 'দম্পতিপ্রীতি'-র সূত্রে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের শব্দ-ব্যবহারে দু'টি ধরণ লক্ষ করতে পারি। প্রথমত, বঙ্কিমচন্দ্র যৌনতা ও দাম্পত্য বিষয়ে চলিত যে শব্দরাশি, তাকেই ব্যবহার করেছেন তাঁর রচনায়। যেমন, 'কামবৃত্তি'পরায়ণ নর-নারী প্রসঙ্গে বঙ্কিমের প্রযুক্ত শব্দ 'বিষধর'। কুন্দনন্দিনীর মা তাঁর প্রথম স্বপ্নে নগেন্দ্র-হীরার ছবি দেখিয়ে বলেন—'যদি পার, তবে ইহাদিগকে দেখিলে বিষধরবৎ প্রত্যাখ্যান করিও।' (পৃ. ৮) আর 'সপ্তচত্বারিংশতম পরিচ্ছেদ'-এর নামকরণ বঙ্কিমচন্দ্র কুন্দনন্দিনী এবং হীরাকে স্মরণে রেখে করেন—'সরলা এবং সর্পী' (পৃ. ১২৮)। আবার 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ গোবিন্দলালের মনো-বাচনে পাই—'বুঝিলেন, যে মন্ত্রে ভ্রমর মুগ্ধ, এ ভুজঙ্গীও সেই মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়াছে।' (পৃ. ২৮) এক্ষেত্রে 'ভুজঙ্গী', বলাই বাহুল্য রোহিণী। কামবৃত্তি-সম্পন্ন নারী-পুরুষ মাত্রই বঙ্কিম-বাচনে 'সর্পী'-'ভুজঙ্গী' অথবা 'বিষধর'। কেন এই বিশেষ শব্দের নির্বাচন? আমাদের লোকায়ত সংস্কৃতিতে যৌনতার সঙ্গে সাপের সম্পর্কের নানাবিধ মাত্রা সম্পর্কে আমরা ওয়াকিবহাল। সামান্য উদ্ধার করা যাক অধ্যাপক পল্লব সেনগুপ্তর মন্তব্য ঃ

> 'বিশ্বজনীনভাবেই সাপের সঙ্গে প্রজননের একটা সংস্কার সংবদ্ধ রয়েছে। সাপের স্বপ্ন দেখলে সন্তান-সম্ভাবনা ঘটে, দুটি সাপের 'শঙ্খ লাগা' দেখলে শুভ কিছু ঘটে, সাপ পুরুষত্বসূচক প্রত্যঙ্গ-প্রতীক, নির্বিষ সর্প ('ঢ্যাম্না') ও পুরুষত্বহীন 'বেটাছেলে' পরস্পরের উপমা, খোলস ছেড়ে সাপের বেরোনো যৌনসক্রিয়তার রূপক—যার মাধ্যমে নতুন দেহ—প্রাণের আবির্ভাব ঘটে—ইত্যাদি সংস্কার বিশ্বজনীন।'[৫]

সঙ্গতভাবেই 'কাব্যাদর্শ' উদ্ধার করে অভিধানও জানাচ্ছে 'ভুজঙ্গ' শব্দের অর্থ—'লম্পট', 'ভোগসংসক্ত' 'জার' ইত্যাদি।[৬] 'ভুজঙ্গ' বা সাপের সঙ্গে 'কামবৃত্তি'র সম্পর্ক সিদ্ধ বলেই, বঙ্কিমচন্দ্রের শব্দ-ব্যবহারে তা পুনরাবৃত্ত।

উনিশ শতকের কলকাতার আকাশে-বাতাসে কান পাতলেই শোনা যেত অসংখ্য যৌন-ভাবাত্মক শব্দ। প্রথম জীবনে কলকাতায় পড়তে-আসা আর শেষজীবনে কলকাতায় বাস-করা বঙ্কিম কি আর জানতেন না সে-সবের কথা? ফলে আশ্চর্য প্রয়োগ-কুশলতায় বঙ্কিমচন্দ্র কলকাতার চল্‌তি যৌন-শব্দের অনুষঙ্গ ব্যবহার করে তাঁর উপন্যাসে গড়ে তুলেছেন 'কামবৃত্তি'র এক জগৎ! 'বিষবৃক্ষ'-এ শুনি কলকাতা-ফেরৎ দেবেন্দ্রর গান ঃ

'মরি মর্‌ব কাঁটা ফুটে,
ফুলের মধু খাব লুটে,
খুঁজে বেড়াই কোথায় ফুটে,
নবীন মুকুল!' (পৃ. ৪২)

নারীকে 'ফুল' বা 'নবীন মুকুল' বলে চিহ্নিত করা সংস্কৃত ঐতিহ্যানুগত। উদ্ধার করা যাক উনিশ শতকের কলকাতার বারাঙ্গনা-সঙ্গীতের দু'টি পংক্তি ঃ

'আবার কি বসন্ত এলো?
অসময়ে ফুটলো কুসুম,'[৭]

আর সেই 'ফুলের মধু' 'লুটে' খাওয়ার যৌন অনুষঙ্গ এতোই স্পষ্ট, যে ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। এই সূত্রেই আমাদের চোখে পড়ে রজনীর গাওয়া গানটিও—'আমার এত সাধের প্রভাতে সই, ফুটলো নাকো কলি—'(পৃ. ১০)। বলাই বাহুল্য, এ'গানের 'প্রভাত' আদতে 'জীবনপ্রভাত' আর 'কলি'—'বিয়ের ফুল'-এর অর্থকে পেরিয়ে আরো অনেক বেশি যৌন-ভাবাত্মক।

এছাড়া আরেক ধরনের শব্দ-ব্যবহারে পারঙ্গম ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। খুব চেনা-জানা শব্দকেই সামান্য মুচড়ে ব্যবহার করতেন তিনি; নতুন এবং অব্যর্থ অর্থে ব্যঞ্জিত হয়ে উঠত তা। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে দেবেন্দ্রের 'কামবৃত্তি'-র প্রকাশ অলজ্জ। সেই দেবেন্দ্রের হীরা-স্তোত্রেই পাই ইচ্ছাকৃতভাবে বিপর্যস্ত করে দেওয়া একখানি শব্দের আয়না ঃ

'যা দেবী মমগৃহেষু পেত্নীরূপেণ সংস্থিতা।।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।' (পৃ. ৫২)

ধ্বনিসাদৃশ্যে 'পত্নী'কে 'পেত্নী' দিয়ে প্রতিস্থাপন করার মধ্যেই ধরা পড়ে দেবেন্দ্রর ধ্বস্ত দাম্পত্য চেতনার রূপটি। তবে শব্দের সামান্য হেরফের করে কী অবিকল্প যৌন-নির্দেশক ইঙ্গিত আনা সম্ভব, বঙ্কিম-উপন্যাসে

তার অন্যতম সেরা উদাহরণ সম্ভবত 'কৃষ্ণকান্তের উইল'। যে রোহিণী একদা বাবু হরলাল রায়ের গৃহিণী হতে চেয়েছিল, সে-ই যখন 'বাবু' গোবিন্দলাল রায়ের রক্ষিতা হয়ে গেল, তখনই তার সম্পর্কে বঙ্কিমের প্রয়োগ সেই শব্দ যুগল—'হাপ পরদানসীন্।' (পৃ. ৬৮) 'সহৃদয় সামাজিক'-এর মনে পড়তে বাধ্য, এরই অনুষঙ্গে, একটি প্রচলিত বাংলা অপশব্দ—'হাফ গেরস্ত'। অভিধান জানাচ্ছে, এর অর্থ ঃ

> 'আপাতভাবে গৃহস্থের মতো জীবন ধারণ করে তলায় তলায় বেশ্যাবৃত্তিতে নিয়োজিত নারী।'[৮]

গোবিন্দলালের সঙ্গে প্রসাদপুরের কুঠিতে সংসার বাঁধা সত্ত্বেও নিশাকরের রূপে মুগ্ধ হয়ে রোহিণীর অভিসার—তার চরিত্রের এই অননুশীলিত 'কামবৃত্তি'-র সংহততম প্রকাশ সম্ভবত এই 'হাপ পরদানসীন্' শব্দটি।

তবে শুধু 'কামবৃত্তি' নয়, 'দম্পতিপ্রীতি'কেও বঙ্কিম চমৎকারভাবে আভাসিত করে তুলেছেন তাঁর শব্দ-ব্যবহারে। 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে নয়ান বৌ প্রফুল্লকে গতরাত্রে 'কোথায় শুইয়াছিলি' জিজ্ঞাসা করলে প্রফুল্লর উত্তর—'ভাই, কেহ তীর্থ করিলে সে কথা আপনার মুখে বলে না।' (পৃ. ২৩) সূর্য্যমুখী তাঁর স্বামীর শয়নকক্ষকে বলেছিল 'মন্দির', আর প্রফুল্ল স্বামীসঙ্গতা হওয়ার সুখকে ব্যাখ্যা করে তীর্থযাত্রায় অর্জিত পুণ্যের রূপকে। 'কামবৃত্তি'-কে নির্জিত করা 'দম্পতিপ্রীতি'র পবিত্রতা এই একটিমাত্র শব্দেই পরিপূর্ণ রূপে আভাসিত।

উপমা ঃ

প্রাচীনপন্থী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের বাংলা রচনাকে ঠাট্টা করেই বঙ্কিমচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের সরস্বতী-বন্দনায় লেখেন—'সমাস-পটল, সন্ধি-বেগুন, উপমা-কাঁচকলার চড়চড়ি রাঁধিয়া এই খিচুড়ি তোমায় ভোগ দিব।' (পৃ. ৩০) 'সমাস-পটল' বা 'সন্ধি-বেগুন' ব্যবহারের প্রবণতা বঙ্কিমচন্দ্রের না-থাকলেও, 'উপমা-কাঁচকলার' ছড়াছড়ি বঙ্কিম-রচনার সর্বত্র! বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যবহৃত অলংকারের মধ্যে সর্বাধিক এবং সুপ্রযুক্ত অলংকারই হল উপমা। যৌনতা এবং দাম্পত্য বিষয়েও তার উদাহরণ ভূরি ভূরি! সেই আলোচনায় প্রবেশের মুখবন্ধ হিসেবেই রাখা যাক বঙ্কিমচন্দ্রের উপমা-প্রয়োগ সম্পর্কে অজয়কুমার ঘোষের প্রবন্ধ 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস : উপমা' থেকে প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ ঃ

> 'তাঁর কিছু উপমা 'প্রথাবদ্ধ' বা অলংকারশাস্ত্রসম্মত, বিশেষতঃ নারীর রূপবর্ণনায় যেখানে তিনি পদ্মের সঙ্গে নারীর মুখচোখ ইত্যাদির তুলনা করেছেন। তাঁর কিছু উপমা 'প্রথাস্মৃত' অর্থাৎ যেগুলি সংস্কৃত কাব্যের স্মৃতিবাহী, কিন্তু হুবহু অনুকরণ নয়; আর কিছু উপমা 'প্রথামুক্ত' অর্থাৎ স্বাধীন কল্পনাশক্তির প্রকাশক।'[৯]

ঠিকই লক্ষ করেছেন অজয়কুমার। যৌনতা বা দাম্পত্য বিষয়েও এই তিনজাতের উপমাই আমরা খুঁজে পাবো। তবে আমরা বিশেষভাবে দেখতে চাইবো, কীভাবে 'প্রথাবদ্ধ' বা 'প্রথাস্মৃত' উপমাই শেষপর্যন্ত বঙ্কিম-প্রতিভার অ-লৌকিকত্বের স্পর্শে রূপান্তরিত হয় 'প্রথামুক্ত' উপমায়।

প্রথমে 'প্রথাবদ্ধ' উপমার কথা। সংস্কৃত সাহিত্যে পুরুষের উপমান 'বৃক্ষ' আর নারীর 'লতা'। এর মধ্য দিয়ে দাম্পত্যে বা প্রণয়সম্পর্কে পুরুষের প্রতি নারীর নির্ভরতার চিত্রটিও ফুটে ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রিয় কবি মধুসূদনের রচনায় এর ব্যবহার একাধিকবার। 'পুরুরবার প্রতি উর্বশী'তেই দেখি ঃ

'তব রাজবনে
স্বয়ম্বরবধূ-লতা বরে সাধে যথা
রসালে, রসালে বরে তেমনি নন্দনে
স্বয়ম্বরবধূ-লতা!'[১০]

স্পষ্টতই, 'রসাল' অর্থাৎ আম্রবৃক্ষ পুরুষ—'বর' এবং 'লতা' তার 'বধূ' অর্থাৎ নারী। বঙ্কিমচন্দ্রের 'গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক'-এরই অন্যতম কবিতা 'সাবিত্রী'। তার সমাপ্তিতে পৌঁছে দেখি সাবিত্রী-সত্যবান মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম লাভ করেছে বৃক্ষ-লতা রূপে ঃ

'জনমিল তথা দিব্য তরুবর,
সুগন্ধি কুসুমে শোভে নিরন্তর,
বেড়িল তাহাতে লতা মনোহর,
সে বিজন স্থানে।।" (পৃ. ৩৯)

বঙ্কিম-উপন্যাসেও পুনরাবৃত্ত এই উপমাটি। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে দেখি, কারাগারে তিলোত্তমাকে জগৎসিংহ ভর্ৎসনা করার পর—'তিলোত্তমার আর ভ্রম রহিল না, অকস্মাৎ বৃক্ষচ্যুতবল্লীবৎ ভূতলে পতিত হইলেন।' (পৃ. ১১১) 'মৃণালিনী' উপন্যাসেও 'কুলটা' ভেবে মৃণালিনীকে হেমচন্দ্র ত্যাগ করলে—'অবলম্বনশাখা ছিন্ন হইলে যেমন শাখাবিলম্বিনী লতা ভূতলে পড়িয়া যায়, মৃণালিনী সেইরূপ হেমচন্দ্রের পদমূলে পতিত হইলেন। (পৃ. ৮২) 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে মীরকাসেম সম্পর্কে দলনী বেগম ভাবে—'আমি লতা হইয়া শালবৃক্ষে উঠিতে চাই কেন?' (পৃ. ১৩) কিন্তু, 'প্রথাবদ্ধ' এই উপমাকেই একেবারে অ-পূর্ব ভাবে উপস্থাপন করেন বঙ্কিম 'বিষবৃক্ষ'-এ। যে বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্মতত্ত্ব'-এ 'স্ত্রী' সম্পর্কে লেখেন—'গৃহধর্ম্মে ইঁহারা ভক্তির পাত্র' (পৃ. ৫৪) আর, যে বঙ্কিমচন্দ্র 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে জানান স্ত্রী 'সংসারসৌন্দর্য্যের প্রতিমা' (পৃ. ৪)—সঙ্গতভাবেই সেই বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবনায় দাম্পত্যধর্মে স্ত্রী-ই গুরু—'ধর্ম্মে যে গুরু'(পৃ. ৪)। ফলে 'বিষবৃক্ষ'-এ এসে বদলে যায় 'প্রথাবদ্ধ' এই উপমা; সংসার-অরণ্যে নারী-ই 'বৃক্ষ', পুরুষই হয়ে ওঠে

তাকে অবলম্বনকারী 'লতা'! 'বিষবৃক্ষ'-এ 'ছায়ারূপিনী' সূর্য্যমুখীকে দেখার পর তাই নগেন্দ্রের উপমাগর্ভ বর্ণনা—'পুনর্ব্বার বৃক্ষচ্যুত বল্লীবৎ সেই মোহিনীর পদপ্রান্তে পড়িয়া গেলেন।' (পৃ. ১২৬)

'প্রথাবদ্ধ' যেমন, 'প্রথাস্মৃত' উপমাও তেমনই ব্যবহার করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র 'অনন্যব্রত' দম্পতিপ্রীতি বোঝানোর জন্য। সংস্কৃত সাহিত্যে নারী-পুরুষের উপমান পদ্ম ও সূর্য। 'মৃণালিনী' উপন্যাসে এই বিশেষ কাঠামোটিকে চমৎকারভাবে ব্যবহার করেছেন বঙ্কিম। হেমচন্দ্রের উপমান সূর্য—'মেঘমুক্ত সূর্য্যের ন্যায় হেমচন্দ্রের মুখ প্রফুল্ল হইল।' (পৃ. ২০) আর, গিরিজায়ার কাছে হেমচন্দ্রের খবর পেয়ে—'মৃণালিনীর মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল—প্রাতঃসূর্য্যকরস্পর্শে যেন পদ্ম ফুটিয়া উঠিল।' (পৃ. ১৪)। এই উপমাটিকেই 'প্রথাস্মৃত' করে ব্যবহার করেন বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষ'-এ। পদ্ম নয়, সূর্যপ্রভ পুরুষটির প্রেয়সী সেখানে হয়ে ওঠে 'সূর্য্যমুখী'। কেন এই পরিবর্তন? 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের 'অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদী' পত্রেই আমরা পড়েছি, 'পৌরব-সরসে নলিনী' যে দ্রৌপদী, তার সূর্য-প্রেয়সী হওয়া সত্ত্বেও বহুভোগ্যা হওয়ার করুণ আত্মকথন ঃ

'রবি-পরায়ণা, মরি, সরোজিনী ধনী,
তবু নিত্য সমীরণ কহে তার কানে
প্রেমের রহস্য কথা! অবিরল লুটে
পরিমল! শিলীমুখ, গুঞ্জরি সতত,
(কি লজ্জা!) অধর-মধু পান করে সুখে!'[১১]

পদ্মের এই বহুভোগ্যতার সম্ভাবনাটি হয়তো বিচলিত করেছিল বঙ্কিমচন্দ্রকে। লক্ষণীয়, 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ রোহিণীকে তিনি একবার মাত্র 'পদ্মিনী' (পৃ. ৭৭) বিশেষণে বিশেষিত করেছিলেন। তাই, সূর্য-পদ্ম নয়, 'বিষবৃক্ষ'-এ বঙ্কিম সৃষ্টি করলেন সূর্য আর সূর্য্যমুখীর নতুন 'অনন্যব্রত' জুটি। পুরুষটি সূর্যপ্রভ আর নারীটি 'সূর্য-স্বয়ংবরা'।

'প্রথাবদ্ধ' বা 'প্রথাস্মৃত' যেমন, তেমনি বঙ্কিমচন্দ্র দাম্পত্য-যৌনতার চিত্র অঙ্কণে 'প্রথামুক্ত' উপমারও চমৎকার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। 'দম্পতিপ্রীতি'কে আহত করা 'কামবৃত্তি'-র প্রসঙ্গে, 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এই পাই তেমন একটি উপমা—'নিদাঘের নীল মেঘমালার মত রোহিণীর রূপ, এই চাতকের লোচনপথে উদিত হইল—প্রথম বর্ষার মেঘদর্শনে চঞ্চলা ময়ূরীর মত গোবিন্দলালের মন, রোহিণীর রূপ দেখিয়া নাচিয়া উঠিল।' (পৃ. ৩৩) 'প্রথম বর্ষার মেঘদর্শনে' ময়ূরীর উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠার মধ্যে যে জৈবিক যৌন-আকাঙ্ক্ষার রূপ বর্তমান, তার সঙ্গে 'চাতকের' তৃষ্ণাকে মিলিয়ে নিতে পারলেই আশা করি গোবিন্দলালের 'কামবৃত্তি'-র একটি সঠিক চিত্র মিলবে। এ তো না-হয় গেল দাম্পত্যে আঘাত-হানা 'কামবৃত্তি'। 'ধর্মতত্ত্ব'-এর গুরু বলেছিলেন 'দম্পতিপ্রীতি'-র মধ্যেও থাকে প্রয়োজনীয় কাম-বাসনা। পরিবার-গঠনে একান্ত প্রয়োজনীয়

যে 'কামবৃত্তি', 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে সাগরের মুখে শুনি তার অভাবজনিত আক্ষেপ; অবশ্যই উপমা-সহযোগে—'আমার অদৃষ্ট মাটির আঁবের মত—তাকে তোলা থাক্‌ব, দেবতার ভোগে কখন লাগিব না।' (পৃ.১৩) চমৎকার এই উপমাটিতে নারী-পুরুষের সম্পর্ক যেমন একাধারে দেবতা ও নিবেদিতার সম্পর্ক হয়ে ওঠে, তেমনি 'ভোগ' শব্দটির মধ্যেই রয়ে যায় দাম্পত্যের অন্তর্গত শুচি-স্নিগ্ধ কামবাসনা।

আর শুধুই 'দম্পতিপ্রীতি'-বোঝানোর জন্যও বঙ্কিম যে-সমস্ত আশ্চর্য 'প্রথামুক্ত' উপমার জন্ম দিয়েছেন, তার থেকে মাত্র একটি নির্বাচন করাই যথেষ্ট। বিমলা, জগৎসিংহকে লেখা চিঠিতে, তাঁর ও বীরেন্দ্রসিংহের দাম্পত্যের প্রগাঢ়তা বোঝাতে লেখেন—'যখন তিন বৎসরের বিচ্ছেদেও পরস্পর বিস্মৃত হইলাম না, তখন উভয়েই বুঝিলাম যে, এ প্রণয় শৈবালপুষ্পের ন্যায় কেবল উপরে ভাসমান নহে, পদ্মের ন্যায় ভিতরে বদ্ধমূল।' (পৃ. ৮৭) এই ধরনের 'প্রথামুক্ত' উপমাই অনেক সময় বঙ্কিম-উপন্যাসে জন্ম দিয়েছে 'রূপকল্প'-এর।

রূপকল্প ঃ

C. Day Lewis তাঁর 'The poetic image' বইতে লিখেছেন—'In it's simplest terms, it is a picture made out of words.'[১২] অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যের ভাষ্যে বিস্তৃত হয় 'রূপকল্প'-এর নির্মাণ-রহস্য ও শিল্প-কৌশল ঃ

> 'কবিপ্রজাপতিসৃষ্ট কাব্যজগৎ 'নিয়তিকৃতনিয়মরহিত', 'অনন্যপরতন্ত্র' বলেই তাকে বলা হয়েছে অ-লৌকিক মায়ার জগৎ। সে জগতে থাকে লৌকিক জগতের সত্য, কবিমানসের উপলব্ধি জনিত আনন্দ এবং শিল্পিত বাণীপ্রকাশের সৌন্দর্য। এই সত্য আনন্দ ও সৌন্দর্যের উপাদানে গড়া সারস্বত বিশ্বে রূপের জগৎ অপরূপ হয়ে ওঠে। এই অপরূপ রূপেরই শিল্পনাম রূপকল্প।'[১৩]

শেক্সপিয়রের রচনাবলীতে পুনরাবৃত্ত রূপকল্প নিয়ে চমৎকার গবেষণা করেছিলেন Caroline Spurgeon. তাঁর 'Shakespear's imagery and what it tells us' বইতে তিনি মন্তব্য করেন ঃ

> 'I use the term 'image' here as the only available word to cover every kind of similie, as well as every kind of what is really compressed similie–metaphor.'[১৪]

অর্থাৎ, স্পার্জন লক্ষ করেছেন, শেক্সপিয়রের ক্ষেত্রে উপমা আর রূপকল্প অনেক সময়েই মিলে মিশে যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর ক্ষেত্রেও সত্য এই দিক্-দর্শন। শব্দের জাদুকর বঙ্কিম তাঁর রচনায় যে অসংখ্য অনবদ্য রূপকল্পের জন্ম দিয়েছেন, তার মধ্যে থেকে আমরা বিশেষভাবে দেখে নিতে চাইব, সেই সব

রূপকল্পকে, যারা কোন-না-কোনভাবে তাঁর রাষ্ট্র-পরিবার-যৌনতা সংক্রান্ত ধারণাকে আভাসিত করেছে।

'রাজসিংহ' উপন্যাসে কামবৃত্তি-পরায়ণা জেব-উন্নিসা সম্পর্কে বঙ্কিম লেখেন—'স্নেহশূন্য নারীহৃদয়, জলশূন্য নদী মাত্র—কেবল বালুকাময় অথবা জলশূন্য তড়াগের মত—কেবল পঙ্কময়।' (পৃ. ১৭৩) বঙ্কিম-মানসে 'স্নেহ' শব্দের অর্থ 'প্রেম'। স্মরণ করা যেতে পারে নির্মলকুমারীকে লেখা ঔরঙ্গজেবের চিঠিটি—'আমি তোমায় যেরূপ স্নেহ করিতাম, কোন মনুষ্যকে কখনও এমন স্নেহ করি নাই।' (পৃ. ১৭৪) অর্থাৎ, 'স্নেহশূন্য' হৃদয় অর্থে বঙ্কিমচন্দ্র কামবৃত্তিপরায়ণতাকেই ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন, যার প্রকাশ ঘটেছে 'পঙ্ক'—এই রূপকল্পের মাধ্যমে। বঙ্কিম-উপন্যাসে এই 'পঙ্ক' বা 'কর্দ্দম' পুনরাবৃত্ত রূপকল্প। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে নদীর ঘাট থেকে কুন্দনন্দিনীর বাড়ির রাস্তায় নগেন্দ্রের প্রথম পদচারণার বর্ণনা পাই—'নগেন্দ্র পদব্রজে কর্দ্দমময় পথে চলিলেন।' (পৃ. ৫) আর এই কাম-'পঙ্ক'-এর শ্রেষ্ঠ ব্যবহার মেলে 'বিষবৃক্ষ'-এর হীরার বর্ণনায়—'দেবেন্দ্রের প্রেম বন্যার জলের মত; যেমন পঙ্কিল, তেমনি ক্ষণিক। তিন দিনে বন্যার জল সরিয়া গেল, হীরাকে কাদায় বসাইয়া রাখিয়া গেল।' (পৃ. ১১২)

'পঙ্ক' যেমন, তেমন 'তৃষ্ণা'র রূপকল্পও বঙ্কিম-উপন্যাসে বয়ে এনেছে 'কামবৃত্তি'র ইঙ্গিত। কুন্দ-রূপমুগ্ধ দেবেন্দ্রের বাচনে পাই এই রূপকল্পটি—'জ্বরে যেমন তৃষ্ণা রোগীকে দগ্ধ করে, সেই অবধি উহার জন্য লালসা আমাকে সেইরূপ দগ্ধ করিতেছে।' (পৃ. ৫৪) প্রতাপ-আকাঙ্ক্ষিণী শৈবলিনীর জবানিতেও ফিরে আসে এ'টিই—'মরুভূমে থাকিলে কোন্ তৃষিত পথিক, সুশীতল স্বচ্ছ সুবাসিত বারি দেখিয়া পান না করিয়া থাকিতে পারে?' (পৃ. ৭৪) আর 'কামবৃত্তি'-র এই সিদ্ধ-রূপকল্পকেই আশ্চর্য মুন্সীয়ানায় 'দম্পতিপ্রীতি'র দিকে ঠেলে দেন বঙ্কিমচন্দ্র, 'ইন্দিরা' উপন্যাসে। স্বামীর 'কামবৃত্তি'কে আপ্রাণ চেষ্টায় 'দম্পতিপ্রীতি'-তে রূপান্তরিত করা ইন্দিরার মন্তব্য—'জ্যৈষ্ঠ মাসের অসহ্য সন্তাপে, দারুণ তৃষাপীড়িত রোগীকে স্বচ্ছ শীতল জলাশয় তীরে বসাইয়া দিয়া, মুখ বাঁধিয়া দাও, যেন সে জল পান করিতে না পারে—বল দেখি, তার জলে ভালবাসা বাড়িবে কি না?' (পৃ. ৪৯) 'মুখ বাঁধিয়া দাও' যে 'অনুশীলন'-এর নামান্তর মাত্র, তা বোধকরি বলার অপেক্ষা রাখে না।

যৌনতার অভাবজনিত রূপকল্প বঙ্কিম-সাহিত্যে 'শুষ্ক কাষ্ঠ'। তাই 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ রোহিণীর মুখে শুনি—'কোন্ দোষে আমাকে এ রূপ যৌবন থাকিতে কেবল শুষ্ক কাষ্ঠের মত ইহজীবন কাটাইতে হইল?' (পৃ. ১৫) আর পাঠকের দিকে প্রায় সমজাতীয় প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় রজনীও—'শুষ্ক কাষ্ঠে অগ্নি সংলগ্ন হইলে কেন না সে জ্বলিবে?' (পৃ. ১৬) তবে কাম-তৃষ্ণার সূত্রে বঙ্কিমচন্দ্র রূপকল্পের পুনরাবৃত্তি ঘটালেও, প্রেম-যাচ্ঞার ক্ষেত্রে তাঁর উদ্ভাবিত রূপকল্পগুলি একমেবাদ্বিতীয়ম্। দুটি উদাহরণ চয়ন করা যাক। প্রথমে 'রাজসিংহ' থেকে। ঔরঙ্গজেব নির্মলকুমারীকে বলেন—'এ জন্মে কেবল তোমাকেই ভালবাসিয়াছি। তাই,

তুমি যদি বল যে, তোমার স্বামী না থাকিলে তুমি আমার বেগম হইতে, তাহা হইলে এ স্নেহশূন্য হৃদয়—পোড়া পাহাড়ের মত হৃদয়—একটু স্নিগ্ধ হয়।' (পৃ. ১৪৮) 'স্নেহশূন্য হৃদয়' বোঝাতে দগ্ধ পর্বতের যে রিক্ততা-ঊষরতার রূপকল্পটি বঙ্কিমচন্দ্র নির্মাণ করেন, তা এক কথায় অনবদ্য। এরকমই আরেকটি রূপকল্পের ক্ষেত্রে অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষম প্রজ্ঞার পরিচয় দেন বঙ্কিমচন্দ্র। 'দুর্গেশনন্দিনী'-তে পাই সেবানিরতা আয়েষার কথা—'যেমন শীতার্ত্ত ব্যক্তির অঙ্গ হইতে ক্রমে ক্রমে বেলাধিক্যে রৌদ্র সরিয়া যায়, আয়েষা সেইরূপ ক্রমে ক্রমে জগৎসিংহ হইতে আরোগ্যকালে সরিয়া যাইতে লাগিলেন।' (পৃ. ৯২) 'শীতার্ত্ত ব্যক্তির' অঙ্গে রৌদ্রের উষ্ণতার রূপকল্প স্পষ্টতই যেন পাঠকের চেতনায় আয়েষার নীরব নিবেদিত প্রেমের উত্তাপটুকু ভরে দিয়ে যায়।

'কামবৃত্তি' যেমন, তেমনি 'দম্পতিপ্রীতি'র জন্যও বঙ্কিমচন্দ্রের শব্দের জগতে রয়েছে পুনরাবৃত্ত 'রূপকল্প'-এর ভাণ্ডার। তারই একটি 'পদ্ম' আর 'রাজহাঁস'। বঙ্কিম-মননে 'পদ্ম' স্ত্রী আর 'রাজহাঁস' স্বামী। 'মৃণালিনী' উপন্যাসে দেওয়ালে পদ্ম-অঙ্কণরত সখী মণিমালিনীকে মৃণালিনীর উপদেশ—'আরও, পার যদি, উহার নিকট একটি রাজহাঁস আঁকিয়া দাও।' (পৃ. ৮) কেন?—'তোমার স্বামীর মত পদ্মের কাছে সুখের কথা কহিবে।' (পৃ. ৮) 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে বজরায় নিদ্রিত শৈবলিনীর স্বপ্নেও ফিরে আসে এই পদ্ম-রাজহাঁসের রূপকল্পই—'সেই ভীমা পুষ্করিণীর চারিপাশে জলসংস্পর্শপ্রার্থি শাখারাজিতে বাপীতীর অন্ধকারের রেখাযুক্ত—শৈবলিনী যেন তাহাতে পদ্ম হইয়া মুখ ভাসাইয়া রহিয়াছে। সরোবরের প্রান্তে যেন এক সুবর্ণনির্ম্মিত রাজহংস বেড়াইতেছে—... রাজহংস দেখিয়া, তাহাকে ধরিবার জন্য শৈবলিনী যেন উৎসুক হইয়াছে; কিন্তু রাজহংস তাঁহার দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইতেছে।' (পৃ. ৪৫) লক্ষণীয়, শৈবলিনীর মনোজগতে প্রতাপ যে তার স্বামী, এই রূপকল্পটি সেকথাই অনাবৃত করে দেয়।

এই 'দম্পতিপ্রীতি'র আড়ে আসে যে 'কামবৃত্তি', তাকেও বঙ্কিম একই সাথে ধরতে চেয়েছেন 'শূকর'-এর রূপকল্পে। আবারও ফিরে যাই শৈবলিনীর স্বপ্নে—'তীরে একটা শ্বেত শূকর বেড়াইতেছে।... শূকর শৈবলিনী-পদ্মকে ধরিবার জন্য ফিরিয়া বেড়াইতেছে, রাজহংসের মুখ দেখা যাইতেছে না, কিন্তু শূকরের মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন, ফষ্টরের মুখের মত।' (পৃ. ৪৫) এইসূত্রেই পড়া যাক 'রাজমোহনের স্ত্রী'-তে মাতঙ্গিনী প্রসঙ্গে কথকের আক্ষেপ—'কিন্তু রূপেই বা কি করে, চরিত্রেই বা কি করে—ললাটলিপিদোষে হউক বা যে কারণেই হউক, সচরাচর দেখা যায়, বঙ্গদেশসম্ভূত কত রমণীরত্ন শূকরদন্তে দলিত হয়—' (পৃ. ২৬৯)। বলাই বাহুল্য, 'কামবৃত্তি'সম্পন্ন পুরুষদেরকেই মুখ্যত 'শূকর'-এর রূপকল্পে ধরতে চেয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাই আক্ষেপনিরত সূর্য্যমুখী-বিচ্ছিন্ন নগেন্দ্রের মুখেই শুনি তার আত্ম-দোষ-কথন—'আমি শূকর, রত্ন চিনিব কেন?' (পৃ. ১০৭)[১৫]

প্রতীক ঃ

'প্রতীক' অর্থাৎ Symbol কী, তা বোঝাতে গিয়ে M. H. Abrams তাঁর 'A glossary of Literary Terms' বইতে অত্যন্ত সরল অথচ অ-বিকল্প একটি সংজ্ঞা উপস্থিত করেন ঃ

> 'In discussing literature, however, the term ''Symbol'' is applied only to a word or phrase that signifies an object or event which in its turn signifies something, or has a range of reference, beyond itself.'[১৬]

Abrams তাঁর বইতে প্রতীককে দু'টি ভাগে বিভক্ত করেছিলেন : 'Conventional' বা 'Public' Symbol এবং 'Private' অথবা 'Personal Symbols'.[১৭] বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাতেও দুর্নিরীক্ষ্য নয় প্রতীক। কখনো তা প্রথাবদ্ধ কখনো আবার ব্যক্তিগত। ইতঃপূর্বেই অবশ্য কেউ কেউ লক্ষ করেছেন বঙ্কিম-রচনায় পুনরাবৃত্ত এই সব প্রতীককে। অধ্যাপক ভবতোষ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'সাহিত্য ভাবনা : পতঙ্গ, আগুন ও জল' প্রবন্ধে দেখান, বঙ্কিম-উপন্যাসে মুখ্যত তিনটি প্রতীক পুনরাবৃত্ত : আগুন, জল ও পতঙ্গ।[১৮] অন্যদিকে সৈয়দ শাহরিয়ার রহমানের মতে বঙ্কিম-উপন্যাসের চেনা-জানা প্রতীকগুলি হল—প্রদীপ, পথ, অতল জল, বিষবৃক্ষ, নৌকা, অপরাজিতা ফুল, দেশ, কীট ও বিড়াল।[১৯] আমরা বিশেষভাবে লক্ষ করতে চাইব, সেইসব 'প্রতীক'কে, যারা বঙ্কিমচন্দ্রের যৌন-নৈতিকতার ধারণাকে কোনো একভাবে উপন্যাসে প্রতীকায়িত করছে। এইসূত্রে আমাদের নির্বাচন, বঙ্কিম-উপন্যাসের জগৎ থেকে সাতটি প্রতীক ঃ বহ্নি, পতঙ্গ, সরোবর, যুগ্মকুসুম, ভ্রমর, ব্যাধ এবং মূর্তি। এর মধ্যে 'বহ্নি-পতঙ্গ' যুগ্ম-প্রতীক।

ভ্রমর

Abrams যে 'Conventional' বা প্রথাবদ্ধ অর্থাৎ সিদ্ধ প্রতীকের কথা বলেছিলেন, 'ভ্রমর' বঙ্কিম-রচনায় সেই সিদ্ধ প্রতীক। সংস্কৃত সাহিত্যে এবং তার অনুসারী বাংলা সাহিত্যে 'ভ্রমর' বহুবল্লভ পুরুষের সিদ্ধ প্রতীক। কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের পঞ্চম অঙ্কে রানী হংসপদিকার গানে পাই, দুষ্মন্তের প্রতি তাঁর প্রতীকায়িত অভিযোগ ঃ

> 'হে মধুকর, সহকারমঞ্জুরীতে (Sic.) অমন প্রণয় প্রদর্শন করে এখন আবার নতুন মধুর লোভে পদ্মে এসে বসার সাথে সাথেই তাকে ভুলে গেলে?'[২০]

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রিয় কবি মধুসূদনের রচনাতেও এই প্রতীকটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে একাধিকবার। 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের 'দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা'-তেই যেমন দেখি শকুন্তলার অভিযোগ ঃ

> 'কিন্তু বৃথা ডাকি, কান্ত। কি লোভে ধাইবে
> আর মধুলোভী অলি এ মুখ নিরখি,—
> শুখাইলে ফুল, কবে কে আদরে তারে?'[২১]

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে ভ্রমরবৃত্তি-সম্পন্ন পুরুষরূপে আমরা পাই 'রাজসিংহ' উপন্যাসের ঔরঙ্গজেবকে—'এই কপটাচারী সম্রাট্ জিতেন্দ্রিয়তার ভাণ করিতেন—কিন্তু অন্তঃপুর অসংখ্য সুন্দরীরাজিতে মধুমক্ষিকা পরিপূর্ণ মধুচক্রের ন্যায় দিবারাত্র আনন্দধ্বনিতে ধ্বনিত হইত।' (পৃ. ৫৩)

আশ্চর্য এই যে 'কামবৃত্তি' পরায়ণতার প্রতীক যে 'ভ্রমর' সংস্কৃত বা তদনুসারী বাংলা সাহিত্যে বারবার পুরুষকে চিহ্নিত করতে চেয়েছে, বঙ্কিম-সাহিত্যে তার লিঙ্গ-পরিবর্তন ঘটেছে : এই সিদ্ধ প্রতীকের লক্ষ্য হয়ে উঠেছে মুখ্যত 'কামবৃত্তি'সম্পন্ন নারীরা। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে মতিবিবি—'মনে মনে ভাবিলেন, কুসুমে কুসুমে বিহারিণী ভ্রমরীর পক্ষচ্ছেদ কেন করাইব?' (পৃ. ৫১) 'রাজসিংহ' উপন্যাসে জেব-উন্নিসার বর্ণনাতেও ফিরে আসে এই একই প্রতীক—'জ্যেষ্ঠা জেব-উন্নিসা বিবাহ করিলেন না। পিতৃষসাদিগের ন্যায় বসন্তের ভ্রমরের মত পুষ্পে পুষ্পে মধুপান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।' (পৃ. ৪৪) তবে 'ভ্রমর'-এর এই সিদ্ধ প্রতীককে অবলম্বন করেও যে ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যসাধনের লক্ষ্যে অবিচল থাকা যায়, বঙ্কিম-উপন্যাসে তার উদাহরণ 'চন্দ্রশেখর'। কাম-মুগ্ধা শৈবলিনী প্রায়শ্চিত্তের জন্য ধ্যাননিরতা অবস্থায়—'কন্টকে ছিন্নপক্ষ ভ্রমরী যেমন দুর্লভ সুগন্ধিপুষ্পবৃক্ষতলে কষ্টে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, তেমনই ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।' (পৃ. ৮৪) আর ক্রমাগত ধ্যান করতে করতে শৈবলিনী—'সপ্তম রাত্রে মনে করিল, হৃদয়মধ্যে পদ্মফুল ফুটিয়াছে—তাহাতে চন্দ্রশেখর যোগাসনে বসিয়া আছেন—শৈবলিনী ভ্রমর হইয়া পাদপদ্মে গুণ গুণ করিতেছে।' (পৃ. ৮৫) 'ভ্রমর'-এর প্রতীককে অবলম্বন করেই 'কামবৃত্তি' যে 'দম্পতিপ্রীতি'র দিকে যাত্রা করছে, তা লক্ষণীয়।

ব্যাধ

'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'-এর প্রথম অঙ্কেই শুনি, দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার, আশ্রমে প্রথম আলাপের অব্যবহিত পরেই 'নেপথ্য' থেকে ভেসে আসা সাবধানবাণী ঃ

> 'তপস্বীরা মন দিয়ে শুনুন, আশ্রমচারী প্রাণীদের রক্ষার জন্য সবাই সচেষ্ট হোন। কারণ মৃগয়ার উদ্দেশ্যে রাজা দুষ্মন্ত আশ্রমের উপকণ্ঠে উপনীত হয়েছেন।'[২২]

রাজা দুষ্মন্তের এই 'মৃগয়া' ব্যঞ্জনায় নারী-শিকারও বটে। বাংলা সাহিত্যেও শিকারের এই বিশিষ্ট ব্যঙ্গ্যার্থ সুলভ। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ কৃষ্ণের কথা—'ছাড়িব দাম রাধা দেহ আলিঙ্গন' শুনে রাধার কাতর আক্ষেপোক্তি—'কি কৈলি কি কৈলি বিধি নিরমিআঁ নারী।/আপণার মাঁসে হরিণী জগতের বৈরী।।'[২৩] 'কামবৃত্তি' পরায়ণ নারী/পুরুষকে শিকারী বা ব্যাধ-এর সিদ্ধ প্রতীকে প্রকাশ করার অভ্যাস বঙ্কিমচন্দ্রেরও।

'আনন্দমঠ' উপন্যাসে পাই শান্তির জনৈক অধ্যাপকের বর্ণনা—'ব্যাধ যেমন হরিণীর প্রতি ধাবমান হয়, শান্তির অধ্যাপক শান্তিকে দেখিলেই তাহার প্রতি সেইরূপ ধাবমান হইতে লাগিলেন।' (পৃ. ৫২) মৃগয়ারত ব্যাধ ও অনিচ্ছুক শিকারের পলায়নপরতার এই চিত্র আসলে 'কামবৃত্তি'-র পাশবিকতাকেই সুস্পষ্ট করে তোলে। পুরুষের যেমন, তেমনই নারীর কামপরায়ণতার সূত্রেও আসে একই প্রতীক। 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ নিশাকরকে দেখে রোহিণীর আচরণ স্মরণীয়—'বুঝি সেই মহাপাপিষ্ঠা মনে করিয়াছিল, ''অনবধান মৃগ পাইলে কোন্ ব্যাধ ব্যাধব্যবসায়ী হইয়া তাহাকে না শরবিদ্ধ করিবে?'' ' (পৃ. ৭৩) 'দম্পতিপ্রীতি'-র একলগ্নতার বিপরীতে 'কামবৃত্তি'-র মধ্যে যে বহুচারিতা রয়েছে, রোহিণীর ভাবনায় তা-ও সুস্পষ্ট। 'রূপক'-এর আড়ালে 'ব্যাধ'-এর এই সিদ্ধ প্রতীকটিকে বঙ্কিম ব্যবহার করেছেন 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসেও। শৈবলিনী ফষ্টরের সঙ্গে ঘর ছাড়তে গিয়ে ভেবেছিল—'কুঠির বাতায়নে বসিয়া কটাক্ষ-জাল পাতিয়া প্রতাপ-পক্ষীকে ধরিব।' (পৃ. ৫৫)

বহ্নি-পতঙ্গ

বহ্নি-পতঙ্গের যুগ্ম-প্রতীকটি বঙ্কিমচন্দ্র পেয়েছিলেন কালিদাসের থেকে। 'কুমারসম্ভবম্'-এর তৃতীয় সর্গের চৌষট্টি সংখ্যক শ্লোকে পাই ঃ

> 'শরনিক্ষেপের উপযুক্ত সময়টির জন্য কামদেব অপেক্ষা করছিলেন। তিনি যেন পতঙ্গের মত আগুনে ঝাঁপ দেবার উদ্দেশ্যেই মহাদেবের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বার বার ধনুকের ছিলা স্পর্শ করতে লাগলেন।'[২৪]

অবশ্য, কালিদাসের তুলনায় বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যবহারের তাৎপর্য সম্পূর্ণ পৃথক। কালিদাসের 'পতঙ্গ' স্বয়ং কামদেব আর বঙ্কিমচন্দ্রের 'পতঙ্গ' কামতাড়িত মনুষ্য। কালিদাসের বহ্নি, শিবের তৃতীয় নেত্রজাত রোষাগ্নি, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় 'জগতে অতুল' 'মহাপবিত্র ক্রোধ' (পৃ. ৬৩) যা রিপু-বিনাশক। আর, বঙ্কিমচন্দ্রের বহ্নি—'কাম-বহ্নি'। 'বাবু' প্রবন্ধের ভাষ্যে—'মদন আগুন' (পৃ. ২৬)। সামান্য উদ্ধার করা যাক কমলাকান্তের মতামত—'মনুষ্য মাত্রেই পতঙ্গ। সকলেরই এক একটি বহ্নি আছে—সকলেই সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে চাহে, ... সংসার বহ্নিময়... এই বহ্নির দাহ যাহাতে বর্ণিত হয়, তাহাকে কাব্য বলি।' (পৃ. ১২)

বঙ্কিমচন্দ্রের সব উপন্যাসেই এই 'বহ্নির দাহ' বর্ণিত, বলাই বাহুল্য সেকথা। 'মৃণালিনী' উপন্যাসে এই 'কামবহ্নি'-র উত্তাপ আমরা অনুভব করতে পারি, যখন মনোরমা রাত্রে স্নান করার কারণ হিসেবে বলে—'গা জ্বালা করে' (পৃ. ৪১)। 'সীতারাম'-এ নিয়ত শ্রী-র চিন্তায় আবিষ্ট সীতারামের বর্ণনা—'যাহার

চিন্তা অগ্নিস্বরূপ দিবারাত্র হৃদয় দাহ করিতেছিল...।' (পৃ. ১১৮) সঙ্গতভাবেই এরপর বঙ্কিম সীতারামের রাজ্যনাশ সম্পর্কে লেখেন—'আগুন তো জ্বলিয়াই ছিল, এবার ঘর পুড়িল।' (পৃ. ১২৩) এই 'কামবহ্নি'-তে নিরন্তর দহ্যমান ভবানন্দ কল্যাণীকে বলে—'দাহ! কল্যাণি দাহ! জ্বালা!' (পৃ. ৮০) 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে শৈবলিনী যে নরক-দর্শন করে, তাতেও 'কামবহ্নি'-তেই তাকে দগ্ধ হতে হয় (পৃ. ৮৫)।

এই 'কামবহ্নি' বা 'রূপ-বহ্নি'তে পুড়ে মরতে চাওয়া 'পতঙ্গ'রাই বঙ্কিম-উপন্যাসের প্রধান-অপ্রধান চরিত্র। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে পাই কুন্দর বর্ণনা—'অথবা কেহ কেহ এমন পতঙ্গবৃত্ত যে, জ্বলন্ত বহ্নিরাশি দেখিয়াও তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হয়।' (পৃ. ১৪) রূপ-ভিক্ষু 'পতঙ্গবৃত্ত' কুন্দর মনেও দেখি 'বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ' হওয়ার বাসনা—'কুন্দ মনে করিতেছে, কি পুণ্য করিলে পতঙ্গ জন্ম হয়। কুন্দ! পতঙ্গ যে পুড়িয়া মরে! কুন্দ তাই চায়। মনে করিতেছে, ''আমি পুড়িলাম—মরিলাম না কেন?'' ' (পৃ. ৫৫) কুন্দ-পতঙ্গের জন্য ছিল রূপ-বহ্নি; আর হীরা-পতঙ্গের জন্য কবিবিধাতা বঙ্কিমচন্দ্র সৃজন করেছিলেন কাম-বহ্নি—'হীরা চিত্ত সংযম করিতে জানিত, কিন্তু তাহাতে তাহার প্রবৃত্তি ছিল না বলিয়া, সহজে পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখে প্রবেশ করিল।' (পৃ. ১০২)

হীরা যেমন, তেমনই রোহিণী। গোবিন্দলাল প্রথম দর্শনে রোহিণীকে 'সংসারপতঙ্গ' (পৃ. ১৫) ভেবেছিল। সেই 'পতঙ্গবৃত্ত' রোহিণীই এরপর ঝাঁপ দিল কাম-বহ্নিতে—'এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া, কালামুখী রোহিণী উঠিয়া দ্বার খুলিয়া আবার—''পতঙ্গদ্বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ''—সেই গোবিন্দলালের কাছে চলিল।' (পৃ. ৩১) 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসেও প্রতাপ সম্পর্কে শৈবলিনীর চিন্তায় পাই সেই বহ্নি-পতঙ্গের প্রতীকটিই—'প্রতাপ আমার কে?... সে শৈবলিনী-পতঙ্গের জ্বলন্ত বহ্নি' (পৃ. ৫৪)। আর 'কামবহ্নি'-তে একবার মাত্র ভুল করে ঝাঁপ দিয়েছিল যে অমরনাথ, সেও নিজের ছিন্নমূল অবস্থার কথা বলতে গিয়ে উপমাগর্ভ প্রতীকটিকেই টেনে আনে—'বাত্যাতাড়িত পতঙ্গের মত' (পৃ. ৩১)।

কিন্তু, বঙ্কিম-উপন্যাসে এই 'বহ্নি' শুধুমাত্র 'কামবহ্নি'-র প্রতীক নয়। নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক Octavio Paz-এর একটি বইয়ের কথা এই সূত্রে স্মরণীয় : 'The Double Flame : Essays on Love and Eroticism'. Paz তাঁর এই গ্রন্থে মনে করিয়ে দেন আমাদের যে আগুনের প্রতীকে কামনাকে যেমন চিহ্নিত করা যায়, তেমনই এই প্রতীকটি প্রেমেরও এক চিরন্তন চিহ্ন।[২৫] বঙ্কিম-রচনাতেও সহজলভ্য 'বহ্নি'-র এই দুই রূপ। মতিবিবির মন্তব্য প্রথমেই মনে পড়ে—'ইন্দ্রিয় সুখান্বেষণে আগুনের মধ্যে বেড়াইয়াছি, কখনও আগুন স্পর্শ করি নাই।' (পৃ. ৬৪) এখানে স্পষ্টই ধরা পড়ে Paz-কথিত 'Double Flame' : 'কাম-বহ্নি' আর 'প্রেম-বহ্নি'। 'ইন্দ্রিয়-সুখান্বেষণে' যে আগুনে প্রবেশ করেছে মতিবিবি, তা 'কামবহ্নি', আর যে 'আগুন' সে কখনও 'স্পর্শ' করেনি, তা-ই 'প্রেমবহ্নি'। এই 'প্রেমবহ্নি' শব্দটিও অবশ্য

বঙ্কিমচন্দ্রেরই নির্মাণ। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' থেকে দেখে নেওয়া যাক রোহিণীর প্রার্থনাটুকু—'আমার হৃদয়ের এই অসহ্য প্রেমবহ্নি নিবাইয়া দাও—আর আমায় পোড়াইও না।' (পৃ. ৩১) এই 'প্রেমবহ্নি'-র শ্রেষ্ঠ প্রকাশ লক্ষ করা যেতে পারে 'রাজসিংহ'-এর জেব-উন্নিসার জীবনে—'সমস্ত দিনরাত্র আগুনের তাপের নিকট বসিয়া থাকিলে মানুষ যেমন হয়, চিতারোহণ করিয়া, না পুড়িয়া কেবল ধূম ও তাপে অর্দ্ধদগ্ধা হইয়া চিতা হইতে নামিলে যেমন হয়, জেব-উন্নিসাকে আজ তেমনই দেখাইতেছিল। জেব-উন্নিসা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পুড়িতেছিল।' (পৃ. ১৬৬) যে জেব-উন্নিসা একদা সগর্বে জানিয়েছিল যে—'ভালবাসা গরীব দুঃখীর দুঃখ। শাহজাদীরা সে দুঃখ স্বীকার করে না।' (পৃ. ৬০) সেই জেব-উন্নিসার জীবনেই সত্য হয়ে দেখা দিল 'double flame'; 'কাম-বহ্নি' থেকে তিনি উত্তরিত হলেন 'প্রেম-বহ্নি' 'বিবিক্ষু' পতঙ্গ-এ। আর এই 'প্রেম-বহ্নি'-তে জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে-যাওয়া হতভাগ্য 'পতঙ্গ'টি বঙ্কিম-উপন্যাসে একমাত্র দলনী বেগম—'দলনী-পতঙ্গ বহ্নিমুখ-বিবিক্ষু হইল।' (পৃ. ১০৪)

যুগ্মকুসুম

সিদ্ধ প্রতীকের পাশাপাশিই Abrams বলেছিলেন ব্যক্তিগত প্রতীকের কথাও। শিল্পীর ব্যক্তিজীবনে লব্ধ অভিজ্ঞতার গাঢ়তম নির্যাস এই ব্যক্তিগত প্রতীক। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাতেও দাম্পত্য-পরিবার-যৌনতাকে চিহ্নিতকরণের জন্য এরকমই কয়েকটি ব্যক্তিগত প্রতীক আমাদের চোখে পড়ে। তারই একটি 'যুগ্মকুসুম'। কৈশোরক রচনা 'ললিতা' কাব্যগ্রন্থেই বঙ্কিম প্রণয়ী-যুগলের অবিচ্ছেদ্যতাকে কল্পনা করেছিলেন যুগ্মকুসুমের প্রতীকে ঃ

'এক বৃন্তে দুটি ফুল মুখে মুখ দিয়ে।
সে হৃদি কুসুমাসনে পড়েছে ছিঁড়িয়ে।।
তেমনি একাঙ্গে এরা থেকে চিরকাল।
মরিল অধর ধরে কি সুখ কপাল।।' (পৃ. ৮৯)

বঙ্কিম-উপন্যাসের জগতে যারা বাহ্যত বা আত্মিকভাবেও নিষ্কলুষ প্রেমের ডোরে বাঁধা, তাদেরই প্রতীকরূপে আসে এই যুগ্মকুসুম। সঙ্গতভাবেই তাই বঙ্কিম-রচনায় যুগ্মকুসুমের প্রতীকটি এসেছে 'দম্পতিপ্রীতি'কে ইঙ্গিত করার জন্যই।

'আনন্দমঠ' উপন্যাসে পাই মহেন্দ্র আর কল্যাণীর বর্ণনা—'নিশীথফুল্লকুসুমযুগলবৎ এক দম্পতী' (পৃ. ৬)। 'রজনী' উপন্যাসেও রজনীর আত্মকথনে শুনি—'বুঝি ইচ্ছা করিয়াছিল, শচীন্দ্র আর আমি, দুইটি ফুল হইয়া এইরূপ সংস্পৃষ্ট হইয়া কোন বন্য বৃক্ষে গিয়া এক বোঁটায় ঝুলিয়া থাকি।' (পৃ. ২০) উপন্যাসের

সমাপ্তিতে শচীন্দ্র-রজনীর দাম্পত্য-সূচনার ইঙ্গিত উপরোক্ত প্রতীকেই প্রকাশিত। তবে এই প্রতীকটির আশ্চর্য ব্যবহার লক্ষ করি 'চন্দ্রশেখর'-এ। নিদ্রিতা শৈবলিনীকে দেখে চন্দ্রশেখর ভাবে—'এই সুকুমার কুসুমকে কি অতৃপ্ত যৌবনতাপে দগ্ধ করিবার জন্যই বৃন্তচ্যুত করিয়াছিলাম?' (পৃ. ২০) আর উপন্যাসের শেষে যোগাবিষ্ট শৈবলিনী চন্দ্রশেখরকে জিজ্ঞাসা করে—'এক বোঁটায় আমরা দুইটি ফুল, এক বনমধ্যে ফুটিয়াছিলাম—ছিঁড়িয়া পৃথক করিয়াছিলেন কেন?' (পৃ. ১২০) শৈবলিনীর প্রতাপের প্রতি বাসনা যে নিছক 'কামবৃত্তি' নয়, বরং তারমধ্যে অপরিস্ফুট 'দম্পতিপ্রীতি'র উন্মেষ-সম্ভাবনাও লুকিয়ে ছিল, এই একটি প্রতীকেই অনাবৃত হয়ে যায় সে-কথা।

মূর্তি

শ্যামাচরণ শ্রীমানীর বইয়ের সমালোচনা তিনি 'বঙ্গদর্শন'-এর পাতায় লেখেন, কমলাকান্তের জবানিতে বাঙালির ভাস্কর্যের জন্য আক্ষেপ করেন, আর প্রৌঢ় প্রহরে 'উড়িষ্যার প্রস্তর শিল্প'-এর গুণগানে রত হন। ভাস্কর্য সম্পর্কে মোটামুটি এমনটাই বঙ্কিমচন্দ্রের মতামত।[২৬] তাই সামান্য হলেও বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় আসে ভাস্কর্য বা মূর্তির প্রসঙ্গ। আর তা আসে মুখ্যত তাঁর দাম্পত্য অথবা যৌনতার ধারণাকে স্পষ্ট কর তোলবার তাগিদেই। এই সূত্রে প্রথমেই স্মরণে আসে 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর কথা। গোবিন্দলালের সযত্নরচিত উদ্যানেই আমরা সন্ধান পাই সেই প্রস্তর-প্রতিমার—'বারুণীর কূলে, উদ্যানমধ্যে, এক উচ্চ প্রস্তর বেদিকা ছিল, বেদিকামধ্যে একটি শ্বেতপ্রস্তরখোদিত স্ত্রী-প্রতি-মূর্ত্তি—স্ত্রী-মূর্ত্তি অর্দ্ধাবৃতা, বিনতলোচনা—একটি ঘট হইতে আপন চরণদ্বয়ে যেন জল ঢালিতেছে' (পৃ. ৩৪)। 'কালো' ভোম্‌রার স্বামী যে গোবিন্দলাল, তার পছন্দ এই 'শ্বেতপ্রস্তরখোদিত' স্ত্রীমূর্তি। এর থেকেই অনুমান করা চলে না কি, যে রূপের অভাব, গোবিন্দলালকে ভিতরে ভিতরে কতখানি ক্ষয় করে ফেলেছিল? উনিশ শতকে কলকাতায় বিদেশ থেকে আমদানি করা নগ্ন বা অর্দ্ধনগ্ন নারীমূর্তির ছড়াছড়ি প্রসঙ্গে শ্রীপান্থর বিশ্লেষণটি আমাদের বক্তব্যেরই সমর্থক ঃ

> 'বাবুর বাগানে সাতসমুদ্রের ওপার থেকে এসে অবতীর্ণ হলেন পরী। ঝাঁক ঝাঁক পরী। কারও ডানা আছে, কারো নেই।... অনেকেরই মনে মনে কামনা ছিল অবশ্য খাস বিলিতি বিবি।... কিন্তু সে-সৌভাগ্যের পথে অনেক বাধা।... সুতরাং, বাবুদের সামনে সেদিন বিকল্প একটাই, —পরী।... কলকাতায় সেদিন চোখ মেললেই পরী। আর, তাঁরা ধরা ছোঁয়ার বাইরে বলেই অন্যভাবে তাঁদের ধরে রাখার জন্য এই উন্মাদনা। কেউ বন্দী করেছেন তাঁদের গিল্টি করা ফ্রেমে শোয়ার ঘরের দেওয়ালে। কেউ বা পাষাণীকে ধরে রাখতে চেয়েছেন সবুজে ফুলে আচ্ছন্ন করে বাগানে।'[২৭] (দ্রষ্টব্য পরিশিষ্ট : দুই)

গোবিন্দলাল যে 'রূপ-বহ্নি'-র পতঙ্গ, তা তাঁর বাগানের ওই 'জলনিষেকরতা পাষাণসুন্দরী'র (পৃ. ৩৫) মূর্তিতেই স্পষ্টভাবে প্রতীকায়িত। আর তাই, উপন্যাসের শেষে এই মূর্তিটির বিকল্প হিসেবে ওই বাগানেই বসবে ভ্রমরের স্বর্ণ-মূর্তি। 'কামবৃত্তি'র মূর্তি-প্রতীককে প্রতিস্থাপন করে 'দম্পতিপ্রীতি'র মূর্তি-প্রতীক স্থাপনাতেই 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর যাত্রা-সমাপ্তি।

আগেই বলেছি আমরা, বঙ্কিম-উপন্যাসে 'কামবৃত্তি'-র দ্বারা গ্রস্ত হয় মুখ্যত পুরুষ; আর তার ফলভোগী হয় নারী অথবা বৃহত্তর অর্থে সংসার ও বৃহত্তম অর্থে রাষ্ট্র। এই বিষয়টিকে প্রতীকায়িত করবার জন্য বঙ্কিম অনেক সময়েই বেছে নিয়েছেন মূর্তির এক শিশুসেব্য সংস্করণ 'পুতুল'। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে পরিত্যক্ত কুন্দর বর্ণনায় তিনি লেখেন—'যেমন বালক চিত্রিত পুত্তলি লইয়া একদিন ক্রীড়া করিয়া, পুতুল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দেয়, পুতুল মাটিতে পড়িয়া থাকে, তাহার উপর মাটি পড়ে, তৃণাদি জন্মিতে থাকে; তেমনি কুন্দনন্দিনী ভগ্ন পুতুলের ন্যায় নগেন্দ্র কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া একাকিনী সেই বিস্তৃতা পুরী মধ্যে অযত্নে পড়িয়া রহিলেন।' (পৃ. ৯১) লক্ষণীয়, একদিকে কুন্দনন্দিনীকে 'পুতুল' বলার মধ্যে দিয়ে যেমন বঙ্কিমচন্দ্র তাকে নিরপরাধ বলতে চেয়েছেন, তেমনি নগেন্দ্রকে 'বালক' রূপে চিত্রিত করে 'কাম' বিষয়ে তার অসংযম এবং অপরিণামদর্শিতাকেই বোঝাতে চেয়েছেন। এই সূত্রেই মনে পড়বে আমাদের 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর গোবিন্দলালকেও বঙ্কিম 'বালক' (পৃ. ৭৭) বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন, আর ভ্রমর তো সরাসরিই স্বামীকে বলেছে—'আমি তোমার প্রতিপালিত তোমার খেলিবার পুতুল—'(পৃ. ৫৩)। 'পুতুল'-এর প্রতীকে উনিশ শতকের দাম্পত্যকে আভাসিত করে তোলা, বঙ্কিমচন্দ্রের 'অঘটনঘটনপটীয়সী' প্রতিভারই আরেক পরিচয়!

<u>সরোবর</u>

ব্যক্তিগত জীবন থেকে তুলে-আনা প্রতীকের মধ্যে নিঃসন্দেহে বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠ প্রতীক 'সরোবর।' ১৩২২ বঙ্গাব্দের 'নারায়ণ' পত্রিকায় পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনে 'অর্জুনা পুষ্করিণী'-র গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে লেখেন ঃ

> 'এই পুষ্করিণী বঙ্কিমচন্দ্রের পৈত্রিক। ... অর্জুনা পূর্বে সুবৃহৎ জলাশয় ছিল; জল দেখা যাইত না; পদ্মপত্রে ঢাকা থাকিত; আর উহার উপর অসংখ্য পদ্মফুল বায়ুতাড়িত হইয়া দুলিত। চারিদিকের পাড় আম্রকাননে সুশোভিত। এই আম্রবনের গাছে গাছে অসংখ্য পাখী বাস করিত।... 'অর্জুনা'-র উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্রদিগের ফুলবাগান ছিল। উহাতে একটি ক্ষুদ্র বাগানবাটিও ছিল;....বঙ্কিমচন্দ্র এই ফুলবাগানে ও পুষ্করিণীর পাড়ে বেড়াইতে ভালবাসিতেন এবং

যত-দিন-না তাঁহাদের বসতবাটির সম্মুখে একটি বৈঠকখানাবাটি নির্মাণ করাইয়াছিলেন, ততদিন, এই ফুলবাগানে সর্বদা থাকিতেন।'[২৮]

বঙ্কিমচন্দ্রের অত্যন্ত পছন্দের এই অর্জুনা পুষ্করিণীই নানা রূপে নানা নামে দেখা দিয়েছে তাঁর উপন্যাসগুলিতে। 'মৃণালিনী' উপন্যাসে 'সরোবর' বা 'দীর্ঘিকা', 'বিষবৃক্ষ'-ও তাই, 'চন্দ্রশেখর'-এ 'ভীমা পুষ্করিণী', 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ 'বারুণী' আর 'রাজসিংহ'-এ 'উদয়সাগর'। আরও লক্ষণীয় প্রতিটি উপন্যাসেই 'সরোবর'-এর পাশে আমরা দেখি সেইসব নারী-পুরুষকে, যারা প্রায়শই 'কামবৃত্তি' পরায়ণ।[২৯] 'মৃণালিনী' উপন্যাসে লক্ষ করি 'দম্পতিপ্রীতি'-র অন্তর্গত যে পর্যাপ্ত 'কামবৃত্তি' তার তৃপ্তিজনিত অভাবে জর্জরিত মনোরমাকে —'হেম। রাত্রে স্নান কেন? মনো। আমার গা জ্বালা করে। হেম। গঙ্গাস্নান না করিয়া এখানে কেন? মনো। এখানকার জল বড় শীতল।' (পৃ.৪১) আর 'কাম' বাসনার সঙ্গে যোগ আছে বলেই এই সরোবর-তীরেই সাময়িকভাবে খণ্ডিত হয় মৃণালিনী-হেমচন্দ্রের দাম্পত্য।

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে এই 'দীর্ঘিকা'-র পাড়ে দাঁড়িয়েই আত্মযুদ্ধে পরাজিত হয় 'পতঙ্গবৃত্ত' নগেন্দ্র-রূপ-বহ্নি-বিবিক্ষু কুন্দ—'আচ্ছা, নাম মুখে আনিতে পারি নে কেন? এখন ত কেহ নাই—কেহ শুনিতে পারে না। একবার মুখে আনিব? কেহ নাই—মনের সাধে নাম করি।' (পৃ.৪৬) আর এরপর 'পিঞ্জরের পাখি' অধ্যায়ে এই 'বাপীতীর' থেকেই নগেন্দ্র-সূর্য্যমুখীর দাম্পত্যে পুনঃপ্রবেশ ঘটবে কুন্দনন্দিনীর। 'মৃণালিনী', 'বিষবৃক্ষ' পেরিয়ে এই সরোবর প্রথম নাম খুঁজে পাবে 'চন্দ্রশেখর'-এ। বঙ্কিম লিখবেন—'ভীমা নামে বৃহৎ পুষ্করিণীর চারি ধারে, ঘন তালগাছের সারি।' (পৃ.১৬) এই পুকুরের আশেপাশেই আমরা উঁকি মারতে দেখবো কামুক লরেন্স ফষ্টরকে। 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ এই দীঘির নাম হবে 'বারুণী'। বারুণীর পাড়ে রোহিণী-গোবিন্দলালের প্রথম আলাপ, বারুণীতে ডুবে মরতে চাওয়া রোহিণী, তাকে পুনর্জীবনদানে পদস্খলিত গোবিন্দলাল—এই উপন্যাসের মূল কাহিনিসূত্র বারুণীর আশেপাশেই ছড়িয়ে থাকে।

তবে বঙ্কিম-উপন্যাসে সরোবর-প্রতীকের সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যবহার 'রাজসিংহ' উপন্যাসে। এই উপন্যাসে 'উদয়সাগর'-এর তীরেই জেব-উন্নিসা-মোবারকের সেই প্রেমঘন মিলন—'সহস্র দীপের রশ্মিপ্রতিবিম্বসমন্বিত, উদয়সাগরের অন্ধকার জলের চতুঃপার্শ্বে পর্ব্বতমালা নিরীক্ষণ করিতে করিতে, পটমণ্ডপের দুর্গমধ্যে ইন্দ্রভবনতুল্য কক্ষে বসিয়া মোবারক জেব-উন্নিসার হাত, আপন হাতের ভিতর তুলিয়া লইল।' (পৃ.১৮৬) 'দম্পতিপ্রীতি'র শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র মোবারক-দরিয়ার দাম্পত্যে জেব-উন্নিসার অনুপ্রবেশকে মেনে না-ই নিতে পারেন; কিন্তু, জেব-উন্নিসার প্রণয়কে নিছক 'কামবৃত্তি' বলাও আর সম্ভব কি? 'রাজসিংহ' উপন্যাসের এই 'উদয়সাগর' তাই বঙ্কিম-রচনায় সরোবর-প্রতীকের এক ভিন্নতর ব্যঞ্জনারই ইঙ্গিতবাহী।

উল্লেখপঞ্জি ঃ

১. বিজলি সরকার সম্পাদিত, রবীন্দ্রনাথের বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্কিম-ভবন গবেষণা কেন্দ্র, নৈহাটি, জানুয়ারি ২০০৯, পৃ.৩০।

২. পরিমল রায় সম্পাদিত, বঙ্কিমচন্দ্র: স্মরণ-সমীক্ষণ, আজকের ধূমকেতু প্রকাশনী, কলকাতা, ১২ জুলাই ২০১০, পৃ.২৭৩।

৩. ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত, মধুসূদন রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, জানুয়ারি ২০০৪, পৃ.১৪৩।

৪. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় শব্দকোষ, দ্বিতীয় খণ্ড॥ প-হ, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লী, ২০০১, পৃ. ১৯৩৫।

৫. পল্লব সেনগুপ্ত, পূজা-পার্বণের উৎসকথা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, মে ২০০১, পৃ.১৪৩।

৬. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় শব্দকোষ, দ্বিতীয় খণ্ড॥ প-হ, পূর্বোক্ত, পৃ.১৬৮৪।

৭. সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, অশ্রুত কণ্ঠস্বর ঔপনিবেশিক বাঙলার বারবণিতা সংস্কৃতি, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০২, পৃ.১১৪।

৮. বাংলা স্ল্যাং সমীক্ষা ও অভিধান, অভ্র বসু, প্যাপিরাস, কলকাতা, আগস্ট ২০০৬, পৃ.৩৯৫।

৯. ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত, বঙ্কিমচন্দ্র: আধুনিক মন, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, নভেম্বর ১৯৮৯, পৃ.১৫৫।

১০. ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত, মধুসূদন রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ.১৫৪।

১১. পূর্বোক্ত, পৃ.১৪৫।

১২. চৈতালি সাহা, রবীন্দ্রনাট্যে প্রতিমা, জিজ্ঞাসা এজেন্সিজ্ লিমিটেড, কলিকাতা, ডিসেম্বর ১৯৯৩, পৃ.১১।

১৩. জগদীশ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রচিত্তে জনচেতনা, ভারবি, কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃ.৩৫২।

১৪. Caroline F. E. Spurgeon, Shakespear's Imagery and what it Tells us, Cambridge University press, New York, 2005, pg.5

১৫. অবশ্য এই ক্ষেত্রে যে একটি বিশিষ্ট ইংরেজি প্রবাদের স্বচ্ছন্দ ছায়াপাত ঘটেছে তাও লক্ষ করার মতো। স্মরণীয়— 'To cast pearls before swine.' (Ashutosh Dev, students' favourite Dictionary, Bengali to English, Dev Sahitya Kutir (p) Limited, February 1989, pg.1289)

১৬. M. H. Abrams, A Glossary of Literary Terms, Thomson Heinle, Singapore, 2003, pg.311

১৭. Ibid, pg.311.

১৮. ভবতোষ চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র: সৃজন ও বীক্ষণ, প্যাপিরাস, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯১, পৃ.২৪-৪৫।

১৯. সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান, উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীক চিহ্নের নন্দনতত্ত্ব বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, মে ২০০৮, পৃ. ৫০-৫৫।

২০. বেণীমাধব রায়চৌধুরী সম্পাদিত, কালিদাস রচনাসমগ্র, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, ১লা ডিসেম্বর ২০০১, কলকাতা, পৃ.২৭০।

২১. ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত, মধুসূদন রচনাবলী, পূর্বোক্ত পৃ.১৩৪।

২২. বেণীমাধব রায়চৌধুরী সম্পাদিত, কালিদাস রচনাসমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৯।

২৩. অচিন্ত্য বিশ্বাস সম্পাদিত, বড়ু চণ্ডীদাস বিরচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যকথা, বিদ্যা, কলকাতা, আগস্ট ২০১৪, পৃ.১৮১।

২৪. বেণীমাধব রায়চৌধুরী সম্পাদিত, কালিদাস রচনাসমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ.৪৭।

২৫. অনিল আচার্য অর্ণব সাহা সম্পাদিত, যৌনতা ও বাঙালি, অনুষ্টুপ, কলকাতা, ২০০৯, পৃ.১৬-১৭।

২৬. শ্যামলী চক্রবর্তী, বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্প ও সঙ্গীতের জগৎ, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, জুলাই ১৯৯০, পৃ.২৯-৩৬।

২৭. শ্রীপান্থ কেয়াবাৎ মেয়ে, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, নভেম্বর ১৯৯৮, পৃ. ১৩২-১৩৬।

২৮. সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত, বঙ্কিমপ্রসঙ্গ, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ৬৪।

২৯. বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের সরোবরগুলির সঙ্গে যে কাম ও মৃত্যুর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ তা ইতঃপূর্বেই লক্ষ করেছেন দুজন সমালোচক। জয়ন্তী সাহা মন্তব্য করেছেন—'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে নারীর প্রেমসংকট ও মৃত্যুবাসনার সঙ্গে জলের নিবিড় সংযোগ।' (জয়ন্তী সাহা, বঙ্কিম বীক্ষা, সংবাদ, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ১৯৮৪, পৃ.২৭১) আর তপোব্রত ঘোষের মতে—'উপন্যাসের চরিত্রের সঙ্গে ওইসব সরোবর মূলত কামরূপী এরস কিংবা মৃত্যুরূপী থ্যানাটসের ভাবসূত্রেই সংযুক্ত;' (তপোব্রত ঘোষ, যেভাবে বঙ্কিম পড়ি, একটি তবু... প্রকাশ, বারাসাত, মার্চ ২০১২, পৃ.২২)

উপসংহার

গবেষণার অন্তিম পরিসরে পৌঁছে গুছিয়ে আনা যাক আমাদের বক্তব্য। বঙ্কিম-সংক্রান্ত অজস্র বিরুদ্ধ মতের মধ্যে প্রায়শই আমরা লক্ষ করেছি দু'টি বিষয়। এক. 'দুই বঙ্কিম'-এর একখানি তত্ত্ব, যাতে 'শিল্পী' বঙ্কিমকে না-কি হারিয়ে দেন শেষমেষ 'ঋষি' বঙ্কিম; তত্ত্বের চাপে নাকি মারা পড়েন কবি! আর, দুই. বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাতে নৈতিকতার ধারণা এবং ভিক্টোরিয় শুচিতাবোধের আগ্রাসন প্রবল। সাম্প্রতিক আড়াই দশকের ইতিহাস-সমাজতত্ত্বের গবেষণায় যৌনতা-সংক্রান্ত ধারণার যে আমূল পরিবর্তন ঘটেছে, বিশেষত মিশেল ফুকোর তত্ত্বচিন্তা যে আমাদের আমূল নাড়িয়ে দিয়েছে, তা অস্বীকার করে লাভ নেই। গবেষণার এই উন্মুক্ত পরিসরে রেখেই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির পুনর্মূল্যায়নে আগ্রহী হয়েছি আমরা।

প্রথমেই আমরা লক্ষ করেছি, প্রাক্ ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশে অতিরেকী কাম-চর্চার এক পরিবেশ ছিল, যার দ্বারা প্রায়শই ধ্বস্ত হতো দাম্পত্য ও পরিবার। তবে এর বিরুদ্ধে একরকমের নৈতিকতা ও শাস্তির কাঠামোও মজুত ছিল। উপনিবেশের গোড়াপত্তনের যুগে পুরনো সেই কাঠামো গেল ভেঙে; ফলে অবাধ ভোগবৃত্তি গ্রাস করে নিল বাঙালির সমাজ-সংস্কৃতিকে। এ'হেন পরিস্থিতিতে 'ইউটিলিটারিয়ান' ইংরেজ-প্রভুদের হাত ধরে একপাশে গড়ে উঠতে লাগল 'শাস্তির' বিকল্প রূপে এক অনুশাসনতন্ত্র আর অন্যদিকে নবোদ্ভূত মধ্যবিত্ত শ্রেণি পাশ্চাত্য সাহিত্য ও দর্শনে স্নাত হয়ে বানিয়ে ফেলল এক নব্য-নীতির 'সহজপাঠ'। তারই উপরে উনিশ শতকের সাতের দশকে আছড়ে পড়ল হিন্দু জাতীয়তাবাদের ঢেউ। 'পরিবার' ক্রমশঃ পরিণত হতে লাগল রাষ্ট্রের অণু-সংস্করণে, পবিত্রতার 'মন্দির'-এ। ফলে যৌনতার অভ্যাস সংকুচিত হয়ে একমাত্র 'প্রজনন'-এর গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল। এই পরিস্থিতির মধ্যে থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র গড়ে তুললেন তাঁর ব্যক্তিগত রাষ্ট্র-পরিবার-যৌনতার ত্রিধাবিন্যস্ত কাঠামো যা 'ধর্মতত্ত্ব'-এ বিধৃত। ব্যক্তিগত এই চিন্তনে বঙ্কিমচন্দ্র যেমন সমকালীন চিন্তা-চেতনার শরিক, তেমনই আবার বহু ক্ষেত্রে সমকালীনতার একেবারে যুযুধান পক্ষ তিনি।

বঙ্কিমচন্দ্রের যৌনতা সংক্রান্ত ধারণা গড়ে উঠেছে কখনো তাঁর ব্যক্তিগত পাঠ-পরিধি ও কর্মজীবন থেকে, কখনো আবার তা সমকালীন যুগ-পরিবেশনের দ্বারা প্রভাবিত। 'ধর্মতত্ত্ব' সেই বঙ্কিম-মননের শ্রেষ্ঠ দান। 'ধর্মতত্ত্ব'-এর অনুসরণেই আমরা বুঝে নিতে চেয়েছি, এই বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের পরিণত সুস্থিত চিন্তাক্রমটি। তাঁর মতে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম 'স্বদেশপ্রীতি'। 'স্বদেশপ্রীতি'র প্রথম ধাপ 'দম্পতিপ্রীতি'। সেই 'দম্পতিপ্রীতি'-কে আঘাত করতে পারে 'কামবৃত্তি'। তাই বৃহত্তর অর্থে 'রাষ্ট্র'-এর মঙ্গলার্থেই 'কামবৃত্তি'-কে সংযত করা উচিত। অর্থাৎ, 'রাষ্ট্র'-এর স্থিতিশীলতার অন্যতম মূলীভূত কারণ 'ইন্দ্রিয় সংযম'। সঙ্গতভাবেই 'ধর্মতত্ত্ব'-এর গুরুর বাচন—'... বিশেষতঃ দম্পতিপ্রীতি, সকল জাতির কাব্য-সাহিত্য অধিকৃত করিয়া রাখিয়াছে। সমস্ত জগতে ইহাই কাব্যের

একমাত্র উপাদান বলিলেও বলা যায়।' (পৃ. ১২২) 'সমস্ত জগতে' না হোক অন্তত বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্য-জগতে 'দম্পতিপ্রীতি'-ই যে 'একমাত্র উপাদান'—তা মোটেই অত্যুক্তি নয়।

রাষ্ট্র পরিবার-যৌনতার যে তত্ত্ব-কাঠামোটি 'ধর্মতত্ত্ব' বইতে খুঁজে পেয়েছি, আমরা দেখেছি যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সব উপন্যাসেই, তা সে 'সামাজিক' বা 'ঐতিহাসিক' যেমনই হোক না কেন, কোন-না-কোনভাবেই ঠিকই ক্রিয়াশীল। এইসূত্রে কেউ যদি 'কালানৌচিত্য' দোষের উল্লেখ করে নাকচ করতে চান আমাদের এই পর্যবেক্ষণকে তবে তাঁকে মনে করিয়ে দেওয়া যাক, বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত উপন্যাসের অন্তিম সংস্করণ, 'ধর্মতত্ত্ব' প্রকাশের পরবর্তী ঘটনা। 'ধর্মতত্ত্ব'-এর 'প্রথম ভাগ' 'অনুশীলন' নামে প্রকাশিত হয় ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের ১৭ মে। যদিও 'ধর্মতত্ত্ব'-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ১২৯১-এর শ্রাবণ থেকে ১২৯২-এর চৈত্র পর্যন্ত, অর্থাৎ ১৮৮৪-৮৫ নাগাদ। এবার লক্ষ করা যাক বঙ্কিমের সবকটি উপন্যাসের শেষ সংস্করণের তারিখ ঃ

উপন্যাস	সংস্করণ	সাল
দুর্গেশনন্দিনী	১৩শ	১৮৯৩
কপালকুণ্ডলা	৮ম	১৮৯২
মৃণালিনী	১০ম	১৮৯৩
বিষবৃক্ষ	৮ম	১৮৯২
চন্দ্রশেখর	৪র্থ	১৮৯৪
রজনী	৩য়	১৮৮
কৃষ্ণকান্তের উইল	৪র্থ	১৮৯২
আনন্দমঠ	৩য়	১৮৮৬
দেবী চৌধুরাণী	৬ষ্ঠ	১৮৯১
সীতারাম	২য়	১৮৮৮
ইন্দিরা	৫ম	১৮৯৩
রাজসিংহ	৩য়	১৮৯৩

'ধর্মতত্ত্ব'-এর তত্ত্ব-কাঠামো যে বঙ্কিম-উপন্যাসের শরীরে অন্তঃপ্রোথিত, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ বঙ্কিম-উপন্যাসের পাঠান্তর। আমরা 'ধর্মতত্ত্ব'কে বিভাজিকারূপে স্মরণে রেখে বঙ্কিম-উপন্যাসের পাঠান্তরের বিষয়টিকে নতুনভাবে বিবেচনা করে দেখতে পারি ঃ

দুর্গেশনন্দিনী/১ম সং	**১৩শ সং**
কতলু খাঁ ও বিমলার অন্তরঙ্গ দৃশ্যটি লক্ষণীয়—'ও কি—কাঁচলি? ও কি জাঁহাপনা? ও কি ও কি?—...বিমলা চকিতের ন্যায় কতলু খাঁর ভুজগ্রন্থি-মধ্য হইতে সরিয়া গিয়া দাঁড়াইলেন।' (পৃ. ১৫১)	আমরা দেখিয়েছি 'ধর্মতত্ত্ব'-এর মাপে বিমলা আদর্শ স্ত্রী ও মাতা। তাই তাকে ঘিরে এধরণের আদি-রসাশ্রিত দৃশ্য রচনা রসাভাস। সঙ্গতভাবেই শেষ সংস্করণে এই অংশ অনুপস্থিত।
কপালকুণ্ডলা/১ম সং	**৮ম সং**
কাপালিক নবকুমারকে উদ্ধার করলেন---'দেখিলেন, এ নবকুমারের প্রায় অচৈতন্যদেহ। অনুভবে বুঝিলেন, কপালকুণ্ডলাও জলমগ্না আছেন। পুনরপি অবতরণ করিয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে পাইলেন না। (পৃ. ১০০)	শেষ সংস্করণে পাই—'নবকুমার তীরভঙ্গের শব্দ শুনিলেন, কপালকুণ্ডলা অন্তর্হিত হইল দেখিলেন। অমনি তৎপশ্চাৎ লম্ফ দিয়া জলে পড়িলেন।... তাঁহাকেও পাইলেন না, তিনিও উঠিলেন না।' (পৃ. ৯৩) আমরা দেখিয়েছি, 'ধর্মতত্ত্ব'-এর মাপে অনুশীলিত নবকুমার। ফলে 'প্রণয়ে আত্মবিসর্জ্জন'ই তাঁর অন্তিম কাম্য।
মৃণালিনী/১ম সং	**১০ম সং**
হেমচন্দ্রের সম্মুখে গিরিজায়া 'বিদ্যাসুন্দর'-এর গান গেয়েছিল প্রথম সংস্করণে—'কটিবাস কসিয়ে, রাশ রসে রসিয়ে, মাতিল রস কামিনী।' (পৃ. ১৩০) এ'গান গাইতে গিয়ে সে নিজেই 'লজ্জিতা' হয়েছিল।	কমলাকান্তই বলবেন—'বিদ্যাসুন্দরে ইন্দ্রিয়বহ্নি জ্বলিতেছে।' (পৃ. ১২) স্বরূপত দম্পতি যে হেমচন্দ্র-মৃণালিনী, তাদের উদ্দেশ্য করে এমন কামবহ্নিময় গান গাওয়া কি গিরিজায়ার উচিৎ তবে? 'ধর্মতত্ত্ব'কে মান্য করেই শেষ সংস্করণে এ'গান বর্জিত।
বিষবৃক্ষ/১ম সং	**৮ম সং**
হরদেব ঘোষালের চিঠিতে 'যথার্থ প্রণয়'-এর কবি ছিলেন—'সেক্সপীয়র, বাল্মীকি, মাদাম্ দেস্তাল্' (পৃ. ১৪৪)।	'মাদাম্ দেস্তাল্'-এর পরিবর্তে এসেছে—'শ্রীমদ্ভাগবতকার'। (পৃ. ৯০) 'কৃষ্ণচরিত্র'-এ বঙ্কিমচন্দ্রের মতামত স্মরণীয়—'ভাগবতকার বিলাসপ্রিয়তা দোষে দূষিত নহেন।' (পৃ. ৭৯) কৃষ্ণচরিত্র 'ধর্মতত্ত্ব'-এরই সোদাহরণ ভাষ্য।

চন্দ্রশেখর/১ম সং	**৪র্থ সং**
শৈবলিনীকে উপলক্ষ করে কথকের সাধারণ মন্তব্য—'কে কবে জলে বা যুবতীর হৃদয়ে স্থায়ী চিহ্ন অঙ্কিত করিতে পারিয়াছে? চিত্র অঙ্কিত হয় না, কিন্তু উভয়েই ছায়া পড়ে। তুমি সরিয়া যাও, জলের ছায়া মিলাইবে; যুবতী হৃদয়স্থ ছায়াও মিলাইয়া যাইবে।' (পৃ. ১৩৩)	'ধর্মতত্ত্ব'-এ বঙ্কিম স্ত্রীজাতি সম্পর্কে বলবেন—'গৃহধর্মে ইঁহারা ভক্তির পাত্র' (পৃ. ৫৪), তাঁরা 'লক্ষ্মীরূপা' (পৃ. ৫৪)। 'ধর্মতত্ত্ব' লিখে ফেলার পর কি আর নারীজাতি সম্পর্কে কোন সাধারণীকৃত অশ্রদ্ধেয় মন্তব্য করা সম্ভব? সঙ্গতভাবেই তাই পরবর্তী সংস্করণে এই মন্তব্য বর্জিত।
কৃষ্ণকান্তের উইল/১ম সং	**৪র্থ সং**
উপন্যাসের শেষে মৃতা রোহিণী গোবিন্দলালকে বলে—'প্রায়শ্চিত্ত কর। মর।' (পৃ. ৯০) তাই শুনে গোবিন্দলাল—'জলে নামিয়া, স্বর্গীয় সিংহাসনারূঢ়া জ্যোতির্ময়ী ভ্রমরের মূর্তি মনে মনে কল্পনা করিতে করিতে ডুব দিলেন।' (পৃ. ১০০)	'ধর্মতত্ত্ব' রচিত হওয়ার পর 'দ্বাদশ বৎসর'-এর 'অজ্ঞাতবাস'-এ গোবিন্দলাল 'চিত্তশুদ্ধি' ঘটিয়ে 'ভ্রমরাধিক ভ্রমর' (পৃ. ৯২)-কে লাভ করে, শেষতঃ 'দম্পতিপ্রীতি'-কেই জয়যুক্ত করে গেলেন।
আনন্দমঠ/১ম সং	**৩য় সং**
সত্যানন্দ শান্তিকে বলে বসেন—'তোমাকে আমি চিনিতাম না। চিনিলে আমি বলিতাম হে জীবানন্দ! আমার নিকট শপথ কর যে তুমি পত্নীসহবাস ত্যাগ করিবে না।' (পৃ. ১৩৭)	সত্যানন্দের 'সন্তান ধর্ম' অভ্যাসের ধর্ম। তার মধ্যে 'দম্পতিপ্রীতি'-র অনুশীলনের অবকাশ কই? তাই সত্যানন্দের মুখে ওই 'দম্পতিপ্রীতি'র উচ্চারণ বেমানান। সঙ্গতভাবেই এ'অংশ বর্জিত।
ইন্দিরা/১ম সং	**৫ম সং**
ইন্দিরা উপেন্দ্রকে এক মিথ্যা গল্প বলে—'তাহাতে কোন ব্যক্তি আপন উপপত্নীকে সমুদায় সম্পত্তি লিখিয়া দিয়াছিল'। (পৃ. ৮৮) উপেন্দ্রও তাঁর সম্পত্তি ইন্দিরাকে লিখে দেয়।	'ধর্মতত্ত্ব'-এর পরে বঙ্কিম ভুল শুধরে নিয়েছেন। আদর্শ গৃহিণী ইন্দিরার দাবী তার স্বামীর উপরে, স্বামীর সম্পত্তির উপরে নয়। তাই এ'অংশ বর্জিত।

'রাজসিংহ', 'দেবী চৌধুরাণী' আর 'সীতারাম'-এর ক্ষেত্রে 'ধর্মতত্ত্ব'-এর প্রভাব কতদূর তা আমরা ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠা করেছি। শুধু এটুকু স্মরণীয়, যে 'ধর্মতত্ত্ব' বা 'গীতা' অনুবাদের পাদটীকাতেও বঙ্কিমচন্দ্র উদাহরণরূপে যথাক্রমে 'দেবী চৌধুরাণী' আর 'সীতারাম'কেই উদ্ধৃত করেন।

অবশ্য এখানেই শেষ নয়। 'ধর্মতত্ত্ব'-এ যে একস্বরিক কাঠামো বঙ্কিমচন্দ্র গড়ে তোলেন, বা যাকে মেনে চলবার প্রাণপণ প্রয়াস তাঁর উপন্যাসগুলির শরীরে অনায়াসগোচর, তারই কিছু আশ্চর্য, ব্যতিক্রমও নজরে পড়ে আমাদের। আমরা লক্ষ করেছি যে, বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্তিগত যাপনেই 'ধর্মতত্ত্ব'-এর নিশ্ছিদ্র কাঠামোকে অমান্য করার স্পর্ধা রাখতেন। একই স্পর্ধা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের চরিত্ররাও রাখে। আশ্চর্য এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র এই স্পর্ধাকে শাস্তিযোগ্য মনে করেন না! কী অদ্ভুত প্রশ্রয় এইসব চরিত্রদের প্রতি তাঁর থেকে যায়, সে-সব কিছুই ধরবার চেষ্টা আমরা করেছি, আমাদের আলোচনায়। সঙ্গতভাবেই আমরা বাধ্য হয়েছি 'দুই বঙ্কিম'-এর তত্ত্বকে খারিজ করতে।

বহুগ্রাসী পাঠক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। বিশেষ করে হিন্দু-ঐতিহ্যে স্নাত বঙ্কিম পড়েছিলেন পুরাণ ও পৌরাণিক সাহিত্য। তাঁর সেই পুরাণ-পাঠ এবং প্রাজ্ঞতার অজস্র চিহ্ন ছড়িয়ে রয়েছে তার মননে-মানসে এবং তাঁর সাহিত্যে। রাষ্ট্র, পরিবার ও যৌনতার কথা বলতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর পুরাণ জ্ঞানকে উজাড় করে দিয়েছেন, পুরাণের বাচনের ভাঙা-গড়ায় ধরা পড়েছে তাঁর যৌনতা সংক্রান্ত ভাবনা। সেই-সব প্রায় অনালোচিত বিষয়কেও সাধ্যমত স্পর্শ করেছি আমরা।

আর সবশেষে আমরা কথা বলেছি 'ভাষা' নিয়ে। যে-কোনো সাহিত্যই আসলে এক প্রকারের ভাষাগত নির্মাণ। আর বঙ্কিমচন্দ্রের মত শিল্পী, যাঁর নিজস্ব ভাষাবোধ এবং সাহিত্য-তত্ত্বচিন্তা ছিল প্রখর, যিনি লিখেছেন—'জনসাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধি বা চিত্তোন্নতি ভিন্ন রচনার অন্য উদ্দেশ্য নাই' (পৃ. ৩৫৯)—সেই তিনি যে 'শবদে শবদে' ঘটকালিতে পারঙ্গম ছিলেন, এতো বলাই বাহুল্য। সঙ্গতভাবেই শব্দব্যবহার, প্রতীক নির্বাচন অথবা রূপকল্প-নির্মাণেও অনেক সময়ই ক্রিয়াশীল বঙ্কিমচন্দ্রের যৌনতা-সংক্রান্ত ধারণা। আমরা, বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যবহৃত সেই সব শব্দ-প্রতীক-রূপকল্পের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে বুঝে নিয়েছি বঙ্কিম-মানসকে, বঙ্কিম-মননকে।

গ্রন্থপঞ্জি ঃ

আকর গ্রন্থ ঃ

[গবেষণায় উল্লিখিত সমস্ত প্রথম বন্ধনীভুক্ত পৃষ্ঠা-সংখ্যা আকর গ্রন্থগুলির]

(ক) বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ঃ

১. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, আনন্দমঠ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা, আষাঢ় ১৩৮৯।

২. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, ইন্দিরা, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা, আষাঢ় ১৩৬০।

৩. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, কপালকুণ্ডলা, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা, আশ্বিন ১৪১৭।

৪. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, কৃষ্ণকান্তের উইল, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা, অগ্রহায়ণ ১৪০৭।

৫. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, চন্দ্রশেখর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা, পৌষ ১৪১১।

৬. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, দুর্গেশনন্দিনী, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা, চৈত্র ১৩৭০।

৭. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, দেবী চৌধুরাণী, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা, পৌষ ১৪১১।

৮. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, বিষবৃক্ষ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা, পৌষ ১৪১১।

৯. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, মৃণালিনী, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা, ফাল্গুন ১৩৬৭।

১০. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, রজনী, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা, আশ্বিন ১৩৭২।

১১. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, রাজসিংহ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা, শ্রাবণ ১৪১১।

১২. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, সীতারাম, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা, পৌষ ১৪১১।

(খ) বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য গ্রন্থ ঃ বাংলা

১. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, কমলাকান্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা, আশ্বিন ১৪০৬।

২. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, কৃষ্ণচরিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা, আশ্বিন ১৪০৮।

৩. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা, আশ্বিন ১৪১৭।
৪. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, ধর্মতত্ত্ব, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা, চৈত্র ১৩৭১।
৫. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, বিবিধ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা, আশ্বিন ১৪১৭।
৬. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, বিবিধ প্রবন্ধ (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা, কার্তিক ১৩৮০।
৭. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা, আশ্বিন ১৩৮১।
৮. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, লোকরহস্য, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা, ভাদ্র ১৩৫৯।
৯. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, শ্রীমদ্ভগবদগীতা, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা, আশ্বিন ১৪১৭।

(গ) বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য গ্রন্থ ঃ ইংরেজি

১. Jogesh Chandra Bagal edited, Bankim Rachanavali, BankimChandra Chattopadhyaya, Sahitya Samsad, Calcutta, April, 1998.

সহায়ক গ্রন্থ ঃ

(ক) বাংলা গ্রন্থ ঃ

১. অচিন্ত্য বিশ্বাস সম্পাদিত, বড়ু চণ্ডীদাস বিরচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যকথা, বিদ্যা, কলকাতা, আগস্ট ২০১৪।
২. অদ্রীশ বিশ্বাস সম্পাদিত, বটতলার বই ১, গাঙচিল, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১১।
৩. অনিল আচার্য অর্ণব সাহা সম্পাদিত, যৌনতা ও বাঙালি, অনুষ্টুপ, কলকাতা, ২০০৯।
৪. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলার ব্রত, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, ফাল্গুন ১৪০৭।
৫. অভ্র বসু, বাংলা স্ল্যাং সমীক্ষা ও অভিধান, প্যাপিরাস, কলকাতা, আগস্ট ২০০৬।
৬. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, বঙ্কিমচন্দ্রজীবনী, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯১।
৭. অরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, দারোগার দপ্তর, প্রথম খণ্ড, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, পুনশ্চ, কলকাতা, ২০০৪।
৮. অরুণকুমার বসু ও অন্যান্য সম্পাদিত, দেবদাস জোয়ারদার রচনাসমগ্র ১, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলকাতা, নভেম্বর ১৯৯৯।
৯. অলোক রায়, আলেকজাণ্ডার ডাফ ও অনুগামী কয়েকজন, প্যাপিরাস, কলিকাতা, ১৯৮০।
১০. অশোককুমার রায় সম্পাদিত, বঙ্কিম প্রসঙ্গ, তারকনাথ বিশ্বাস, পারুল প্রকাশনী, কলিকাতা, ২০০৮।

১১. অক্ষয়কুমার কয়াল সম্পাদিত, প্রাণরাম কবিবল্লভের কালিকামঙ্গল, সাহিত্যলোক, কলকাতা, নভেম্বর ১৯৯১।
১২. অক্ষয়কুমার কয়াল সম্পাদিত, রূপরাম চক্রবর্তী বিরচিত ধর্মমঙ্গল, ভারবি, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১১।
১৩. অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব সম্পাদিত, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত মনসামঙ্গল, লেখাপড়া, কলকাতা, ১৩৮৪।
১৪. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বঙ্কিম-উপন্যাসের শেষ পর্ব, এ. মুখার্জি এণ্ড কোং (প্রা:) লিমিটেড, কলিকাতা, আশ্বিন, ১৩৮৮।
১৫. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, বাংলা কাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, মাঘ ১৪০৬।
১৬. ক্ষুদিরাম দাস, বৈষ্ণব-রস-প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল ২০০৯।
১৭. ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত, বঙ্কিমচন্দ্র : আধুনিক মন, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, নভেম্বর ১৯৮৯।
১৮. ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত, মধুসূদন-রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, জানুয়ারি ২০০৪।
১৯. খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত, মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ২০১১।
২০. গোপাল হালদার সম্পাদিত, বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড।। সমাজ, বিদ্যাসাগর স্মারক জাতীয় সমিতি, কলিকাতা, ২০ শে অগস্ট ১৯৭২।
২১. গোলাম মুরশিদ, হিন্দু সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ২০১২।
২২. চিত্ররেখা গুপ্ত, প্রথম আলোর চরণধ্বনি [উনিশ শতকের লেখিকাদের কথা], উর্বী প্রকাশ, কলকাতা, জুন ২০০৯।
২৩. চৈতালি সাহা, রবীন্দ্রনাট্যে প্রতিমা, জিজ্ঞাসা এজেন্সিজ্ লিমিটেড, কলিকাতা, ডিসেম্বর ১৯৯৩।
২৪. জগদীশ ভট্টাচার্য, আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী, ভারবি, কলকাতা, আষাঢ় ১৪০৬।
২৫. জগদীশ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রচিত্তে জনচেতনা, ভারবি, কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি ১৯৯৮।
২৬. জয়ন্তী সাহা, বঙ্কিম বীক্ষা, সংবাদ, কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪।
২৭. তপোব্রত ঘোষ, গোরা আর বিনয়, অবভাস, কলকাতা, মে ২০০২।
২৮. তপোব্রত ঘোষ, যেভাবে বঙ্কিম পড়ি, একটি তবু... প্রকাশ, বারাসাত, মার্চ ২০১২।
২৯. দীনেশচন্দ্র সিংহ, প্রসঙ্গ ঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২০০৭।
৩০. দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, কাশীদাসী মহাভারত, কাশীখণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, জানুয়ারি ১৯৯২।
৩১. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ভারতীয় দর্শন, প্রথম খণ্ড, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০০৩।
৩২. নরহরি কবিরাজ সম্পাদিত, উনিশ শতকের বাংলার জাগরণ তর্ক ও বিতর্ক, কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী, কলকাতা, ২০০৯।
৩৩. নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ২০০৩।
৩৪. নির্মলকুমার সেন, রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ডিসেম্বর, ১৯৯০।

৩৫. পঞ্চানন তর্করত্ন মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বাৎস্যায়ন-প্রণীত কামসূত্র, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, বৈশাখ ১৩৯৮ সন।
৩৬. পরিমল রায় সম্পাদিত, বঙ্কিমচন্দ্র : স্মরণ-সমীক্ষণ, আজকের ধূমকেতু প্রকাশনী, কলকাতা, ১২ জুলাই ২০১০।
৩৭. পল্লব সেনগুপ্ত, পূজা-পার্বণের উৎসকথা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, মে ২০০৩।
৩৮. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ইতিহাসের উত্তরাধিকার, আনন্দ, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০০৬।
৩৯. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, প্রজা ও তন্ত্র, অনুষ্টুপ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৮।
৪০. প্রদীপ বসু, পারিবারিক প্রবন্ধ : বাঙালি পরিবারের সন্দর্ভ বিচার, গাঙচিল, কলকাতা, মার্চ ২০০২।
৪১. প্রদীপ বসু সম্পাদিত, সাময়িকী পুরনো সাময়িকপত্রের প্রবন্ধ সংকলন, দ্বিতীয় খণ্ড : গৃহ ও পরিবার, আনন্দ, কলকাতা, এপ্রিল ২০০৯।
৪২. প্রদীপ বসু সম্পাদিত, সাময়িকী পুরনো সাময়িকপত্রের প্রবন্ধ সংকলন, প্রথম খণ্ড : বিজ্ঞান ও সমাজ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, মে ১৯৯৮।
৪৩. প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত, উপন্যাস-সাহিত্যে বঙ্কিম, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০০৬।
৪৪. প্রমথনাথ বিশী, বঙ্কিম-সরণী, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, মাঘ ১৪০৮।
৪৫. বরুণকুমার চক্রবর্তী, বাংলা সাহিত্যের বিস্মৃত অধ্যায়, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলিকাতা, সেপ্টেম্বর ২০০২।
৪৬. বহু পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্যে অনূদিত, মহাকবি কালিদাসের গ্রন্থাবলী, শ্রীনবকুমার বসু এণ্ড কোম্পানি দ্বারা প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৩০২ সাল।
৪৭. বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত, নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ, রাজনারায়ণ বসু, কলেজ স্ট্রীট পাবলিকেশন প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, ১ বৈশাখ ১৪০২।
৪৮. বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় [দ্বিতীয় ভাগ], অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত, করুণা প্রকাশনী, কলিকাতা, আষাঢ় ১৪০৬।
৪৯. বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, শিবনাথ শাস্ত্রী, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, জানুয়ারি ২০০৭।
৫০. বিজলি সরকার সম্পাদিত, রবীন্দ্রনাথের বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্কিম-ভবন গবেষণা কেন্দ্র, নৈহাটি, জানুয়ারি ২০০৯।
৫১. বিনয় ঘোষ, বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা ১৮০০-১৯০০, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০০৭।
৫২. বিনয় ঘোষ, বাদশাহী আমল, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, শ্রাবণ ১৪০৬।
৫৩. বীতশোক ভট্টাচার্য, কথাজিজ্ঞাসা, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৪।
৫৪. বেনীমাধব রায়চৌধুরী সম্পাদিত, কালিদাস রচনাসমগ্র, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, ১লা ডিসেম্বর, ২০০১।
৫৫. ভবতোষ চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র ঃ সৃজন ও বীক্ষণ, প্যাপিরাস, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯১।
৫৬. ভবতোষ দত্ত, চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, বৈশাখ ১৪১৫।
৫৭. ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রসরচনাসমগ্র, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৮৭।

৫৮. মৃদুলকান্তি বসু, বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, এপ্রিল ২০০৩।
৫৯. মোহিতলাল মজুমদার, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ও বঙ্কিম বরণ, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৫।
৬০. রণজিৎ গুহ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূত্রপাত, তালপাতা, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০১০।
৬১. রথীন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত, দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ডিসেম্বর ২০০৭।
৬২. রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, ঐতিহ্য ও পরম্পরা, প্যাপিরাস, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৯।
৬৩. রমাকান্ত চক্রবর্তী, বাঙালির ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ২০০২।
৬৪. রাজশেখর বসু-কৃত সারানুবাদ, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস-কৃত মহাভারত, এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা, ১৪২০।
৬৫. রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত, কালিদাসের গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় ভাগ, বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির, কলকাতা, প্রকাশকালহীন।
৬৬. শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা উপন্যাসে 'ওরা', প্যাপিরাস, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৬।
৬৭. শ্যামলী চক্রবর্তী, বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্প ও সঙ্গীতের জগৎ, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, জুলাই ১৯৯০।
৬৮. শ্রীপান্থ, কেয়াবাৎ মেয়ে, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, নভেম্বর ১৯৯৮।
৬৯. শ্রীপান্থ, মোহন্ত এলোকেশী সম্বাদ, আনন্দ, কলকাতা, এপ্রিল ২০০৫।
৭০. সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, নবীনচন্দ্র রচনাবলী, আমার জীবন (৩য় খণ্ড), বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা, ২৫ বৈশাখ ১৩৬৬।
৭১. সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, নবীনচন্দ্র রচনাবলী, প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৬৬।
৭২. সতীশচন্দ্র মিত্র, যশোহর্-খুল্নার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, কলিকাতা, ১৩২৯।
৭৩. সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী, অন্দরে অন্তরে উনিশ শতকে বাঙালি ভদ্রমহিলা, স্ত্রী, কলকাতা, ১৯৯৮।
৭৪. সারদাপ্রসাদ বিদ্যাভূষণ সংকলিত, অনূদিত ও প্রকাশিত, স্তোত্র-রত্নমালা, মনমোহন লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৩৩২ সন।
৭৫. সুকুমার সিকদার, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, অনুষ্টুপ,কলকাতা, ২০০৫।
৭৬. সুকুমার সেন সম্পাদিত, কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি ২০০১।
৭৭. সুকুমার সেন সম্পাদিত, বৃন্দাবনদাস বিরচিত চৈতন্যভাগবত, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি, ২০০৩।
৭৮. সুকুমার সেন তারাপদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, কৃষ্ণদাস বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ভাদ্র ১৪১০।
৭৯. সুকুমারী ভট্টাচার্য, ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, অনুবাদ নীলাঞ্জনা দত্ত (সিকদার) ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলকাতা, ১৯৯১।
৮০. সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, কৃত্তিবাস পণ্ডিত বিরচিত রামায়ণ, ভারবি,কলকাতা, নভেম্বর, ১৯৯৭।
৮১. সুখময় মুখোপাধ্যায় সুমঙ্গল রাণা সম্পাদিত, জয়ানন্দ বিরচিত চৈতন্যমঙ্গল, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, সেপ্টেম্বর ১৯৯৪।

৮২. সুধাকর চট্টোপাধ্যায়, কথাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, মাঘ ১৩৭৯।

৮৩. সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত, যৌনতা ও সংস্কৃতি, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০০২।

৮৪. সুধীরচন্দ্র সরকার সংকলিত, পৌরাণিক অভিধান, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, পৌষ ১৪১২।

৮৫. সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, অশ্রুত কণ্ঠস্বর ঔপনিবেশিক বাঙলার বারবণিতা সংস্কৃতি, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০২।

৮৬. সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান, অনুষ্টুপ, কলকাতা, এপ্রিল, ২০০৮।

৮৭. সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, কাব্যবিচার, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০০৪।

৮৮. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাচীন ভারতের অপরাধতত্ত্ব ও যৌনবিজ্ঞান, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, ২০শে মার্চ ১৯৭৯।

৮৯. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মনুসংহিতা, আনন্দ, কলকাতা, আগস্ট ২০০৭।

৯০. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙ্গালী, এ. মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং. প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, পৌষ ১৩৬৮।

৯১. সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত, বঙ্কিমপ্রসঙ্গ, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮২।

৯২. সৈয়দ শাহরিয়র রহমান, উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীক চিহ্নের নন্দনতত্ত্ব বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, মে ২০০৮।

৯৩. সোমেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, কাছের মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র, টেগোর রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, কলিকাতা, মে ১৯৮৯।

৯৪. সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, বাঙালির রাষ্ট্রচিন্তা, প্রথম খণ্ড, জি. এ. ই. পাবলিশার্স, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ১৯৮৬।

৯৫. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, শ্রাবণ, ১৪০৭।

৯৬. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, বৈষ্ণব পদাবলী, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, মাঘ ১৪০৬।

৯৭. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, রামায়ণ, কৃত্তিবাস বিরচিত, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, আগস্ট ২০১১।

৯৮. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, হিন্দুদের দেবদেবী : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, তৃতীয় পর্ব, ফার্মা কে এল এম. প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৭।

৯৯. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, হিন্দুদের দেবদেবী : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, দ্বিতীয় পর্ব, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ২০০৩।

১০০. হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য-কর্তৃক অনুবাদিত, বাল্মীকি রামায়ণ, ভারবি, কলকাতা, নভেম্বর ১৯৯৭।

(খ) ইংরেজি গ্রন্থ ঃ

১. Bhabatosh Chatterjee edited, Bankimchandra Chatterjee : essays in perspective, Sahity Akademi, New Delhi, 1994.

২. Caroline F. E. Spurgeon, Shakespear's Imagery and what it Tells us, Cambridge University Press, New York, 2005.

৩. Charu Gupta, Sexuality, obscenity, Community, Permanent Black, Delhi, 2001.

৪. David Arnold and David Hardiman edited, Subaltern Studies VIII, Oxford University Press, New Delhi, 2003.

৫. Geraldine Hancock Forbes, Positivism in Bengal, Papyrus, Calcutta, November, 1975.

৬. M. H. Abrams, A Glossery of Literary Terms, Thomson Heinle, Singapore, 2003.

৭. Michel Foucault, The History of Sexuality, Volume. I, The will to knowledge, translated by. Robert Hurley, Penguin Books, Australia, 2008.

৮. Michel Foucault, The History of Sexuality, Volume. II, The use of Pleasure, translated by. Robert Hurley, Vintage Books, New York, March 1990.

৯. Michel Foucault, The History of Sexuality, Volume. III, The Care of the Self, translated by Robert Hurley, Pantheon Books, New York, 1986.

১০. Ranajit Guha edited, A Subaltern studies Reader, 1986-1995, Oxford University Press, New Delhi, 2000.

১১. Ruth Vanita and Saleem Kidwai edited, Same-Sex Love in India A Literary History, Penguin Books, New Delhi, 2008.

১২. Sisir Kumar Das, The Artist in Chains, New Statesman Publishing Company, New Delhi, 1984.

১৩. Sri Aurobindo, Bankim-Tilak-Dayananda, Sri Aurobindo Ashram, Pondi Cherry, 2006.

১৪. Tanika Sarkar, Hindu Wife, Hindu Nation, Permanent Black, New Delhi, 2011.

(গ) অভিধান ঃ

১. বিজিতকুমার দত্ত ও অন্যান্য সম্পাদিত, আকাদেমি বিদ্যার্থী বাংলা অভিধান, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, আগস্ট ২০০০।

১. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় শব্দকোষ, দ্বিতীয় খণ্ড॥ প-হ, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লী, ২০০১।

২. Ashutosh Dev, Student's favourite Dictionary, Bengali to English, Dev Sahitya Kutir (P) Limited, February 1989.

(ঘ) সহায়ক পত্র-পত্রিকা ঃ

১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত 'মাসিক বঙ্গদর্শন' পত্রিকার হুবহু পুনর্মুদ্রণ, বঙ্গদর্শন ১, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৯৯।

২. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত 'মাসিক বঙ্গদর্শন' পত্রিকার হুবহু পুনর্মুদ্রণ, বঙ্গদর্শন ৮, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৯৯।

৩. শিবাশিস দত্ত পার্থ চক্রবর্তী সম্পাদিত, অবভাস, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৫।

৪. শিবাশিস দত্ত পার্থ চক্রবর্তী সম্পাদিত, অবভাস, জানুয়ারী-মার্চ ২০০৩।

৫. সঞ্জীবকুমার বসু সম্পাদিত, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বৈশাখ-আশ্বিন ১৪০৪।

৬. সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, শনিবারের চিঠি, বঙ্কিম-সংখ্যা, নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৯।

৭. সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত, দেশ, ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪।

পরিশিষ্ট : এক

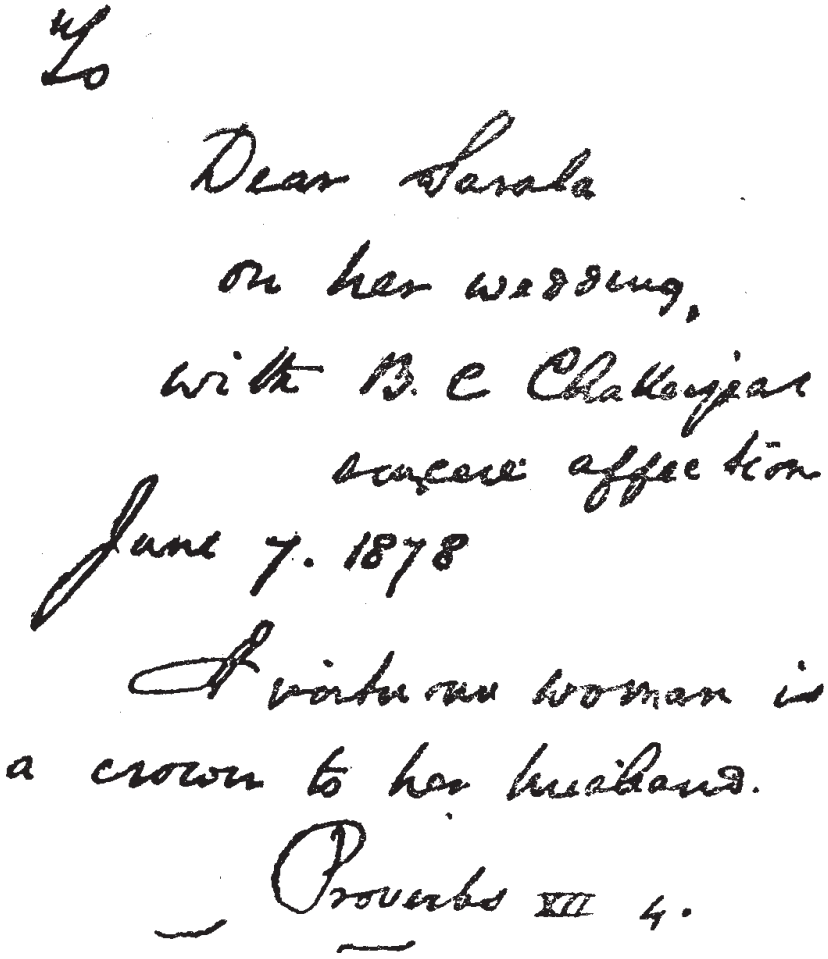
To
Dear Sarala
on her wedding,
with B. C Chatterjee
sincere affection
June 7. 1878
A virtuous woman is
a crown to her husband.
— Proverbs XII 4.

রমেশচন্দ্র দত্তের মেয়ে সরলার বিবাহে প্রদত্ত বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাক্ষরিত 'ইন্দিরা' গ্রন্থের পৃষ্ঠা
[চিত্রঋণ : জয়ন্তী সাহা, বঙ্কিম বীক্ষা, সংবাদ, কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪।]

পরিশিষ্ট : দুই

Telegraphic Address "METALS, CALCUTTA." **W. LESLIE & CO., CALCUTTA.** Telegraphic Address "METALS, CALCUTTA."

BRONZED ORNAMENTAL CAST-IRON GARDEN FOUNTAINS.

BRONZED C. I. FIGURES.

"DOLPHIN AND MAID."

No. 29. Height 63½ inches to underside of Jet.

Rs. 220

A "STUDY."

ANDROMEDA.

Height 60 inches.

Andromeda, daughter of Cepheus, king of Aethiopia and Cassiopeia.

As her mother boasted that in beauty Andromeda excelled the Nereids, Poseidon sent a sea monster to ravage the country. The oracle of Ammon prescribed that Andromeda should be given up to the monster to save her country, but Perseus turned it to stone with the Gorgon's head, saved her, and afterwards married her. After death she was placed among the Stars. The story is told in Ovid's Metamorphoses.

Rs. 2,500 each.

"SLAVE."

No. 7. Height 74 inches to underside of Jet.

Rs. 275

Unless otherwise instructed we insure these goods against breakage in transit. Premium 5 per cent.

গৃহসজ্জার মূর্তি-প্রস্তুতকারী কোম্পানি W. Leslie Co. Household Hardawe-র ১৯১৪ সালের ক্যাটালগ।
[চিত্রঋণ : শ্রীপান্থ, কেয়াবাৎ মেয়ে, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, নভেম্বর ১৯৯৮।]